চিহ্নতত্ত্বের আলোকে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য

পিএইচ.ডি. (কলা) উপাধিপ্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ

গবেষক

দিব্যেন্দু দলুই

A00BE1201316

2016-17

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৌমিত্র বসু

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

'চিহ্নতত্ত্বের আলোকে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য' submitted by me for the award of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Soumitra Basu, Professor at Rabindrabharati University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor
Dated: 24/7/23

DR. SOUMITRA BASU
Sisir Kumar Bhaduri Professor
&, Dept. of Drama
Rabindra Bharati University

Candidate
Dated:

Dibyendu Dalui
24.07.23

প্রস্তাবনা

তত্ত্ব কখনো কখনো আমাদের চশমা উপহার দেয়; কখনো-বা আরও একটু উপযাচক হয়ে রঙতুলি হাতে আমাদের চোখদুটিকেই তা এঁকে নেয় চুপি চুপি। উল্টোপিঠে কখনো আবার আমাদের চোখই নিজের প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুযায়ী তত্ত্বকে খুঁজে নেয়, তাকে আহরণ করে ফুলন্ত প্রশাখা থেকে, বীজ থেকে, প্রেম ও প্রকৃতির দ্বিরালাপ থেকে তার নির্যাস টেনে আনে চেতনার গহনদেশে অন্ধলোকের নির্জনতায়। তখন তা আর নিছক খড়বোঝাই গোরুর গাড়ি হয়ে থাকে না; ধানের খেতে বাতাস হয়ে, আকাশ-চুঁয়ে-পড়া রোদ ও জ্যোৎস্না হয়ে তা আমাদের সত্তার সঙ্গে মিশে যায়, আমাদের চোখকে পূর্ণতা দেয়, আমাদের জীবনকে জাগিয়ে রাখে। মনে হয় তা যেন আমাদেরই কথা, আমাদেরই হৃদয়ের ভাষা হয়ে তা এতকাল প্রচ্ছন্ন ছিল আমাদের প্রাত্যহিকতায়, পলাশের বনে, পাঠে ও পাঠান্তরে। আজ থেকে এক দশক আগে, স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নিয়মমাফিক গৃহলেখ্য প্রবন্ধ হিসেবে দেশভাগসংক্রান্ত যে-কোনো একটি গল্পের সমালোচনা-সূত্রে, পাঠ্যতালিকায় নির্ধারিত গল্পগুলির বাইরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মধুবন্তী’ গল্পটি আমার বিশেষ পাঠকদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; বিভাগের মাননীয়া অধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয়া ড. শম্পা চৌধুরীর মহাশয়ার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সেই লেখাটুকু প্রস্তুত করেছিলাম। কেন ‘মধুবন্তী’ গল্পটি সেদিন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল, আর পাঠ্যতালিকাভুক্ত গল্পগুলিকে মনে হয়েছিল বস্তুগতভাবে গতানুগতিক, তার গভীর কারণ সেদিন আমার উপলব্ধিতে আসেনি। কিন্তু শিক্ষিকা মহাশয়া শম্পা চৌধুরীর কাছে এই প্রসঙ্গে আজও আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, এই মর্মে যে, তিনি গল্পটির সমালোচনা-নিবন্ধ আমাকে লিখতে অনুমতি দিয়ে আমার সেই অস্ফুট খোঁজ বা অন্তর্লীন অনুসন্ধানকে অল্প হলেও মূর্ত হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য গবেষণাসূত্রে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে, এই তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর সন্ধান ও সংযোগ আমার সামনে এক নতুন পথের দরজা খুলে দেয়। এই বিষয়ে আমাদের বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড. বরেন্দু মণ্ডলের মহাশয়ের কাছে আমি অতি-অবশ্যই ঋণী।

বস্তুত তাঁরই তত্ত্বাবধানে আমার এইসংক্রান্ত অনুসন্ধান প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সূচিত হয়েছিল। নইলে আমার ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আখ্যানে শ্রেণিসম্পর্কের বিন্যাস ও রাজনীতি নিয়ে তত্ত্বতালাশ। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে আমার তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় মহাশয় ড. বরেন্দু মণ্ডলই আমাকে যথার্থ দিকনির্দেশ দিয়েছিলেন, অনুপ্রেরিত করেছিলেন ওই একই ব্যক্তিলেখকেরই কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলির ওপর আলোকপাত করতে। আসলে সেই সন্ধানটুকুই একটু নিবিড়ভাবে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে চিহ্নতত্ত্বের সঙ্গে বর্তমান গবেষকের প্রাথমিক আলাপ। আরও পরে, সেই আলাপচারিতাকেই আরও বর্ধিষ্ণু, আরও নিগূঢ় ও আরও সম্ভাবনাময় করে তুলতেই হয়তো আমাদের এই বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভের পরিকল্পনা। এই বিষয়ে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় অধ্যাপক ড. সৌমিত্র বসু মহাশয়ের কাছে আমি সর্বতোভাবে ঋণী। শুরু থেকে শেষ অবধি তাঁর অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সুপরামর্শ ও মূল্যবান মতামতই এই গবেষণাটিকে সফলভাবে সম্পন্ন করে তোলার পথে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়ে থেকেছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজটি করতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে আপ্লুত ও অভিভূত। পাশাপাশি আমাদের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছেও, বিশেষত মাননীয় ছন্দম চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে, প্রয়োজনমতো সাহায্য ও সুপরামর্শ পেয়ে আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। এ-ছাড়া প্রযুক্তিগত সহায়তা ও গবেষণার নানা কাজে নানাভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগানোর জন্য মাননীয় গবেষক শ্রীযুক্ত প্রদীপ রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত পাভেল স্টালিন বর্মন মহাশয়, শ্রীযুক্ত স্বপন বর্মন মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিন্দেশ্বর টুডু মহাশয়, গবেষিকা শ্রীমতি মৌলিকা দেবী ও বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মাননীয়া হাসনুহেনা প্রমুখের কাছেও আমি পর্যাপ্তভাবে ঋণগ্রস্ত। সেইসাথে জরুরি কৃতজ্ঞতা জানাই বাঁধাইশিল্পীদেরও। আর পিএইচ.ডি. সেলের কর্মচারীগণ, তাঁদেরকেও অশেষ ধন্যবাদ। পরিশেষে পরোক্ষ ধন্যবাদ জানাই সেইসব বৃক্ষ ও দেবতা, মৃত বা জীবিত ব্যক্তিত্ব, সেইসব লেখক, চিন্তক ও সমালোচকদের, যাঁদের চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা এই গবেষণার পরিসরে আমি নানাক্ষেত্রে নানাভাবে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছি।

হাওড়া

দিব্যেন্দু দলুই

গবেষণাপদ্ধতি

প্রদত্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসৃত হল:

১. ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার, পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি— এই পাঁচটি পর্বে প্রদত্ত গবেষণাপত্রটি বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২. প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে উপন্যাস, ছোটোগল্প প্রভৃতি গৃহীত হয়েছে।

৩. সহায়ক উপাদান সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও ক্ষেত্রবিশেষে বৈদ্যুতিন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. উপাত্ত আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. সমগ্র গবেষণপত্রটি কালপুরুষ ১৪ ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে। দীর্ঘ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বামদিক ইনডেন্ট করা হয়েছে একই ফন্টে, তবে উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জিত হয়েছে।

৬. প্রদত্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভটিতে আকাদেমি-বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে।

৭. গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে MLA Handbook-এর মান্য পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, তবে বাংলা গ্রন্থের ক্ষেত্রে লেখকের ও বইয়ের নামের পরবর্তী বিন্দুচিহ্ন-দুটির পরিবর্তে যথাক্রমে কোলন ও কমা ব্যবহৃত হয়েছে। আর সন্দর্ভের অন্তর্বর্তী তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে সুবিধামাফিক MLA পদ্ধতির সঙ্গে APA পদ্ধতিকে আংশিক মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সূচি

প্রস্তাবনা

গবেষণাপদ্ধতি

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়। চিহ্নের তাত্ত্বিক কাঠামোয় ব্যঞ্জনার শ্রেণিবিন্যাসগত ব্যাকরণ ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়। কথাসাহিত্যের জন্ম থেকে আধুনিকতা : চিহ্নচেতনার সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তন ৩৮

তৃতীয় অধ্যায়। বাংলা কথাসাহিত্যের চিহ্নকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৫৫

৩.১. চিহ্নের লোকায়ত বীজ: জাদুব্যঞ্জনার গহনভাষ্য ও ত্রৈলোক্যনাথ ৫৬

৩.২. বস্তু ও ব্যঞ্জনার সমঝোতামূলক সহাবস্থান: রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরোত্তর ৭৬

৩.৩. ভাবীকালের গল্পকাঠামোয় প্রচ্ছন্ন রূপকের সম্ভাবনাময় সম্ভার ১৪২

৩.৪ বয়ানের কুটিল বিক্ষোভ ও ব্যঞ্জনার ক্রূর বিমিশ্রতা: গল্পহীনের গল্পকুহক ১৯৪

উপসংহার: ২০২

পরিশিষ্ট ২০৬

গ্রন্থপঞ্জি: ২০৯

আকরগ্রন্থ

সহায়ক গ্রন্থ

বিদেশি

বাংলা

বৈদ্যুতিন তথ্য ২১৩

ভূমিকা

চিহ্ন ও চেনা— এই দুটি বিষয় ধ্বনিগতভাবে অনেকখানিই ঘনিষ্ঠ, বলা চলে। আর চিন্তনও তা-ই। কিন্তু শুধু ধ্বনিগত বা উচ্চারণগতভাবেই নয়, এদের মধ্যে কোথাও যেন এক প্রচ্ছন্ন দার্শনিক যোগও পরিলক্ষিত হয়। কাকে চিনব? কাকে চিনছি? চারপাশের পৃথিবীকে? আর নিজের মনের জগতটিকেও বুঝি! গাছ থেকে শুরু করে গতিসূত্র, মাছ থেকে শুরু করে মতিভ্রম, কাছ থেকে শুরু করে দূরবর্তী টিলা, সবকিছুই তো আমরা পৃথকভাবে কোনো-না-কোনো উপায়ে চিনতে শিখছি ছোটোবেলা থেকে বা চিনতে থাকবও বুড়োবয়স অবধি। এই চেনার পিছনে যে চিন্তন, তা-ই কি আসলে চিহ্ন নয়? কিন্তু এই চেনা কি অতই সহজ বিষয়, যতখানি সহজ আমরা ভাবি? আর এই 'চেনা'র ভিতর রয়েছে যে 'বোঝা', তার বোঝাও কি যথেষ্ট ভারবহুল নয়? 'শুক' বললে আমরা না-হয় সবাই টিয়াপাখি বুঝলাম, কিন্তু 'সুখ' বললে আমরা কী বুঝব? তবে কি আপেক্ষিকতা এসে ঝাপসা করে দিচ্ছে 'চেনা-বোঝা'র চেহারা? এমনকি 'শুক' বললেও সবার মনে যে টিয়াপাখির ছবি ভেসে উঠবে, তাও দেখতে সদৃশ হলেও কার্যত একটিই পাখি নয়। অভিজ্ঞতার তারতম্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য সেখানেও থেকেই যাবে। আর কারো চোখে যদি চন্দনা পাখি বসে থাকে? আর উল্টোদিকে সুখের যে বৈচিত্র্য জোগাড় হবে, তা নিয়ে কিছু না-বলাই আপাতত ভালো। আলাদা আলাদা মানুষের আলাদা আলাদা মতি; তাই 'মত'ও নানা মুনির নানা রকম। কিন্তু 'মুনি' মানে তো 'মৌনী', তা-হলে তাঁদের মতামতটুকু প্রকাশ পাবে কী করে? মতপ্রকাশের মূল মাধ্যম তো ভাষা, মৌখিক ভাষা। লিখে বোঝাবেন কি? সেক্ষেত্রেও মৌখিক ভাষার বিকল্প হিসেবে নতুন কোনো চেনার উপায়ের প্রয়োজন— অর্থাৎ লিপির প্রয়োজন। অথবা ধ্বনি ও লিপি— এই দুয়ের কোনোটিরই সাহায্য না নিয়ে মতপ্রকাশ করতে চাইলে আরও অন্য কোনো ভাবভঙ্গিমার প্রয়োজন। এবার ধরা যাক, যাঁরা মুনি নন, এবং যাঁরা একই সমাজব্যবস্থা ও মাতৃভাষাগোষ্ঠীর অংশ, তাদের ক্ষেত্রে কি এই চেনাবোঝার বিষয়গুলি সহজ হবে? হ্যাঁ, সহজ নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সুনিশ্চিত হবে কি? সেখানেও ভাষা, ভঙ্গি, যে বলছে, যে শুনছে, প্রেক্ষিত বা পরিস্থিতি, সবকিছু মিলে এক জটিল বহুমাত্রিকতা তৈরি করবেই।

ক্লাস এইটের একটি ছেলেকে যখন দিদিমণি দেখে বলেন ‘বাড়ন্ত বাচ্ছা’, তখন তার মন এই ভেবে খুশি হয় যে সেও বাড়তে বাড়তে শিগগির বড়োদের মতো হয়ে উঠবে; কিন্তু বাড়ি ফিরে যখন ঠাকুমা-র মুখে শোনে ‘চাল বাড়ন্ত’ আর সে চালের ডাব্বায় উঁকি দিয়ে দেখে, চালের পরিমাণ শেষ দু-দিনে পাত্রের আধভাগ থেকে কমে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, তখন সে ঠাকুমা-র কথার মানে বুঝতে গিয়ে একটু ধন্দে পড়ে যেন। অথচ নেহাত সে যে অবুঝ, তাও নয়। মা যখন রাগী-রাগী মুখে চোয়াল শক্ত করে বলে, “দাঁড়াও, খেলতে যাওয়াচ্ছি তোমায়!”— সে তখন দিব্যি বোঝে যে সেই মূহূর্তে তার খেলার সাধটুকু কতখানি দুর্গম হয়ে উঠতে চলেছে। কিংবা ‘আজ ভারতের ম্যাচ আছে’ বললে সে ভারতের ক্রিকেট-দলের খেলাই বোঝে, কোনোরকম মাথার কসরৎ ছাড়াই। কিংবা সিঁড়িতে খটখট শব্দ পেলে সে বোঝে, বুট পরে কেউ ওপরে উঠে আসছে, এমনকি তখন ঘড়িতে সন্ধে আটটা বাজলে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে সে এও বোঝে যে, আর কেউ নয়, তার বাবাই অফিস থেকে ফিরছে। আবার সিরিয়াল বা সিনেমায় যখন কেউ বলে ‘আইনের হাত অনেক লম্বা’, সে ভাবে— ‘কত লম্বা’, ‘সেই রাক্ষুসির গল্পে রাক্ষুসিটা যেমন দাওয়ায় বসে হাতটা অনেকখানি লম্বা করে পাতিলেবু পাড়ছিল, সেইরকম লম্বা কি?’ অথবা পাড়ার মোড়ে যাদবকাকার চায়ের গুমটি ভেঙে সেখানে মুখার্জিদের মোবাইলের দোকান বসে গেলে, যাদবকাকা যখন থানায় নালিশ জানিয়েও কোনো ফল পায় না, আর লোকে বলে, “এর পেছনে MLA-রও হাত আছে”, তখন কি ছেলেটা ভাবে, ‘MLA-এর বাড়ি তো অনেক দূরে, তাহলে সেই MLA-এর হাত আরও কত লম্বা’? কিংবা মুদিখানার দোকানে ভোটের ফলাফল নিয়ে কথা হলে কেউ যখন শ্বশুরবাড়ির এলাকার খবর জানানোর জন্য বলে, “ওদিকে তো গোরুতে সব ঘাস মুড়ো করে খেয়ে নিয়েছে”, তখন সে কি অবাক হয়? নাকি আর পাঁচজনের হাসিতে সেও না বুঝে যোগ দিয়ে ফেলে? এ তো গেল আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষার সংকট। আর সাহিত্য? সাহিত্যের ভাষাকে চেনার প্রক্রিয়াটি ঠিক কীরকম? সাহিত্য মানে তো সহিতত্ব। অর্থাৎ সংযোগ বা মিলনও বলা যায়। কীসের সঙ্গে কীসের মেলামেশা? যা বলা বা লেখা হয়েছে, আর যা শোনা বা পড়া হয়েছে— এই দুয়ের? বলা আর শোনার মধ্যে, লেখা আর পড়ার মধ্যে যে চেনা বা বোঝার

প্রক্রিয়া, তা-ই তো এই দুয়ের মিলন। অর্থাৎ চেনার প্রক্রিয়াই কি সাহিত্য? অর্থাৎ চিহ্নই সাহিত্য? তা-হলে আমাদের রোজকার ব্যবহারিক ভাষাতেও তো চিহ্ন তথা চেনার প্রক্রিয়াটুকু জ্যান্ত রয়েছে, তাকে কেন আমরা সাহিত্য বলি না। সম্ভবত সহিতত্বের মাত্রা ও গভীরতার কথাই বলা হবে। তা হোক, সেই তর্কে না গিয়ে আমরা আপাতত বোঝার চেষ্টা করি, সাহিত্যে বা সমাজে এই চেনাচেনির তথা চিহ্নায়নের চরিত্র কেমন। এইসূত্রে আবার আসবে চিন্তনের কথা। 'চিন্তন' কী? জটিল প্রশ্ন। বহু লোক তা নিয়ে ভেবেছেন। অর্থাৎ 'চিন্তা' নিয়েও চিন্তা করেছে মানুষ। যেমন চেনাচেনির চরিত্র চিনতে চাইছি আমরা। এই চেনার প্রক্রিয়া নিয়ে অর্থাৎ 'চিহ্ন' নিয়েও চিন্তা করেছেন বহু চিন্তক। প্রশ্ন হল: কারা আর কেমন ক'রে? তাঁদের সেই প্রস্তাবিত চেনার পদ্ধতিগুলির সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ঠিক কতখানি? বিশেষত কথাসাহিত্যের মতো একটি সুপ্রচলিত সাহিত্যধারার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রকারভেদ কীরকম? বাংলা কথাসাহিত্যের চালচিত্র যদি কেউ চিনতে চান, তিনিই-বা কীভাবে চিনবেন? কোনো একটি আখ্যানের নিবিড় পাঠ তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে নিতে চাইবেন, কোন্ চরিত্রকে শনাক্ত করতে চাইবেন কোন্ চশমায়? আমিই-বা বিষয়টিকে কী চোখে চিনতে চাইছি? 'শুক' বলতে আমিও কি টিয়াপাখিই বুঝছি? নাকি আমারও চোখের কোটরে চুপি চুপি চন্দনা ঢুকে বসে আছে? এইসব যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরও একরকম (অথবা অনেকরকম) করে খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা, পরোক্ষভাবে চিনে নিতে চেয়েছি নিজেরই নিহিত চেতনার চলাচল।

এই ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট প্রভৃতি বাদ দিলে, মূল গবেষণাটিকে আমরা প্রধান তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি, আর শেষ অধ্যায়টিকে মোট চারটি পর্বে বা উপাধ্যায়ে ভাগ করেছি। নিম্নে আমরা অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় জ্ঞাপন করার চেষ্টা করছি, সেইসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ের পর্ববিভাজনের পরিচয়ও অল্পকথায় তুলে ধরতে প্রয়াসী।

'চিহ্নের তাত্ত্বিক কাঠামোয় ব্যঞ্জনার শ্রেণিবিন্যাসগত ব্যাকরণ' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টিতে আমরা চিহ্নতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে তার জরুরি সূত্রগুলিকে বোঝার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে সুইস ভাষাতত্ত্ববিদ ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুরের (১৮৫৭-

১৯১৩) সম্পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নসংক্রান্ত ধারণাটিকে (*Course in General Linguistics,* ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত) পরবর্তীকালে রঁল্যা বার্ত (১৯৫৭ সালে তাঁর *Mythologies* বইটির 'Myth Today' অংশে) যেভাবে সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক আঙিনায় মুক্তি দিলেন, তাকে ভিত্তিভূমি হিসাবে ধরেও আমরা এক্ষেত্রে পাদপীঠ হিসেবে গ্রহণ করেছি, চার্লস স্যান্ডারস পার্স (চিহ্নবিজ্ঞানের আমেরিকান ঘরানার অন্যতম মধ্যমণি) চিহ্নের যে বর্গীকরণ করেছেন, তার কাঠামোটিকে। বিশেষত পার্সের বর্গীকরণের একটি পর্যায়কে আমরা স্যসুরের তত্ত্বের সাপেক্ষে গ্রহণ করে, তারপর সেই শ্রেণিবিভাজনকে (symbol, icon, index) আমাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী একটু বর্ধিত করে নিয়েছি ('icon' বা প্রতিমাকে 'মূর্ত' ও 'ভাবসাদৃশ্যগত'— এই দুটি ভাগে, আর 'index' বা নির্দেশককে 'প্রতিনিধিত্বমূলক' ও 'কার্যকারণগত'— এই দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি)। প্রাচ্য ধ্বনিবাদীদের বিশেষ 'ধ্বনি'র ধারণা ও ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত এইসংক্রান্ত নানারকম তুল্যমূল্য বিষয়কেও তুলনামূলকভাবে একটু অন্বিত করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ-ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে গ্রামসিকথিত সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ, বাখতিনকথিত দ্বিবাচনিকতা ও দেরিদাকথিত বিনির্মাণতত্ত্বের প্রসঙ্গও অল্পস্বল্প উড়ে এসেছে।

'কথাসাহিত্যের জন্ম থেকে আধুনিকতা : চিহ্নচেতনার সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তন' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আমরা প্রাচীন লোককথা থেকে আধুনিক কথাসাহিত্য অবধি যাত্রাপথের সম্ভাব্য সমাজতাত্ত্বিক ধর্মগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে শনাক্ত করার চেষ্টা করেছি। ১. একটি প্রথা, ফলিত কুসংস্কার ও প্রতিমার নির্মাণ (আদিম মানুষের একটি জাদুক্রিয়ামূলক সংস্কার কীভাবে তার টোটেম-সম্পর্কিত প্রতীকভাবনাকে অতিক্রম করে, তাকে বিমূর্তায়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তখনও অবধি তাকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকের উপরেই)। ২. নীতিকথার উদ্ভব, লেখকের জন্ম ও রূপকের বাস্তবতা (যখন সামাজিক অনুশাসনগুলি সুদৃঢ় হচ্ছে ক্রমশ, তখন পশুকথাই কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে নীতিকথায়, প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নের মধ্য থেকে আহরিত হচ্ছে রূপক, এবং সেই কর্তৃত্বময় 'লেখক'-এর জন্ম হচ্ছে পরবর্তীতে বার্ত যার মৃত্যুর আর্জি আনবেন)। ৩. রূপকথার বিকাশ (কোন্ সাংস্কৃতিক পরিসরে বিকাশলাভ করল রূপকথা,

কীভাবে তা হয়ে উঠল নিম্নবিত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীজয়ের ঔপনিবেশিক স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার বিনির্মাণ, কোন্ সমীকরণে তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে মিশে গেল সুখী স্থিতিশীল গৃহকোণের মায়া ও শুভবোধের সংযম)। ৪. পাল্টা রাজনীতি, রোমান্সের বীজ, লেখকের স্বৈরতন্ত্র (রোম্যান্সকে রূপকথার একটি বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী পর্যায় হিসেবে কতটা চিহ্নিত করা সম্ভব, কীভাবে তাতে রূপকের ভাষা ক্রমশ স্থানান্তরিত হতে হতে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকের প্রাধান্য দেখা গেল, এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে কোন্ বিশেষ চিহ্নের রাজনীতি)। ৫. প্রতিনিধির ভিড়, বণিকতন্ত্র ও আধুনিকতার স্বরূপ (ইউরোপীয় বণিকতন্ত্র-প্রসূত পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক চিহ্নচেতনা কীভাবে এক নতুন আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্মাণ করছে, যার গর্ভে লালিত আজকের ছোটোগল্প ও উপন্যাস, যা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকের একচেটিয়া প্রয়োগকে অবলম্বন করে গড়ে উঠছে, রূপকের ভাষা হয়ে উঠছে প্রান্তিক প্রলাপ মাত্র)।

'বাংলা কথাসাহিত্যের চিহ্নকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়টিতে আমরা নির্বাচিত কিছু কথাসাহিত্যের নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনার বিভিন্ন জটিল মাত্রাকে আমাদের গৃহীত ও প্রস্তাবিত পরিভাষার ধারণা দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি।—

'চিহ্নের লোকায়ত বীজ: জাদুব্যঞ্জনার গহনভাষ্য ও ত্রৈলোক্যনাথ' শীর্ষক প্রথম পর্বটিতে আমরা বুঝে নিতে চেয়েছি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে লোকায়ত রূপকধর্মিতা কীভাবে বয়ানের বহুমাত্রিকতা ফুটিয়ে তুলছে। এই প্রকল্পে আমরা মূলত *কঙ্কাবতী* উপন্যাসটিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছি, পাশাপাশি প্রসঙ্গসূত্রে 'লুল্লু' ও 'ডমরুধর'-এর আখ্যান থেকেও উদাহরণ ব্যবহার করেছি। প্রতিতুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন লেখার আলোচনাও হয়তো আনা যেত, কিন্তু আমরা অহেতুক জটিলতা এড়াতে সেই পরিসরসাপেক্ষ বিতর্কগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছি।

'বস্তু ও ব্যঞ্জনার সমঝোতামূলক সহাবস্থান: রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরোত্তর' শীর্ষক দ্বিতীয় পর্বটিতে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পসাহিত্য ঘেঁটে লক্ষ করেছি দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতার দ্বন্দ্ব ও সেই দ্বান্দ্বিকতার একটি উল্লেখযোগ্য শুভপরিণাম। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে রূপক ও নির্দেশকের নানাবিধ ব্যঞ্জনাকে আমরা এখানে মোটামুটি

ছয়টি চালচলনে বর্গায়িত করতে চেয়েছি। ১. রূপক যেখানে প্রকট ও প্রবচনধর্মী (খুব প্রথাগত ছাঁচে লেখক কোনো-না-কোনো প্রাচীন, প্রচলিত বা বহুকথিত চিহ্ন-সূচকের প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন কোনো বিশেষ বক্তব্যকে পেশ করতে গিয়ে, যদিও সেখানে অতিশয়োক্তির আড়ালটুকু থাকছে, কিন্তু আখ্যানের পরিপুষ্ট রূপকধর্মিতা পাঠকের অগোচর থাকছে না কোনোভাবেই, কারণ পাঠকের বহুযুগব্যাপী ব্যঞ্জনাবোধের সঙ্গে তা সংযুক্ত ও সাযুজ্যপূর্ণ, যেমন 'একটা আষাঢ়ে গল্প'-তে অঙ্কিত দ্বৈপায়ন তাসের রাজ্য বা তাসরমণী, *লিপিকা*-র 'তোতাকাহিনী'-তে বর্ণিত তোতাপাখিটি, কিংবা 'কর্তার ভূত' গল্পে 'ভূতুড়ে জেলখানা', অথবা সমাজরূপ পেষণযন্ত্র বা উৎপাদনযন্ত্র হিসেবে উল্লিখিত ঘানি, *গল্পসল্প*-এর 'বড়ো খবর' শীর্ষক পরিচ্ছেদে পাল ও দাঁড়ের দ্বন্দ্ব, নৌকা, এমনকি নৌকার মাঝি অবধি, *সে*-তে শিবুনাথ শেয়ালের আখ্যান কিংবা দুইপ্রকার বাঘের বৃত্তান্ত), ২. রূপক যেখানে সটীক ব্যাখ্যাধর্মী (প্রযুক্ত রূপকের ব্যাখ্যাটিপ্পনী, যেমন, 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে 'শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘট' যে বৈদ্যনাথের জীবনদৃষ্টির তাৎক্ষণিক শূন্যতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক ভগ্নদশারই উপমান, তা লেখকের নির্দেশমাফিক আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, অথবা 'সমাপ্তি' গল্পের সূচনায় বর্ণিত আকাশ ও নদীর প্রফুল্লতা যে আসলে অপূর্বকৃষ্ণের মানস-পরিস্থিতিরই দ্যোতক, তাও লেখকের তৎপরতায় পরক্ষণেই আমরা উপলব্ধি করতে সফল হই), ৩. প্রচ্ছন্ন রূপক (আপাত যে বস্তুগত কাহিনিকথন, তার মধ্যেই ছড়ানো-ছিটানো নানান রূপকব্যঞ্জনাধর্মী বয়ান— যা সুপ্ত, যা নিঝুম প্রোথিত, পাঠকের বিনির্মাণপন্থী খননক্রিয়ায় স্বতন্ত্ররূপে অনুধাবনযোগ্য ও বিতর্কমূলক, অর্থাৎ আপাত একটি আভিধানিক আলাপনে, প্রতিনিধিত্বমূলক পরিসরের ভিতর, লুক্কায়িত কোনো রূপকভাষ্যের প্রবালদ্বীপ, যেমন, 'দুরাশা' গল্পে যমুনার নির্জন খেয়াঘাটে কেশরলালের নিরালা জীর্ণ নৌকা অথবা 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে 'সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের' মধ্য দিয়ে চলা শশীভূষণের নৌকা, 'মহামায়া' গল্পে মন্দিরের 'অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট' কিংবা ভাঙা ঘাটের সোপানে নদীর জলের ছন্দোময় আঘাতের ধ্বনি, প্রতিকূল ঝড় কিংবা উড়ন্ত কাঁকর, 'নষ্টনীড়' গল্পে অমলের মশারির ওপর কারুকাজ রাখার বাসনা, 'জীবিত ও মৃত' গল্পের প্রদীপ-নেভা অন্ধকার, অথবা আরও একটু বিতর্কিতভাবে 'সমাপ্তি' গল্পে মহাজনী ইঁটের পাঁজা বনাম কাদার পিচ্ছিলতা ও 'পণরক্ষা'

গল্পের বাঁশঝাড়ের বর্ণনা প্রভৃতি), ৪. প্রত্নপ্রতীকের পুনর্গঠন (একটি কোনো পরিচিত প্রতীকভাবনা, যেটিকে ভেঙেচুরে নতুন পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হচ্ছে, বিশেষরকম বিকল্পায়নের মধ্য দিয়ে তাকে নতুনতর তাৎপর্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে, যেমন, *লিপিকা*-র 'সুয়োরানীর সাধ', 'রাজপুত্তুর', 'ভুল স্বর্গ', 'পরীর পরিচয়' প্রভৃতি), ৫. প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব (শৈলীগতভাবে সেই বিশেষ যুক্তিবিভ্রম— যেখানে কোনো বিশেষ ফলাফলের পূর্বপ্রান্তে প্রযুক্ত অথবা নিম্নতলে নিযুক্ত প্রধান বা প্রকৃত কারণটিকে শনাক্ত করতে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে, বা তাকে বলপূর্বক উপেক্ষা করে, অন্য কোনো ছদ্ম বা গৌণ কারণকে উপস্থাপন করা হয়, *সে* শীর্ষক গ্রন্থটির 'গেছো বাবা' অংশটি), ৬. বিমিশ্র বা অবর্গীকৃত ব্যঞ্জনা (যেগুলিকে হয়তো উপরের কোনো গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত সেভাবে করা যাচ্ছে না, কিছু বিমূর্ততার বাস রয়ে যাচ্ছে, গোলাকার কোনো অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে না, অথবা একাধিক পরিকাঠামো উদ্ভটভাবে মিলেমিশে যাচ্ছে)। প্রভাতকুমার বা শরৎচন্দ্র প্রমুখের লেখার ওপরেও আলোকপাত করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু প্রথমত যথাযথ সময় ও পরিসরের অভাবে আর দ্বিতীয়ত ব্যঞ্জনাময়তার খুব বেশি উল্লেখযোগ্য উদাহরণের অভাবে সে পরিকল্পনা শেষমেশ বাতিল করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেবল শিরোনামের 'উত্তরোত্তর' শব্দটির তাৎপর্য ধরে রাখতে জগদীশ গুপ্তের গল্প থেকে কয়েকটি সূত্র স্বল্পকথায় আলোচিত হল।

'ভাবীকালের গল্পকাঠামোয় প্রচ্ছন্ন রূপকের সম্ভাবনাময় সম্ভার' শীর্ষক তৃতীয় পর্বটিতে মূলত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখের কিছু কিছু গল্পকে আমরা খাপছাড়াভাবে বেছে নিয়েছি, আর সেইসাথে আরেকটু তাত্ত্বিক উৎকর্ষ অনুধাবনের জন্য, পৃথকভাবে পর্বটির দ্বিতীয় খণ্ডে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যের মধ্যেও পূর্বালোচিত সম্ভাবনাগুলি বুঝে নিতে চেয়েছি (দুটি মাত্র উপন্যাস থাকায় আর সেগুলির চিহ্নায়কপ্রকরণও গল্পগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় আমরা সেগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি)। বলা বাহুল্য, এই পর্বের নির্বাচনটুকু তুমুল বিতর্কিত হতে পারে, কিন্তু 'কল্লোল-যুগ' বা আনুষঙ্গিক বা তৎপরবর্তী কথাসাহিত্যপুঞ্জের বিপুল তরঙ্গমালা থেকে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তুলে ধরার কাজ বাস্তবিকই মনে হয়েছে

দুরূহ। তা-ছাড়া, উপাত্তের সন্ধানে আরও নানানবিধ পাঠকৃতির গহনে আমরা হয়তো-বা অবগাহন করতেও পারতাম, কিন্তু তাতে করে আমাদের সামগ্রিক সিদ্ধান্তের খুব-খানিক রদবদল হত বলে বা আমাদের পাঠপ্রত্যয়গত প্রধানতম প্রবণতার বিশেষ কিছু হেরফের হত বলে আমাদের মনে হয়নি। এ-ছাড়া, প্রচ্ছন্ন রূপকের কথা শুধু বলা হলেও, পাশাপাশি প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব অথবা প্রত্নপ্রতীকের পুনর্গঠনের নমুনাও নানাসময় পাওয়া গেছে।

'বয়ানের কুটিল বিক্ষোভ ও ব্যঞ্জনার ক্রূর বিমিশ্রতা: গল্পহীনের গল্পকুহক' শীর্ষক চতুর্থ পর্বটিতে আমরা বিমল কর, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুব্রত সেনগুপ্ত, নবারুণ ভট্টাচার্য, সুবিমল মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প থেকে উদাহরণ জোগাড় করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই পর্যায়ে লেখকেরা প্রচলিত ঘটনামূলক গোলাকার গল্পকাহিনি পরিবেশনের বিরুদ্ধে নানাভাবে নানারকম প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রচেষ্টা করেছেন, আর সেই প্রচেষ্টার ছাপ তাঁদের শৈলী বা লিখনভঙ্গির মধ্যেও পড়েছে। বহু লেখকের বহু গল্পে প্লটবিচ্ছিন্ন খাপছাড়া ঘটনাস্রোত চিহ্নের ভিন্নতর ব্যঞ্জনার মাত্রাকে খুঁজে নিতে চাইছি। তবে যেহেতু আমরা চিহ্নের বিশ্লেষণের সূত্রে ইতোপূর্বেই নানারকম কাঠামো ও উপাত্তের খোঁজ পেয়েছিলাম, তাই এই পর্বের আলোচনাকে আমরা খানিক সংক্ষেপিত রেখেছি। প্রায় একই বা অনুরূপ উদাহরণের পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা আলোচনাকে অনর্থক প্রলম্বিত করতে চাইনি।

সবশেষে যে-কথাটি বলার তা হল, বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস লেখা বা বিশেষ বিশেষ কোনো চিহ্নের প্রয়োগের সংখ্যাতাত্ত্বিক সমীক্ষা পেশ করা আমাদের মোটিফ নয়; অথবা চিহ্নতত্ত্ব নিয়ে কোনো ছাত্রসহায়ক টীকাভাষ্য লেখাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং একজন আগ্রহী পাঠকের স্বাধীন ও সচেতন পরিসর থেকে 'নিবিড় পাঠের নন্দন'-কে উপভোগ করা ও চিহ্নের গহীন দ্যোতনাকে ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে ব্যবহৃত হতে দেখার গুরুত্বকে উপলব্ধি করাই আমাদের এই অভিসন্দর্ভের অনন্ত অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় 'অনন্ত', কারণ একটি অভিসন্দর্ভে অনেক কিছুর পরিক্রমা বাকি রয়ে যায়; তা-ছাড়া আমাদের মতে, একটি গবেষণাসন্দর্ভ কখনো একা একা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না— আলোচনা, পুনরালোচনা, সংশোধন, সংযোজন,

বিয়োজন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তা ক্রমশ পূর্ণতার দিকে এগোতে থাকে। একের সাথে বহুর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সেই তত্ত্বজ্ঞান আরও পরিশীলিত ও সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে। আমরা ভাবীকালের দিকে সেইরূপ প্রত্যাশায় চেয়ে আছি।

প্রথম অধ্যায়

চিহ্নের তাত্ত্বিক কাঠামোয় ব্যঞ্জনার শ্রেণিবিন্যাসগত ব্যাকরণ

১

চিহ্নতত্ত্বের ধারণা বিকশিত হয়েছিল মূলত দুটি ধারায়। একটিতে রয়েছেন সুইস ভাষাতত্ত্ববিদ ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর (১৮৫৭-১৯১৩)। অন্যটিতে আমেরিকান দার্শনিক চার্লস স্যান্ডারস পার্স (১৮৩৯-১৯১৪)। স্যসুর তাঁর তত্ত্ব-নির্মাণে 'semiologie' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন (যেটি স্যসুরের ১৮৯৪-এর পাণ্ডুলিপি থেকে পাওয়া যায়)। আর পার্স-এর ব্যবহৃত পরিভাষাটি ছিল 'semiotic'; স্যসুরের ধারাটি 'semiology' এবং পার্স-এর ধারাটি 'semiotics' নামে পরিচিত।

১৯১৬ সালে প্রকাশিত (স্যসুরের মৃত্যুর পর) *Course in General Linguistics* (ইংরেজি অনুবাদে— ১৯৮৩) বইটিতে স্যসুর তাঁর চিহ্নবিষয়ক ধারণাটির অবতারণা করেছেন। তিনি 'semiology' বলতে বুঝিয়েছেন 'a science which studies the role of signs as part of social life' (15-16) তাঁর চিহ্নসংক্রান্ত মডেলটি একটি দ্বিতল কাঠামোর উপর গঠিত। চিহ্ন(sign)-কে তিনি Signifier ('signifiant') ও Signified(signifie)-এর যোগফল হিসাবে দেখেছেন।—

> A linguistic sign is not a link between a thing and a name, but between a concept (signified) and a sound pattern (signifier). The sound pattern is not actually a sound; for a sound is something physical. A sound pattern is the hearer's psychological impression of a sound, as given to him by the evidence of his senses. (16)

স্যসুরের মতে, the signifier (the 'sound pattern') ও the signified (the 'concept')— দুটোই পুরোপুরি 'psychological'; অর্থাৎ signifier (চিহ্নায়ক) হল ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির একটি মনস্তাত্ত্বিক অবয়ব এবং সেটি যাকে নির্দেশ করছে তাও সরাসরি সেই বস্তুটি (স্যসুর যাকে বলছেন 'referent') নয়, বরং বস্তুটির একটি ধারণা। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, বক্তা একটি গাছের কথা উল্লেখ করতে চাইছেন। স্যসুরের মতে, 'গাছ' শব্দটি (অর্থাৎ এই ধ্বনিযূথটির

নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক অবয়বটুকু) 'বাস্তব' কোনো গাছকে (referent) প্রকাশ করছে না, প্রকাশ করছে গাছের একটা সাধারণ ধারণাকে যা আমাদের মস্তিষ্কে আগে থেকেই একটি ছবি-আকারে উপস্থিত। এক্ষেত্রে 'গাছ' শব্দটি হল signifier (চিহ্নায়ক) এবং শ্রোতার মগজস্থিত গাছের ছবিটি হল signified (চিহ্নায়িত) এবং 'গাছ' শব্দটির মাধ্যমে গাছের ধারণাকে চিহ্নায়িত করার সামগ্রিক প্রক্রিয়ায়, ধ্বনিগত কাঠামো ও ধ্বনিজাত ধারণার মধ্যকার সম্পর্কটিকে বলা হবে sign; ভাষার জগতে আমরা এভাবেই চিহ্ন (sign) তৈরি হতে দেখি।

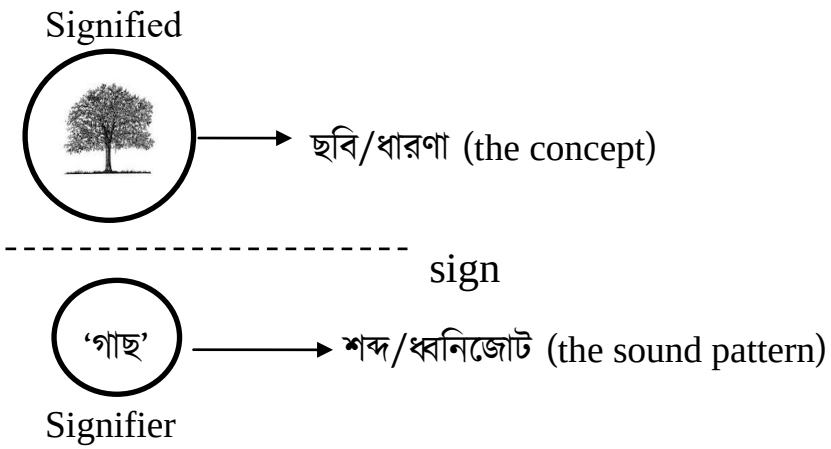

(ছক ১)

স্যসুর আসলে ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নের ব্যাপারটিতেই গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন অধিক এবং ধ্বনিকেন্দ্রিকভাবে বলা কথার উপরেই বিশেষাধিকার আরোপ করেছিলেন। লিখিত ভাষাকে স্যসুর দেখতেন একটি পৃথক, গৌণ, নির্ভরশীল অথচ সমতুল্য চিহ্নব্যবস্থা হিসাবে। সুতরাং এই সূত্র ধরে আমরা বলতেই পারি, লিখিত চিহ্নব্যবস্থার মধ্যে একটি শব্দের লিপিরূপ যথা 'Tree' (signifier) ওই ধ্বনিজোটকে signify করছে, গাছের ধারণা(concept) বা ছবিটিকে নয়।

এইভাবে দেখলে, written text-এর ক্ষেত্রে স্যসুরের মডেলটিকে গ্রহণ করলে তা একটি ত্রিতলবিশিষ্ট মডেলে পরিণত হয়।

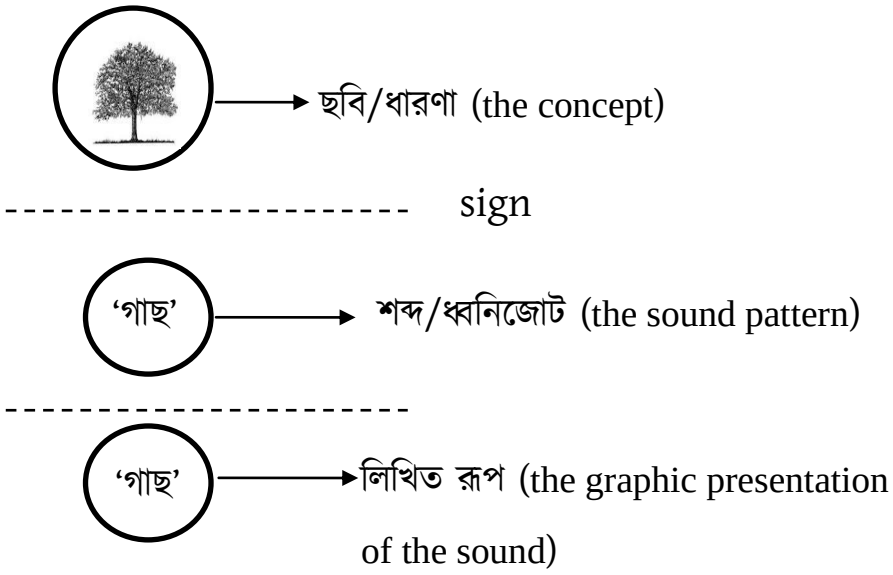

(ছক ২)

পরবর্তীকালে অবশ্য স্যসুরের মডেলটি সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে। Signifier বিষয়টি এখন তাই sign–এর material form হিসাবেই ধার্য হয়।

অপরপক্ষে পার্স-এর মতে চিহ্নতত্ত্ব (semiotic) হল 'formal doctrin of sign', যেটা 'logic'-এর সঙ্গে যুক্ত। পার্স তার পরিভাষাটি ধার করেছিলেন সপ্তদশ শতকের ব্রিটিশ দার্শনিক John Lock–র থেকে। পার্স-এর মতে, sign-এর তিনটি দিক:

১. The representamen: চিহ্ন যে রূপে অবস্থান করে (তা সবক্ষেত্রে পদার্থ নাও হতে পারে)।

২. An interpretant: চিহ্ন যে ধারণাটিকে (sense) নির্মাণ করে।

তাঁর কথায়, "A sign… [in the form of a representamen] is something which stands to somebody for something in some respect or capacity; It addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first sign." (1931/58: 2.228)

৩. An object: চিহ্নকে যার প্রতি নির্দেশ করা হয়।

স্যসুর দ্বিতলবিশিষ্ট মডেল এঁকেছিলেন, অপরদিকে পার্স-এর তত্ত্বটিকে পরবর্তী তাত্ত্বিকগণ ত্রিভুজ হিসাবে দেখতে চেয়েছেন (যদিও স্যসুরের মডেলেও গ্রহীতার আপেক্ষিকতা তথা পরিপ্রেক্ষিতগত প্রশ্নটি অঘোষিতভাবে জুড়ে আছে; সে-প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি)। তাই ত্রিভুজ মডেলটি দাঁড়ায়—

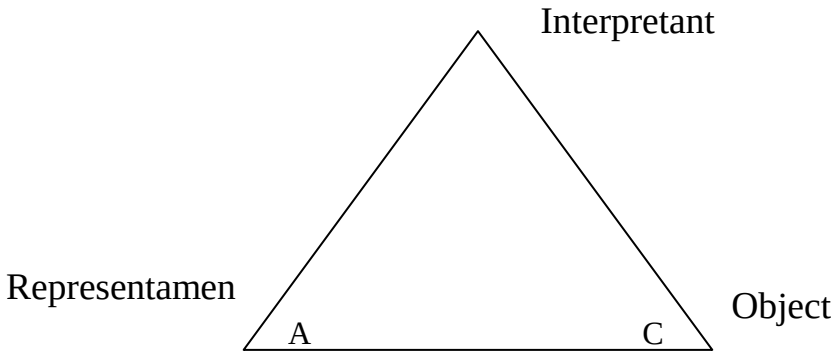

(ছক ৩)

একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে পারি। ট্র্যাফিক সিগন্যালের ক্ষেত্রে লাল আলো হল representamen; দাঁড়িয়ে-থাকা যানবাহন হল object এবং interpretant তথা ধারণাটি তৈরি হয় যে, লাল আলো এখন যানবাহনগুলিকে দাঁড়াতে নির্দেশ করছে (Chandler: 2002: 33)।

এই ত্রিভুজ মডেলটি পরবর্তীকালে আরও কোনো কোনো তাত্ত্বিক ব্যবহার করেছেন। একজন বিষয়টিকে 'Sign vehicle'(A), 'Sense'(B) ও 'Referent'(C) হিসাবে দেখেছেন (Noth: 1990: 89)। অপর দুই তাত্ত্বিক ওজেন ও রিচার্ডস দেখেছেন 'Symbol' (A), 'thought or reference' (B) এবং 'referent' (C) হিসাবে (1923:14)।

২

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ফ্রান্সে strutural critisism-এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত পাঁচজন তাত্ত্বিকের হাত ধরে। এঁরা হলেন: ক্লদ লেভিস্ত্রোউস, মিশেল ফুঁকো, রোলাঁ বার্ত, জাক লাঁকা এবং লুই আলথ্যুজার। এঁদের মধ্যে রোলাঁ বার্ত (১৯১৫-১৯৮০)

বিশেষভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমালোচনার ক্ষেত্রে আকরণবাদী[১] ভাবনার বিকাশ ঘটান। তাঁর *Mythologies* (1957) বইটির 'Myth Today' অংশে চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখান যে, কীভাবে ভাষার একটি বিশেষ পর্যায় myth হিসেবে নির্মিত হয়, যাকে তিনি বলছেন 'a second-order semiological system'(113); এখানে স্যসুরের মডেলটিকে (দ্র: ছক ১) ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করে তিনি চিহ্নের গঠনতাত্ত্বিক আলোচনায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যান। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ককে (অথবা চিহ্নক ও চিহ্নিতও বলতে পারি) আরও এক/একাধিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করে তিনি বলেন: "That which is a sign (namely the associative total of a concept and an image) in the first system, becomes a mere signifier in the second." (113)— অর্থাৎ চিহ্নায়নের প্রথম পর্যায়ে একটি Signifier ও Signified–এর মধ্যে গড়ে ওঠা Sign (যাকে বলা চলে denotation বা আক্ষরিক অর্থ) চিহ্নায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি Signifier হয়ে নতুন Signified–কে প্রকাশ করে (যাকে বলতে পারি connotation বা অভিপ্রেত অর্থ)। বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য তিনি নিম্নোক্ত অনুরূপ ছকটি ব্যবহার করেন:

<table>
<tr><td>Signifier</td><td>Signified</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">SIGN
Signifier</td><td>Signified</td></tr>
<tr><td colspan="3">SIGN</td></tr>
</table>

(ছক ৪)

এই প্রসঙ্গে বার্ত কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। 'Paris-Match' পত্রিকার উপরিপ্রচ্ছদ-সংক্রান্ত বিশ্লেষণটি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাতে ফরাসী সেনাপোশাকে এক নিগ্রো তরুণ, তার অঙ্গীকারসরল দৃষ্টি উপরদিকে (সম্ভবত ফ্রান্সের পতাকার দিকে) নিবদ্ধ রেখে অভিবাদন জানাচ্ছে— সেই ছবি (ছবি ১); যার সম্বন্ধে রোলাঁ বার্ত বলেন:

> On the cover, a young Negro in a French uniform is saluting, with his eyes uplifted, probably fixed on a fold of a tricolour… I see very well what it signifies to me: that France is a great empire, that

> all her sons, without any colour discrimination, faithfully serve under her flag, and that there is no better answer to the detractors of an alleged colonialism than the zeal shown by this Negro by serving his so called oppressors. I am therefore again faced with a greater semiological system: there is a signifier, itself already formed with a previous system (*a black soldier giving the French salute*); there is signified (*it is here a purposeful mixture of Frenchness and militariness*); finally there is a presence of signified through the signifier. (115)

সুতরাং ছবির বক্তব্য এই: ফ্রান্স একটি মহৎ সাম্রাজ্য, এবং জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে তার প্রতিটি নাগরিক তার পতাকাতলে নিবেদিতপ্রাণ। একজন কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকের অকুণ্ঠ ফ্রান্সীয় অভিবাদন, যেটি চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্ন হিসেবে গড়ে উঠেছে, তা-ই পরবর্তী পর্যায়ে চিহ্নায়ক হিসেবে ফরাসী জাতীয়তাবাদ ও সৈনিকত্বের এক উদ্দেশ্যমূলক মিশ্রণকে চিহ্নায়িত করছে। প্রথম পর্যায়টি ভাষাতাত্ত্বিক, দ্বিতীয় পর্যায় সাংস্কৃতিক।

এভাবেই রোলাঁ বার্ত স্যসুরিয়ান চিহ্নতত্ত্বকে সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আঙিনায় মুক্তি দেন। তা থেকে ফুটে ওঠে সংকেত, ফুটে ওঠে সতর্কীকরণ। এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তপোধীর ভট্টাচার্য (২০১৩ : ১৬৩) তাই লেখেন— "প্রত্নকথা নির্মাণের মধ্যে আড়ালে চলে যায় নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের স্তরগুলি এবং তাদের ভেতরের অসঙ্গতি। অর্থাৎ এতে স্পষ্টত একীকরণ প্রক্রিয়ার অগণতান্ত্রিকতায় পুষ্ট হয় শুধু স্থিতাবস্থাপন্থা। এ যেন বিচিত্র কূটাভাস কেননা জনমনোরঞ্জক প্রত্নকথা ও চিহ্নায়কের সম্মোহনে চাপা পড়ে যায় বাস্তব জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি।" তাই রোলাঁ বার্ত কথিত মিথ নির্মাণের প্রক্রিয়াগুলিকে, পঞ্চাশ-ষাট বছর পরেও, আমরা আমাদের নিজস্ব চারপাশে চিহ্নিত করতে পারি খুব সহজেই, চিনে নিতে পারি আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার স্বরূপ (ছবি ২, ৩)।

৩

বস্তুত রোলাঁ বার্ত ও অন্যান্য আকরণবাদী তাত্ত্বিকদের হস্তক্ষেপে চিহ্নের ধারণা যে ভাষার প্রাথমিক ‘arbitrary’ স্তর থেকে বাইরের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পরিসরে মুক্তি পেল, সেখান থেকে আমরা চিহ্নের সাহিত্যিক প্রয়োগের দিকটি বুঝে নিতে পারি, ছুঁয়ে ফেলতে পারি ব্যঞ্জনার বহুবিচিত্র স্তর।

১. কোনো একটি বিশেষ প্রেক্ষিতে কোনো একটি বিশেষ শব্দ বা শব্দবন্ধ তার অভিধাগত অর্থকে ছাপিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ধারণাকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারে। যেমন ‘গাছতলা’ ধ্বনিসমবায়টিকে (পদটিকে) চিহ্নায়ক হিসাবে ধরে বিষয়টি দেখতে পারি।

ধ্বনিযূথ (Signifier)

মূলস্তর	ছায়াশীতল গাছতলার ছবি (ধারণা) যেটা মনের মধ্যে গাঁথা (Signified)
Text (দ্বিতীয় পর্যায়)	(ধরা যাক) বন্ধুত্ব কিংবা আতিথেয়তার অনুষঙ্গ (Signified) যেটি গল্পের কাহিনিগ্রথন থেকে উদ্ভাসিত হচ্ছে; ছায়ানিবিড় গাছতলার বাস্তব ছবিকে অতিক্রম করে বন্ধুত্ব অথবা আতিথেয়তার ভাবকল্পরূপ ফুটিয়ে তুলছে।

(ছক ৫)

এই উদাহরণটি বার্তের মডেল অনুযায়ী হবে:

‘গাছতলা’ শব্দ (Signifier)	গাছতলার ধারণা (Signified)	
SIGN Signifier		বন্ধুত্ব বা আতিথেয়তার ধারণা (Signified)
SIGN		

(ছক ৬)

এভাবেই নিরন্তর চিহ্নের জট খুলে খুলে আমরা পাঠের অন্তর্নিহিত স্বরগুলির কাছে পৌঁছাতে পারি।

২. কখনো কখনো আবার একেকটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক অংশও (text-এর মধ্যে) সুনির্দিষ্টভাবে একেকটি বিশেষ তাৎপর্যকে প্রকাশ করে থাকে, বহুসংখ্যক নিহিত ছোটো ছোটো চিহ্নায়কের সমষ্টিগত বিন্যাসের মধ্য থেকে উদ্ভাসিত হয় বৃহত্তর একক চিহ্নায়িতের প্রতীতি, যা নির্ভর করে মূলত একটি সামগ্রিকতার উপর।

ধরা যাক একটি কাল্পনিক text: একটি চরিত্র (মতিন) গ্রামজীবন ছেড়ে প্রবেশ করবে নাগরিক জীবনে। উক্ত text-এর মধ্যে তার ভাষ্য তৈরি হতে পারে এইভাবে:

y^1	চরিত্রটি (মতিন) গ্রামজীবন ছেড়ে নাগরিক জীবনে প্রবেশ করে।
y^2	বল্লমপুর বাজারের মুখে বাসটা জরুরি টার্নিং নেয়। মতিন জানলার সিটেই বসেছিল, তবু নুয়ে-পড়া হিজলগাছ, ডোবার ধারে মানকচুর জঙ্গল, ঘাসজমির প্যাচপ্যাচে কাদা ও ছিপ-হাতে ন্যাংটো বালক দুটিকে সে আর দেখতে পায় না।

x

(ছক ৭)

এখানে আমরা ‘বাস’টিকে চলমান জীবন ও ‘বল্লমপুর বাজার’-কে পণ্যসভ্যতার সূচনাবিন্দু হিসাবে মনে করতে পারি। কিন্তু এখানে গ্রামজীবন এইরূপ কোনো বিশেষ চিহ্নায়কের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে না। তা একটি আপাতদীর্ঘ বর্ণনামূলক ছবির মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। এখানে ‘নুয়ে পড়া হিজলগাছ, ডোবার ধারে মানকচুর জঙ্গল, ঘাসজমির প্যাচপ্যাচে কাদা ও ছিপ হাতে ন্যাংটো বালকদুটি’— এই সমগ্র ডিটেলিং-টিই হয়ে উঠেছে গ্রামজীবনের চিহ্নায়ক।

<table>
<tr><td>‘নুয়ে-পড়া হিজলগাছ... ন্যাংটো বালক দুটি’, (Signifier)</td><td>এককথায় গ্রামের পরিবেশ (Signified)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">SIGN
Signifier</td><td>গ্রামজীবন
(Signified)</td></tr>
<tr><td colspan="3">SIGN</td></tr>
</table>

(ছক ৮)

এখানে চারটি পৃথক পৃথক চিহ্নায়কের সমষ্টি ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস একটি নির্দিষ্ট চিহ্নকে নির্মাণ করছে। এভাবেই চিহ্নের বোধ নিরন্তর ক্রমপ্রবহমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। পরিসর তৈরি হতে থাকে বহুস্বর-সম্ভাবনার।

৩. আরেকটু তলিয়ে ভাবলে, প্রক্রিয়া যেহেতু ক্রমপ্রবহমান, আর পরিসর যেহেতু বহুস্বর-সম্ভাবনার, তা একদিকে যেমন পাঠকের জন্য খুলে দিতে পারে পূর্বনির্ধারিত চিহ্নায়িতের বয়ানকে উপেক্ষা করে চিহ্নায়কের নিত্যনতুন তাৎপর্য উন্মোচনের স্বাধীন দরজা, মেলে ধরতে পারে বিচরণযোগ্য উন্মুক্ত প্রান্তর— যাকে রোলাঁ বার্ত বলছেন ‘a galaxy of signifiers’ (1970/1990 : 5), সংকটের বিষয় হল, এই একই পদ্ধতিতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে চিহ্নায়িতের বিলুপ্তিকরণ ও পুঞ্জীভূত চিহ্নায়ক-সমূহের নিরঙ্কুশ পণ্যায়নের পথ বেয়ে ফুটে উঠছে তীব্র অশনিসংকেত, যা ধীরে ধীরে সময়ের বহুস্বরকে রুদ্ধ করে জন্ম দিতে চাইছে একমাত্রিক মায়াপৃথিবীর, যার সম্বন্ধে জাঁ বদ্রিলার বলেন, “The sign no longer designates anything at all. It approaches its true structural limit which is to refer back only to other

signs. All reality then becomes the place of a semiurgical manipulation, of a structural simulation." (1973/1975 : 128)। বিগত কয়েক দশক জুড়ে এই সত্য আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এভাবেই বিশ্বায়নপ্রসূত পুঁজিবাদ কার্যত রচনা করতে পেরেছে চিহ্নের মৃত্যুপরিস্থিতি; লক্ষ লক্ষ চিহ্নায়কের ভিড় ঠেলে আমাদের পৌঁছানোর নেই কোথাও, পথও নেই এগিয়ে চলার, শূন্যতার অতল ঘূর্ণিগহ্বর ব্যতীত। কারণ সীমাহীন শোষণ ছাড়া পুঁজিবাদের নিজস্ব কোনো ভাবাদর্শ নেই, সাংস্কৃতিক রাজনীতি[২] আর রাজনৈতিক অর্থনীতির কুহক ছাড়া ধর্ম নেই কোনো, সে কেবল স্বার্থমাফিক সুকৌশলে সমস্ত কিছুকে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত করতেই পটু। প্রয়োজনে চূড়ান্ত নারী-স্বাধীনতার ধারণাকেও সে যেমন ব্যবহার করতে পারে, আবার ভয়াবহ রকমের রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক নীতিনিষেধগুলিকেও কাজে লাগাতে পারে চতুর ভঙ্গিতে; সুবিধেমতন দরিদ্র শ্রমজীবী গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন অথবা চটুল ও চোখ-ধাঁধানো উচ্চবিত্ত সংস্কৃতির জৌলুষের মোহমুগ্ধ প্রদর্শন— দুটিই সে করে থাকে অত্যন্ত নিপুণভাবে। বলা বাহুল্য, নারী-স্বাধীনতা কিংবা পুরুষতন্ত্র, শ্রমজীবী শ্রেণির ধূসর দারিদ্র কিংবা উচ্চবিত্তের স্বর্ণাভ জৌলুষ— কোনোটিই বিশেষভাবে তার অভিপ্রায় নয়, তার অভীষ্ট কেবল পুঁজির ক্ষমতায়ন ও মুনাফা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, টেলিভিশনের পর্দায় একটি জনপ্রিয় বাংলা গেম শো-এর মঞ্চে (এই সম্পর্কিত তথ্য পরবর্তীতে আর প্রাপ্ত নয় বলে গেম শো-টির নাম উল্লেখ করা গেল না, অবশ্য এই তথ্যবিলুপ্তিরও নিজস্ব মোটিফ রয়েছে, যেহেতু ইন্টারনেটে প্রাপ্ত এপিসোডগুলি অধিকাংশই 'সেলিব্রিটি' ব্যক্তিবর্গের উপর আধারিত) একটি সুসজ্জিত রিকশার পাশে এক গরিব বৃদ্ধ মানুষ কৃতজ্ঞ আবেগপূর্ণ অশ্রুকণ্ঠে জানাচ্ছেন যে, তাঁর সন্তান (সম্ভবত পুত্র) উক্ত মঞ্চে প্রতিযোগী হিসেবে উপস্থিত হয়ে রিকশাচালক বাবার স্বপ্নপূরণ করেছে। বিজ্ঞাপনের ভিডিওতে বিশেষভাবে ফোকাস করা হয়েছিল ওই 'রিকশাওয়ালা' শব্দটিকে। কিন্তু সেই মানুষটি, বা আমরা বিহ্বল দর্শক, কেউই খেয়াল করলাম না: একটি শ্রমজীবী সত্তা, একটি অবদমিত শ্রেণিপরিচয়, কী প্রক্রিয়ায় পণ্যে রূপান্তরিত হল। আর কী প্রক্রিয়ায় চ্যানেলের কাঙ্ক্ষিত T.R.P. চোখের আড়ালে হল ঊর্ধ্বগামী। এইভাবে প্রায়শই দেখা যায়

প্রলেতারিয়েত শ্রেণিচরিত্রকে এনে ফেলা হচ্ছে পেতিবুর্জোয়ার স্তরে, বিনা বন্দুকেই কার্যত নস্যাৎ করে দেওয়া যাচ্ছে শ্রেণিসংগ্রামের যাবতীয় প্রেক্ষিত।

৪. এইরকম পরিস্থিতিতে বাখতিনকথিত (১৮৯৫-১৯৭৫) 'carnival'-এর (*wikipedia*) ধারণা মনে টোকা দেয়। কার্নিভাল মূলত একটি 'Western Christian' বাৎসরিক উৎসব বা মেলা। সেই মেলার চারটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বাখতিন নজর করেছিলেন, যেগুলিকে তিনি সাহিত্যের প্রায়োগিক তত্ত্বের সাথে অন্বিত করতে চেয়েছেন। সেগুলি হল: প্রথমত মানুষের মধ্যে পরিচিত মুক্ত মেলামেশা, অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ব্যবহারগুলির সাবলীল গ্রহণ, বিপরীত জোড় সম্পর্কিত নিয়মাবলীকে অস্বীকার করা, এবং তথাকথিত অপরাধমূলক কাজের জন্য সেরূপ শাস্তি না-পাওয়া। দেখতে গেলে এইসব আপাত বিশৃঙ্খল বৈশিষ্ট্যগুলি তৎকালীন প্রেক্ষিতে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ-শাসিত সমাজব্যবস্থায় এক প্রতিস্পর্ধী ভাষ্য হিসেবে আবিষ্কারযোগ্য ছিল। বাখতিন তাঁর *Rabelias and His World* (1965, translated in english 1984) বইতে দেখাতে চেয়েছেন যে, কার্নিভালের বহুস্বরসঙ্গতি, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অপ্রত্যাশিত আচরণ, প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সাহিত্যের আঙ্গিকে সম্পৃক্ত হলে তা স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

আমাদের বলার বিষয়: আজকের এই একমেরু বিশ্বে পুঁজিবাদও অনুরূপ এক কার্নিভাল তথা মেলাপরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে, যা সামন্তযুগীয় কার্নিভালের যাবতীয় প্রেক্ষিত ও মোটিফগুলি থেকে চ্যুত। যেহেতু আগেই বলেছি পুঁজিবাদের নিজস্ব কোনো ভাবাদর্শ নেই, প্রয়োজনমাফিক সবকিছুকেই সে দ্রুত বিশেষ স্বার্থে পুনর্গঠন করে ফেলে, তাই মানব-সভ্যতার সমস্ত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ব্যুমেরাং হয়ে উঠতে বাধ্য। বিশ্বজোড়া মায়াকার্নিভালের ভেতর তাই চ্যালেঞ্জ জানানোটাও হয়ে পড়ছে কার্যত ছায়াবাস্তব।

এই সংকটের বিন্দুগুলি থেকে উত্তরণের উপায়ও আমাদের নিশ্চয় বাখতিনের মধ্যেই খুঁজতে হবে। *The Dialogic Imagination* (1975) বইতে তিনি যে দ্বিবাচনিকতার ধারণাকে বিকশিত করেছেন তা কার্নিভালের পাঠ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে। 'দ্বিবাচনিকতা' কী? দ্বিবাচনিকতা মূলত বহুসংখ্যক

চিহ্নের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া (interaction)। যার ভিতর দিয়ে আপনাআপনিই নির্মিত হয় সময়ের বয়ান। মানুষ, সমাজ ও সময়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরগুলির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুর পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া ও সম্পর্কের বিন্যাস থেকেই হয়তো আমাদের চিনে নিতে হবে মানুষের প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকা ও সংগ্রামের জটিল স্বরূপ।

৫. দেরিদার বিনির্মাণবাদী ভাবনার প্রেরণায় আমরা চিহ্নতত্ত্বে লেখক, পাঠক ও প্রেক্ষিতের যোগাযোগটিকে নিজেদের মতো করে নিরীক্ষণ করব। এই 'বিনির্মাণ' (ওরফে 'অবিনির্মাণ') যদিও একইসাথে 'অনির্মাণ' ও একইসাথে 'বিশেষরূপে নির্মাণ'-ও বটে[৩], তথাপি, বিনির্মাণের সঙ্গে পুনর্নির্মাণের মিল-অমিল-যোগাযোগ-ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ঠিক কেমন ধাঁচের, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলপিনবিন্দুসমূহ বিষয়ে আমরা সেভাবে সুনিশ্চিত নই বলে, বিনির্মাণের সাথে সাথে পুনর্গঠনের বিষয়টিকেও এখানে (পৃথকভাবে) জুড়ে নিতে চাই। চিহ্নের আলোচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ একক হল সময় (t) এবং পরিসর (s)। এখানে আমাদের বক্তব্য— কোনো একটি টেক্সট-এর ভিতরে আসলে তিনটি সময় কাজ করে। ১. আখ্যানকাল; ২. লেখনকাল; ৩. পঠনকাল (পরিসরও যুক্ত থাকে এগুলির সঙ্গে)। এগুলিকে আমরা নামাঙ্কিত করতে পারি যথাক্রমে ts_1, ts_2, ts_3 — এই তিনটি এককে। এর মধ্যে যে-কোনো দুটি, বা তিনটিই একও হতে পারে। সে যা-ই হোক, চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ক উক্ত একক তিনটির বিন্যাসে যেটা দাঁড়ায় তা হল: ts_1 চিহ্নায়ক হলে, চিহ্নায়িত ts_2, তা থেকে যে চিহ্ন উঠে আসে তাও আবার চিহ্নায়ক আকারে ts_3-কে চিহ্নায়িত করে [দ্র: ছক ৪]। এইভাবে সময়ের একেকটি পরত পেরিয়ে ফুটে ওঠে চিহ্নায়কের বয়ান। এইভাবে আখ্যানকালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান লেখক, আর আখ্যানকালের সাথে সাথে লেখনকালের অন্তর্ভুক্ত হন পাঠকও। আখ্যানকালকে (বিনির্মাণ এবং) পুনর্গঠন করেন লেখক, পাঠকও তাকে বিনির্মাণ (এবং পুনর্গঠন) করেন, পাশাপাশি লেখনকালকেও। সুতরাং অতীত, বর্তমান ও ভাবীকাল— সবটুকুই বুঝি-বা পঠনপাঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ফলত লেখার ব্যঞ্জনাও হয়ে ওঠে অনন্ত-সম্ভাবনাময়।

কিন্তু এই বিনির্মাণ যিনি করেন তিনি কি লেখক? রোলাঁ বার্ত লেখকের মৃত্যুর বার্তা এনেছিলেন (1977: 142-148)। অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিপরিচয়, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য

এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমান ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রক-সত্তা (authority)— সবটুকুই লিখনক্রিয়ার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। বাখতিনও যে দ্বিবাচনিক পরিসরের কথা বলেছেন তাতেও লেখকের সচেতন খবরদারি কাঙ্ক্ষিত নয়। ব্যক্তি-লেখক একটি বৃহত্তর নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়ার অংশমাত্র। তাই লেখার টেবিল কার্যত প্ল্যানচেট-টেবিল, লেখক নামক প্রাণিটিকে মাধ্যম করে স্বয়ং সময় লিখে দিয়ে যাচ্ছে তার নিজস্ব বয়ান। তাকে বিনির্মাণও (অথবা পুনর্গঠনও) করে চলেছে সময়। পাঠকও কি তা-ই? তবে লেখা ও পড়ার এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে কি একটি সময়-পরিসরের হাতে ভিন্ন আরেকটি সময়-পরিসরের বিনির্মাণ (এবং/অথবা পুনর্গঠন) বলে ভাবা চলে?

৪

চিহ্নের আলোচনায় আমাদের নজর দেওয়া জরুরি যে, রোলাঁ বার্ত ভাষার মিথ নির্মাণের প্রক্রিয়া শনাক্ত করুন বা জাক দেরিদা বিনির্মাণের কথা বলুন বা মিখাইল বাখতিন সময়ের অন্তর্লীন দ্বিবাচনিকতাকে চিহ্নিত করুন, সেভাবে কোনোটাই কিন্তু বিচ্ছিন্ন আবিষ্কার নয়, বা স্যসুরকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করে পল্লবিত নয়। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে দেখব, এই মিথ-বিনির্মাণ-দ্বিবাচনিকতা কীভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত, সেগুলির চিন্তাবীজ কোনো-না-কোনোভাবে স্যসুরের তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, স্যসুর চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ককেই মূলত চিহ্ন বলেছেন, কিন্তু এই চিহ্নের মূল্য (‘value’) নির্ভর করে পুরোপুরি ‘context’-এর উপর। Context-এর বাইরে চিহ্নের কোনো চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় মূল্য নেই। স্যসুর দাবার ঘুঁটির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। একই signifier ও signified-এর তাৎপর্য context অনুযায়ী আলাদা।

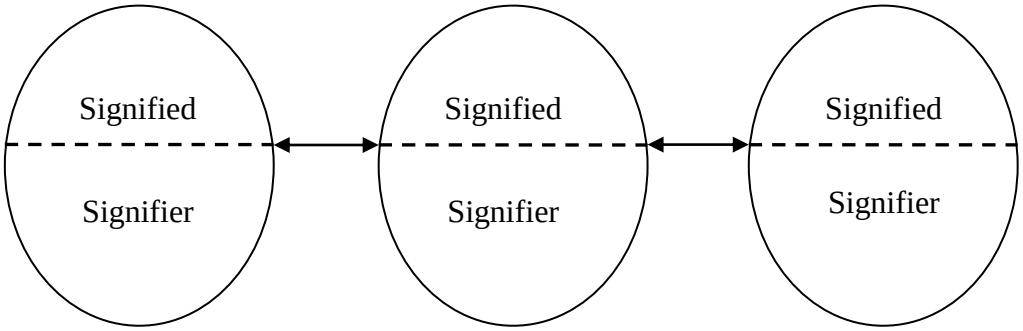

(ছক ৯)

সুতরাং প্রেক্ষিতের তারতম্য অনুযায়ী চিহ্নের তাৎপর্য নির্ধারিত ও পরিবর্তিত (অথবা পরিবর্ধিত) হওয়ার যে বোধ— তার মধ্যেই রয়েছে অর্থের প্রসার, অর্থমুক্তির ডানা, রয়েছে বিনির্মাণের তাগিদ, বহুস্বরবিন্যাস ও দ্বিবাচনিকতার অঙ্কুর। স্যসুর যে পূর্বোল্লিখিত দাবার বোর্ডের উপমাটি প্রয়োগ করেছেন সেখানে আমরা দেখি, প্রত্যেকটি 'individual' ঘুঁটির চালচলন, গুণাগুণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মূল্য-তাৎপর্য, এমনকি তার বাঁচা-মরা অবধি নির্ভর করছে অন্যান্য ঘুঁটির সাপেক্ষে তার (ও সেইসাথে অন্যান্য ঘুঁটির পরস্পরের) অবস্থান ও সম্পর্কের বিন্যাসের উপর; যা মানুষ ও তার চারপাশের পৃথিবী সম্বন্ধে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসেবে গণ্য হতে পারে। স্যসুর যদিও এইসকল তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগমাত্রাকে ভাষার 'arbitrary' স্তরগুলির বাইরে প্রসারিত করার কথা সেভাবে ভাবতে চাননি, তবু তার ভিতর নিহিত দার্শনিক সম্ভাবনাকে অবলম্বন করে আমরা পেয়ে যাই চিহ্নের বহুস্তর ভাঁজ কিংবা বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাকে ছুঁয়ে ফেলার প্রশ্রয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, 'সিন্দুক' এই চিহ্নায়কটি বেষ্টিত আবদ্ধ একটি আধারের ধারণাকে signify করছে। কোনো একটি আখ্যানের মধ্যে তা কোনো ব্যক্তিমানুষের হৃদয়কে বোঝাতে পারে যা কোনো একটি বিশেষ ভাবকে সযত্নে সংরক্ষিত করেছে। আবার ভিন্ন কোনো আখ্যানের ভিতর, ভিন্ন কোনো পাঠপ্রতিক্রিয়ায়, তা হয়তো একটি বদ্ধ সমাজব্যবস্থাকে চিহ্নিত করতে পারে, যার মধ্যে পুরোনো মূল্যবোধগুলিকে অভ্যাসগতভাবে আগলে রাখা আছে।

আমাদের পূর্বোক্ত যুক্তির সপক্ষে এখানে দাখিল করা চলে স্যসুরের অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন ও নাকচকরণের তত্ত্বটিকে। সেটি চিহ্নের অন্তঃবৈশিষ্ট্য হিসাবে খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। স্যসুরের মতে, 'Cat' শব্দটি আসলে নিজেকে প্রকাশ করার পাশাপাশি 'Cow', 'Dog' ইত্যাদির না-হওয়াকেও বোঝায়। স্যসুর— Syntagmatic ও Paradigmatic : এই দুটি তলকে ব্যবহার করে একটি graph–এর ধারণা দেন। সেই বিচারে আমাদের ব্যবহৃত কোনো কোনো মৌখিক বাক্যের মধ্যেও দেখা যায় উপরিতলের কোনো একটি ধ্বনির নিম্নতলে কীভাবে একাধিক ধ্বনির নাকচকরণ প্রকাশ পায়। যেমন—

Y	ওরা	গাছ	পেরিয়ে গেল
Paradigmatic)	~~আমি~~	~~জল (কলসি থেকে)~~	~~গড়িয়ে খেলাম~~
		~~চাটাই~~	~~বিছিয়ে দিলাম~~

X (Syntagmatic)

(ছক ১০)

লক্ষণীয়, 'গাছ' শব্দটি এখানে 'জল', 'চাটাই' প্রভৃতি একাধিক শব্দের নাকচকরণের মধ্য থেকে বিশেষ এক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে উঠে আসছে। তেমনি আবার 'গাছ'-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 'পেরিয়ে গেলাম' ক্রিয়ারূপটিও উঠে আসছে 'গড়িয়ে খেলাম', 'বিছিয়ে দিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়ারূপের এইসব না-হওয়া থেকে। এটুকু স্পষ্ট: এই পুরো প্রক্রিয়াটিই ঘটতে থাকে পরস্পরসংযুক্ত পার্থক্যের বোধ বা দ্বিবাচনিক সম্পর্কের নিরিখে। পাশাপাশি একথাও আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না যে এই নির্বাচনের একটি নিজস্ব রাজনীতি আছে, এবং তাকে ব্যক্তিগত পুরোপুরি বলা যায় না কিছুতেই।

ভাষাতাত্ত্বিক এইরূপ নাকচকরণের নিয়ম সাহিত্যের চিহ্নায়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কাজ করে। কোনো একটি বিশেষ ভাবকে ব্যঞ্জিত করার জন্য একাধিক চিহ্নায়কের ভিড় থেকে খুঁজে নিতে হয় বিশেষ কোনো একটি চিহ্নায়ক। চিহ্নায়কের এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার গুণগত মানই নির্ধারণ করে লিখনশৈলীর মান। বিষয়টি আরও একটু পরিস্ফুট করে তোলার জন্য আমরা ছক ৬-এর উদাহরণটিতে ফিরে যাব। সেখানে দেখেছি, 'গাছতলা' শব্দটি বন্ধুত্ব কিংবা আতিথেয়তার চিহ্নায়ক-রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু ছক ১০-এর বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে, বন্ধুত্ব বা আতিথেয়তার চিহ্নায়কস্বরূপ

‘গাছতলা’ শব্দটির প্রয়োগ আসলে আরও একাধিক সম্ভাব্য চিহ্নায়কের তালিকা থেকে উঠে আসছে নাকচকরণ ও নির্বাচনের পথ ধরে। যথা—

Y	আমরা	গাছতলায়	কিছুক্ষণ	জিরিয়ে নিলাম	Y^2
	আমরা	~~পুকুরঘাটে~~	কিছুক্ষণ	জিরিয়ে নিলাম	
	আমরা	~~মন্দিরদালানে~~	কিছুক্ষণ	জিরিয়ে নিলাম	
	আমরা	~~(তার) বন্ধুত্বে, আতিথেয়তায়,~~	~~কিছুদিনের জন্য~~	~~বিশ্রাম লাভ করলাম~~	Y^1

X

(ছক ১১)

সুতরাং ‘বন্ধুত্ব’ বা ‘আতিথেয়তা’ বোঝাতে ‘পুকুরঘাট’ অথবা ‘মন্দিরদালান’-ও প্রযুক্ত হতে পারত। কিন্তু প্রেক্ষিতের (কল্পিত) দাবি মেনে ‘পুকুরঘাট’ ও ‘মন্দিরদালান’-এর নাকচকরণের ফলে চিহ্নায়ক হিসাবে স্থান পেল ‘গাছতলা’ শব্দটি।

৫

চিহ্নের সম্বন্ধে আরেকটু স্বচ্ছ ও ডিজিটাল ধারণা লাভ করতে গেলে চিহ্নের ধরনগুলিকে শনাক্ত করা ও সেগুলির বর্গীকরণ করা জরুরি। তাই আমাদের খানিক ফিরে যেতে হবে প্রাচ্যে ও প্রাচীনযুগে: নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন যখন ধ্বনিতত্ত্বের ধারণা প্রকাশ করেছিলেন, আর পরবর্তীতে সেই ধারাকে আরও বিকশিত করেছিলেন অভিনব গুপ্ত, সেই সময়খণ্ডে। এর আগে, প্রাচ্য নন্দনতত্ত্বের প্রাক্-ধ্বনিবাদী পর্যায়ে, বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে সাধারণভাবে শব্দার্থের দুটি স্তরের ধারণাই প্রচলিত ছিল। তা হল: অভিধা ও লক্ষণা। অভিধা শব্দের আক্ষরিক অর্থ। আর লক্ষণা তা-ই, যা অভিধাকে অস্বীকার করে ভিন্ন একটি অর্থ প্রকাশ করে থাকে। লক্ষণার দুটি ভাগ স্বীকৃত: প্রথমটি রূঢ়িলক্ষণা, দ্বিতীয়টি প্রয়োজন-লক্ষণা। রূঢ়িলক্ষণা হল শব্দার্থের কিছু আলগা বিচ্যুতিমূলক ব্যবহারিক নমুনা। যেমন— ধরা যাক, বলা হল ‘কলিঙ্গ সাহসিকা’, এতে আসলে ‘কলিঙ্গ’ নামক বিশেষ ভূখণ্ডটির সাহসিকতা চিহ্নিত

হয় না; বরং বক্তব্য দাঁড়ায় 'কলিঙ্গবাসী সাহসিকা', এইরূপ। বিষয়টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ব্যক্তিনামগুলির ক্ষেত্রেও কখনো কখনো দেখা যায়। অর্থাৎ কারো নাম 'নন্দলাল' হলে আমরা যেমন 'নন্দ', কিংবা 'কালীপদ' বা 'চণ্ডীচরণ' হলে তাকে যথাক্রমে 'কালী' বা 'চণ্ডী' নামে সম্বোধন করে থাকি, অথচ তাতে নামের সম্পূর্ণ ভিন্ন বিপরীত অর্থ প্রকাশ করা হয়। আর প্রয়োজন-লক্ষণা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট মানের। তা মূলত বাক্যের শক্তি, অর্থের নয়। এটির একটি প্রচলিত উদাহরণ হল: 'গঙ্গায় ঘোষবসতি'। এক্ষেত্রে গঙ্গার প্রবহমান জলস্রোতের উপর তো মানুষের বসতি কার্যত সম্ভব নয়, তাই বাক্যটির অর্থ করে নিতে হয়: 'গঙ্গাতীরে ঘোষবসতি'। উদাহরণটি স্পষ্ট হবে যদি রূঢ়িলক্ষণা ও প্রয়োজন-লক্ষণার পার্থক্যটিকে সূচিত করি। রূঢ়িলক্ষণা সাধারণ আলস্যজনিত প্রয়োগ (বিয়োগ), এর অধিক তার কোনো বিশেষ তাৎপর্য লক্ষিত হয় না। 'কালীচরণ' বললে যা মানে দাঁড়ায় 'কালী' বললেও তা-ই তাৎপর্য বজায় থাকে। কিন্তু 'গঙ্গাতীরে ঘোষবসতি' আর 'গঙ্গায় ঘোষবসতি' হুবহু এক প্রয়োগ নয়। 'গঙ্গায় ঘোষবসতি' বললে গঙ্গার শীতত্ব, পাবনত্ব ইত্যাদি ভাবধর্মগুলি ঘোষবসতির প্রাত্যহিক পরিমণ্ডলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, কিন্তু 'গঙ্গাতীরে ঘোষবসতি' বললে সেই অনুভূতিটুকু শ্রোতার মনে সেভাবে তৈরি হয় না।

পরবর্তীকালে ধ্বনিবাদীরা এসে 'লক্ষণা'-র পরিবর্তে বললেন 'ব্যঞ্জনা'-র কথা। ধ্বনিকার কাব্যার্থের দুটি ভেদ উল্লেখ করেছেন— বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মান অর্থ। সুধীর কুমার দাশগুপ্ত তাঁর *কাব্যালোক* (১৯৯৮) বইটিতে এই সম্পর্কে বলেন (১৬২)— "বাচ্যার্থ অভিধাশক্তি দ্বারা লভ্য মুখ্যার্থ; প্রতীয়মান অর্থ ব্যঞ্জনা-শক্তি দ্বারা লভ্য ব্যঙ্গ্যার্থ।" যাকে পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকেরা বলছেন যথাক্রমে denotation ও connotation — বহু পূর্বে পূর্বদেশেই প্রস্তুত ছিল তার ভিত্তিভূমি। সুধীরবাবু *ধ্বন্যালোক* থেকে একটি সংস্কৃত উদ্ধৃতি (যার বাংলা গদ্যানুবাদ মোটামুটিভাবে এইরকম যে, আলোকসন্ধানীকে যেরূপ দীপশিখার প্রতি যত্নবান হতে হয়, সেরূপ ব্যঙ্গ্যার্থকে যিনি মর্যাদা দেন তিনি বাচ্যার্থেরও কদর করেন: *ধ্বন্যালোক*, ১।৯) নিয়ে তার ব্যাখ্যাসূত্রে বলেন (ঐ), "দীপপাত্র, তৈল, বর্তিকা, এমন কি শিখা ও তাপ যেন বাচ্যার্থ; ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে দীপশিখা হইতে বিচ্ছুরিত তাহার প্রভা, তাহা গৃহের অন্তর ও বাহির সমস্তই আলোকিত করে।" (অর্থাৎ

চিহ্নায়কের ভিতর দিয়েই আমরা চিহ্নায়িতের কাছে পৌঁছাতে পারব)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ব্যঙ্গ্যার্থ, যাকে বলা হয় 'ধ্বনি', যা শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তিকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে, লক্ষণার সঙ্গে তার মূল পার্থক্য এই যে, তা লক্ষণার মতো অভিধাকে অস্বীকার করে গঠিত হয় না, অভিধা তথা বাচ্যার্থের মধ্য দিয়েই তাকে অতিক্রম করে প্রস্ফুটিত হয়।

ব্যঞ্জনা মূলত দুই প্রকার: শাব্দী ও আর্থী।

শাব্দী ব্যঞ্জনা (বলা চলে) বাক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু শব্দের প্রায়োগিক স্খলন, বিশৃঙ্খলা, সংকোচন অথবা সম্প্রসারণের উপর নির্ভরশীল। এটি দু-প্রকার: একটি অভিধা-মূলা, অন্যটি লক্ষণা-মূলা।

অভিধা-মূলা ব্যঞ্জনা তৈরি হয় অনেকার্থ-শব্দের প্রয়োগে, কিন্তু একটি বাচ্যার্থই মুখ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে, আর অন্যটি বা অন্যগুলি গৌণ। যেমন, 'শূলপাণি' শব্দটির সংকুচিত অর্থ 'মহাদেব'। শব্দটি আক্ষরিকভাবে কোনো বিশেষ মানবচরিত্রকে চিহ্নায়িত করার পাশাপাশি মহাদেবের ক্রোধ, দাপট ও মহিমাটুকুকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিমানুষটির বীরত্বের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রকাশ করছে।

লক্ষণা-মূলা ব্যঞ্জনা প্রয়োজন-লক্ষণারই উন্নত রূপ, যা অভিধাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে না, অভিধাকে সাথে নিয়েই ভিন্ন অর্থের দিকে তার যাত্রা। ইতিপূর্বে যে 'গঙ্গায় ঘোষবসতি' উদাহরণটির উল্লেখ করেছি, সেখানে 'গঙ্গা' যে-মুহূর্তে গঙ্গানদীটিকে অস্বীকার করে 'গঙ্গাতীর' বোঝাচ্ছে, সেইটুকু অবধি তা লক্ষণাশক্তির প্রকাশ; কিন্তু যে-মুহূর্তে গঙ্গার শীতত্ব, পাবনত্ব ইত্যাদি ভাবধর্মগুলি ঘোষবসতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন তা গঙ্গাতীর বোঝালেও গঙ্গানদীটিকেও অস্বীকার করছে না, তখনই শব্দের শক্তি ছুঁয়ে ফেলছে ব্যঞ্জনার স্তর। সুতরাং লক্ষণা শব্দার্থশক্তির আলাদা কোনো প্রকারভেদ নয়, বরং তা ব্যঞ্জনারই একটি বিশেষ পর্যায়ের একটি মৌল বিক্ষেপ।

এবার আসি আর্থী-ব্যঞ্জনায়[৪]। সুধীরবাবু এর একটি অসাধারণ সংজ্ঞা দিয়েছেন, "যে ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা বাচ্যার্থকে আশ্রয় করিয়া বক্তা, বোদ্ধব্য, প্রকরণ, দেশ, কাল, কণ্ঠস্বর বা অঙ্গচেষ্টা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যহেতু অন্য একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম অর্থগত বা আর্থী ব্যঞ্জনা" (১৬২)। এই সংজ্ঞাটির মধ্যে কার্যত স্যসুরের প্রেক্ষিত, বার্তের প্রত্নকথা ও দেরিদার বিনির্মাণ-সম্পর্কিত ভাষ্য লুকিয়ে আছে।

ব্যঞ্জনার এই সাধারণ প্রকারভেদ সম্বন্ধে জানার পর আমরা দেখে নেব ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন প্রবণতার বৈচিত্র্য অনুযায়ী ধ্বনিকে কী কী ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁরা মূলত ধ্বনির যে-দুটি প্রকারভেদকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তা হল: অ-বিবক্ষিত-বাচ্য এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য।

বাচ্যার্থ যেখানে কোনোভাবেই বিবক্ষিত (উদ্দিষ্ট বা অভিপ্রেত) নয়, প্রতীয়মান অর্থই মূল, ধ্বনি সেখানে অ-বিবক্ষিত-বাচ্য। এটি দু-প্রকার: অর্থান্তরে-সংক্রামিত (যেখানে বাচ্যার্থ নিজেকে সরিয়ে রেখে অন্য অর্থ বোঝায়) এবং অত্যন্ত-তিরস্কৃত (যেখানে বাচ্যার্থ নিজেকে অত্যন্ত তিরস্কৃত করে অর্থাৎ একেবারেই দূরে ঠেলে দিয়ে প্রায় বিপরীত অর্থ বোঝায়)। এই দুটি ভাগের ব্যবধান যে যথেষ্ট সূক্ষ্ম আর জটিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর বাচ্যার্থ যেখানে বিবক্ষিত হয়েও তা অন্য একটি অর্থকে প্রধানরূপে প্রকাশ করে, সেখানে আমরা পাই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি। এটিও দুই প্রকার: অসংলক্ষ্য-ক্রম (যেখানে প্রক্রিয়াটুকু খুব দ্রুত আর সূক্ষ্মভাবে নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ ক্রমটিকে তেমন লক্ষ করা যায় না) এবং সংলক্ষ্য-ক্রম (যেখানে প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট, দৃশ্যমান)।

ধ্বনির এই পুরাতন প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণিবিভাজনটিকে মাথায় রেখে আমরা চিহ্নের সেই প্রস্তাবিত বর্গীকরণের পথে হাঁটব, যা আমাদের বর্তমান সন্দর্ভটির জন্য একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে তার আগে আমাদের পাড়ি জমাতে হবে অন্য এক তথাকথিত আধুনিককালীন প্রতিষ্ঠানগৃহের দরজার দিকে। চিহ্নবিজ্ঞানের আমেরিকান ঘরানারূপে যা সুপরিচিত। যার অন্যতম মধ্যমণি চার্লস স্যান্ডারস পার্স। তিনি তিনটি পর্যায়ে চিহ্নের যে একটি সম্ভাব্য শ্রেণিবিভাজন করেছিলেন (1931/58: 1.291, 2.243) তার দ্বিতীয় পর্যায়টিকে স্যসুরের তত্ত্বে প্রয়োগ করলে প্রধানত চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িত সম্পর্কের তিনটি প্রকারভেদ পাওয়া যায়:

১. **প্রতীক** (symbol/symbolic) : এক্ষেত্রে চিহ্নায়ক চিহ্নায়িতের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত বা অন্বিত নয়, উভয়ের মধ্যে এমন এক সাধারণ প্রথাবদ্ধ সম্পর্ক বিরাজমান[৫], যা বিশেষ কোনো 'যুক্তি' অনুসারে নির্ধারিত নয়, যাকে বলা চলে 'fundamentally arbitrary' কিংবা 'purely conventional' (Chandler : 36-37)। এই শ্রেণিতে যে

ধ্বনি তৈরি হয় তা মূলত অ-বিবক্ষিত-বাচ্য, কখনো তা হয় অর্থান্তরে-সংক্রামিত, কখনো-বা অত্যন্ত-তিরস্কৃত। প্রতীকের উদাহরণ হিসেবে লিপি, জ্যামিতিক নকশা, ট্রাফিক আলো, জাতীয় পতাকা প্রভৃতির কথা বলা যায়।

২. **প্রতিমা** (icon/iconic) : এখানে চিহ্নায়ক চিহ্নায়িতকে অনুকরণ করে গঠিত হয়, এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কোনো-না-কোনোভাবে ভৌত অথবা গুণসাপেক্ষ সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল। পার্স যদিও বিষয়টিকে image, diagram আর metaphor— এই তিনটি উপশ্রেণিতে ভাগ করেছেন, কিন্তু আমরা এখানে আমাদের সন্দর্ভের প্রয়োজনে একে দুটি ভাগে ভাগ করব।—

ক) **মূর্ত** ('image' and/or 'diagram') : মূলত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাদৃশ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই ভাগটিকে আমরা সংলক্ষ্য-ক্রম বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির পর্যায়ে ফেলতে পারি। উদাহরণস্বরূপ ভাস্কর্য, আলোকচিত্র, কার্টুনচিত্র, পট, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যান্ত্রিকভাবে অনুকরণ-করা পশুপাখির ডাক প্রভৃতির কথা বলা যায়।

খ) **ভাবসাদৃশ্যগত** ('metaphor' and/or more) : এখানে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত সম্পূর্ণ পৃথক দুটি সত্তা, কিন্তু পরস্পরের কোনো-না-কোনো (এক বা একাধিক) সাধারণ সাদৃশ্যবাচক ভাব কিংবা ধর্মকে অবলম্বন করে তারা সম্পর্কযুক্ত হয়, যা সবক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নাও হতে পারে। এটিও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির স্তর। সংলক্ষ্য-ক্রম বা অসংলক্ষ্য-ক্রম দুই-ই হওয়া সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে আমাদের পূর্বোল্লিখিত গাছতলা ও বন্ধুত্ব-বিষয়ক নমুনাটিকে এখানে হাজির করা যায়। 'গাছতলা' একটি স্থান এবং 'বন্ধুত্ব' বা 'আতিথেয়তা' একেকটি ভাবক্রিয়া, উভয়ের দৃশ্যত কোনো সাদৃশ্য নেই, কিন্তু উভয়ই দগ্ধ ক্লান্তজনকে প্রয়োজনীয় আশ্রয় দিতে পারে। তাই 'গাছতলা' চিহ্নায়কটি এক্ষেত্রে রূপকধর্মী[৬], অথবা অলংকারগুণে রূপকাতিশয়োক্তি।

৩. **নির্দেশক** (index/indexical) : এই শ্রেণিতে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত শারীরিক বা কার্যকারণগতভাবে সরাসরি সংযুক্ত[৭]। একেও আমরা আমাদের সুবিধার্থে দু-ভাগে ভাগ করে নেব।—

ক) **প্রতিনিধিত্বমূলক** (representaive) : এখানে চিহ্নায়ক শারীরিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চিহ্নায়িতের সঙ্গে যুক্ত, চিহ্নায়িতেরই বিশেষ কোনো অংশ (অথবা তার

উল্টোটিও হতে পারে)। এটিও নিশ্চিতভাবে সংলক্ষ্য-ক্রম বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: কারো বিপুল বৈভবের কথা বলতে গিয়ে হয়তো চিহ্নায়ক হিসাবে একটি প্রাসাদোপম বাড়ির উল্লেখ করা হল, বাড়িটি যদি বস্তুগতভাবেই সেই ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হয়, তবে তা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক (a representative index); আর যদি বাড়িটির বাস্তব কোনো জ্যামিতিক অস্তিত্ব না থাকে, তখন তা হবে রূপকধর্মী প্রতিমা, কিংবা রূপকের অতিশয়োক্তি (a metaphor icon)।

খ) **হেতুবাচক** (causal) : এই ভাগে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ক মূলত কার্যকারণসূত্রে সংযুক্ত। ফলাফলটিকে চিহ্নায়ক হিসেবে ধরে নিহিত কারণটিকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া। অথবা ক্ষেত্রবিশেষে তার উল্টোটিও হতে পারে। এটিও রূপকের মতো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির স্তর, যা সংলক্ষ্য-ক্রম বা অসংলক্ষ্য-ক্রম দুই-ই হতে পারে। যেমন ধোঁয়া থেকে আগুনের অস্তিত্ব এবং উৎস টের পাওয়া সম্ভব। এইপ্রকার চিহ্নের একটি অসাধারণ উদাহরণ হিসেবে দাখিল করা যায় সংস্কৃত সাহিত্যের সেই বিখ্যাত শ্লোকটিকে, যেখানে বিয়ের কথায় লাজুক পার্বতী লীলাকমলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছেন।

আমাদের এই গৃহীত বর্গবিভাজনের সূত্রে আমরা ইতোমধ্যেই প্রাচ্য-ধ্বনিপ্রস্থানের ‘ধ্বনি’ তথা ব্যঞ্জনাবিষয়ক ধারণাকে আংশিক তুলনামূলকভাবে দেখতে চেয়েছি, এ-ছাড়া প্রসঙ্গসূত্রে কাছাকাছি ইংরেজি পরিভাষাও উল্লেখপঞ্জিতে কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। প্রাচ্যদেশীয় অলংকারশাস্ত্রের প্রসঙ্গও সেইসূত্রে বাদ পড়েনি— নিকটস্থ অলংকারগুলির সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগসূত্র নিয়েও উল্লেখপঞ্জিতে আমরা একটু-আধটু ভাবার চেষ্টা করেছি। তবে এও মাথায় রাখা প্রয়োজন, তত্ত্বচর্চার এইসব এলাকাগুলির মধ্যে মজ্জাগত বা কাঠামোগত পার্থক্যও যথেষ্ট বিদ্যমান। তাই এইসংক্রান্ত কোনোরকম তুলনাকেই গাণিতিক সমতা হিসেবে দেখলে চলবে না। ঘনিষ্ঠ বা নিকটস্থ বা কাছাকাছি বা প্রায় সমতুল হিসেবে বিবেচনা করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। সেই আংশিক মিল বা নিকটসম্বন্ধের ভিত্তিতে আমরা নিম্নোক্ত তালিকায়, সবগুলিকে একত্রিত করে দেখার চেষ্টা করছি।

গৃহীত পরিভাষা (চিহ্নতত্ত্ব)	প্রায়ঘনিষ্ঠ ‘ধ্বনি’ (ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিবাদ)	প্রাচ্যদেশীয় অলংকারশাস্ত্র	তুল্যমূল্য ইংরেজি পরিভাষা
প্রতীক	অবিবক্ষিতবাচ্য (ক্ষেত্রবিশেষে দু-প্রকারই)		
মূর্ত প্রতিমা	বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য (সংলক্ষ্যক্রম)	উপমা (ক্ষেত্রবিশেষ)	Simile
ভাবসাদৃশ্যগত প্রতিমা	ঐ (অসংলক্ষ্যক্রমও)	সাদৃশ্যবাচক অর্থালংকার, অপ্রস্তুত-প্রশংসা (সাদৃশ্যভাব)	Simile, Metaphor
প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক	ঐ	অপ্রস্তুত-প্রশংসা (বিষয়ী-সামান্য-ভাব)	Metonymy (Synecdoche)
হেতুবাচক নির্দেশক	ঐ (অসংলক্ষ্যক্রমও)	ঐ (কার্যকারণভাব)	Metonymy (cause-effect)

অবশ্য এই ব্যাপারে আমাদের সততই সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, আমরা যেন এই শ্রেণিবিন্যাসটিকে পাঁচিল-তোলা খোপ হিসেবে না দেখি, বরং তার স্থিতিস্থাপকতায় বিশ্বাস রাখতে পারি। কারণ এমন প্রায়শই দেখা যায়— বিশেষত কোনো আখ্যানের মধ্যে— প্রতীক কখনো পরিণত হচ্ছে রূপকে, আবার রূপক কখনো কখনো সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে প্রতীকভাবনায়; কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক বদলে যাচ্ছে মূর্ত প্রতিমায়, আর মূর্ত প্রতিমা প্রতিনিধিত্বে। কখনো আবার একটি চিহ্ন একাধিক শ্রেণিপর্যায়কে ধারণ করে থাকে— এমনও হয়। যেমন, ‘ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়’ (‘বর্ষামঙ্গল’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) অংশটি একইসাথে হেতুবাচক নির্দেশক (ঘট ভেসে যাওয়া আসলে ঘাটে আগত নারীটির অন্যমনস্কতাকে ব্যঞ্জিত করছে), আবার একইসাথে

রূপক-প্রতিমাও বটে ('ঘট' এখানে ঘাটে আগত নারীর ব্যাকুল হৃদয়ের রূপক)। অনুরূপ একটি লণ্ঠন ভেসে যাওয়ার দৃশ্য হিন্দি 'Devdas'(2002) সিনেমায় লক্ষ করা গেছিল: নদীতীরে নায়ক-নায়িকার সঙ্গম ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে ক্যামেরার ফোকাস নিবদ্ধ ছিল জলস্রোতে মৃদুমন্দ দুলতে দুলতে ভেসে-যাওয়া লণ্ঠনের উপর। লণ্ঠনের ভেসে-যাওয়া একদিকে যেমন নায়ক-নায়িকার বিষয়লুপ্ত আত্মহারা হয়ে যাওয়ার নির্দেশক, অন্যদিকে আনন্দলহরীতে ভাসমান প্রেমিকযুগলের হৃদয় বা সংযমের প্রতিমা।

উল্লেখপঞ্জি:

১. 'Structure' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'কাঠামো', 'গ্রন্থন', 'আকরণ' প্রভৃতি নানান তর্জমাই গ্রহণযোগ্য। আমরা এখানে তপোধীর ভট্টাচার্যের অনুগামী হয়ে 'Structuralism'-এর বাংলা হিসেবে 'আকরণবাদ' (২০১৬ : ৫৯-৭৭) কথাটিই ব্যবহার করলাম।

২. মার্কসবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের ধারণা ('cultural hegemony') যাঁদের কাছ থেকে আমরা বিশেষভাবে পাচ্ছি, আন্তনিও গ্রামসি তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য একজন চিন্তক। শোষকশ্রেণি তার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক আগ্রাসনের পাশাপাশি, ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধ তথা বিশ্ববীক্ষার মধ্য দিয়েও যে সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখে, তার কথাই মূলত তিনি বলতে চেয়েছেন (Bullock & Trombley: 1999: 387-88)।

৩. বস্তুত 'বি' উপসর্গটি বাংলায় ইতিবাচক ('বিশেষ' অর্থে) ও নেতিবাচক ('বিপরীত' অর্থে) দ্বিবিধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সেই হিসেবে 'বিনির্মাণ' শব্দটি আসলে দু-রকম অর্থই প্রকাশ করে ('অনির্মাণ' ও 'বিশেষরূপে নির্মাণ')। এই বিভ্রান্তি একপ্রকার এড়ানোর জন্যই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'অবিনির্মাণ' শব্দটিকে বেছে নিয়েছেন (২০০৬ : ১১), যাতে দু-রকম অর্থই পরিস্ফুট হয়। আমাদের কুণ্ঠিত সংশয়: তাতে কি 'অ' উপসর্গের নেতিবাচকতা নির্মাণের বিশেষত্বকেই নাকচ করে

দিচ্ছে না? প্রসঙ্গত তিনি যে 'অবিনশ্বর' শব্দটির কথা বলেছেন, সেখানেও আমাদের মতে দুটি নেতিবাচক উপসর্গ নেই, 'বি' সেখানে ইতিবাচক (অথবা আধিক্যবাচক) বিশেষণ হিসেবেই প্রযুক্ত। আমরা তাই তপোধীর ভট্টাচার্যের অনুসরণে 'বিনির্মাণ' শব্দটিই বেছে নিলাম (ভট্টাচার্য: ২০১৬: ৯৭-১১৫)। তাতে করে শব্দটির দ্ব্যর্থবোধকতা অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে যদিও, কিন্তু এই দ্ব্যর্থবোধকতা দেরিদার বিনির্মাণ-সংক্রান্ত সেই বিতর্কিত ফরাসী পরিভাষাটিতেও তো রয়েছে যা একইসাথে 'পৃথকনতা' (স্পিভাক : ঐ) ও 'স্থগন' দুইই বোঝায়। বয়ানের তাৎপর্য একদিকে যেমন তার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে নিরন্তর পৃথক হয়ে উঠতে থাকে, আবার সেই হিসেবে স্থগিত বা বিলম্বিতও হয়ে থাকে; বা এমনও বলা যায় যে, বাক্যের অর্থ প্রতিমুহূর্তে থমকে থাকে পৃথকভাবে পুনর্বিবেচিত হওয়ারই অপেক্ষায়। রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিড়াল-সম্পর্কিত একটি বাক্যের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন (২০১৯ : ৪২)।

৪. প্রতীচ্যে যে 'tropes' বা 'rhetorical tropes'-এর ধারণা জনপ্রিয়, তাকে আমাদের এই আর্থী-ব্যঞ্জনার কাছাকাছি মনে হতে পারে। কিন্তু 'ব্যঞ্জনা' বিষয়টির যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা, 'trope'-এর ধারণা তার তুলনায় অনেকখানিই সীমিত ও সংকীর্ণ, 'trope'-কে বড়োজোর আমাদের অর্থালংকারের ঘনিষ্ঠ মনে করা যেতে পারে। এ-ছাড়া 'master tropes' (Bruke: 1979: 503-517) বিষয়ে যে-ধারণা রয়েছে, তার মধ্যে metaphor, metonymy, synecdoche, irony— এই চারটি 'figure'-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (যদিও অন্যত্র synecdoche শ্রেণিটিকে metonymy গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত করে দেখা হয়)। এদিকে শব্দের ব্যঞ্জনাগুণের বিষয়টি আমরা যদি সাধারণভাবেই দেখি, দেখব সেখানে বাচ্যার্থের মধ্য দিয়েই বাচ্যার্থকে বহন করে বা অতিক্রম করে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। সেই নিরিখে, irony যাকে বলা হয়, তাকে ব্যঞ্জনার প্রকাশদৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে, যেহেতু তা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু দেখতে গেলে এটিও অত্যন্ত-তিরস্কৃত অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনিরই সমগোত্রীয় হওয়া সম্ভব। একে তা-হলে বিপরীতার্থক শ্লেষ বলা যায় কি?

৫. রমাপ্রসাদ দাস এই বিষয়টিকেই প্রায় বলতে চেয়েছেন ‘প্রবর্তিত চিহ্ন’ (১০-১২), যা মোটা কথায় মনুষ্যসৃষ্ট, যেমন লিপি ও শব্দার্থ; পক্ষান্তরে তিনি বিধান-নিরপেক্ষ তথা প্রাকৃতিকভাবে মজুত চিহ্নগুলিকে বলছেন ‘প্রাকৃত চিহ্ন’, অর্থাৎ যেখানে দ্যোতক-দ্যোতিত প্রাকৃতিক সংযোগসূত্রে আবদ্ধ, যেমন ধোঁয়াসূত্রে আগুন, অর্থাৎ তিনি ‘জ্ঞাপক’ বা নির্দেশকের কথাই (metonymy/index) মূলত বলতে চেয়েছেন। (যদিও পার্স-কৃত বর্গবিভাজনের সঙ্গে বিষয়টিকে পুরোপুরি মিলিয়ে ফেলা চলে না, তথাপি জিজ্ঞাসা উঠেই আসে: এক্ষেত্রে metaphor-কে আমরা কোন্ শ্রেণিতে রাখব? তাছাড়া শুধুমাত্র মনুষ্যবিধির নিছক থাকা-না-থাকার বিভাজনরেখা দিয়ে চিহ্নের চরিত্রগত বিপুল বৈচিত্র্যকে কি ধরা সম্ভব?) তবে তিনি যে ‘প্রতীক’ শব্দের পারিভাষিক বৈচিত্র্যের ওপর আলোকপাত করেছেন, সেটি আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যে দুটি পৃথক আভিধানিক অর্থের উল্লেখ করেছেন, তাতে এমনকি প্রতিরূপ (icon) ও নিদর্শন (index) দুই অর্থেই আমরা পৃথকভাবে প্রতীককে পাচ্ছি; অপিচ তিনি প্রায়োগিক পরিসরের মাত্রাগত তারতম্যের নিরিখেও ‘প্রতীক’ শব্দের চাররকম অভিপ্রায়ের কথা তুলে ধরেছেন (১৪)। উক্ত প্রসঙ্গের নির্যাসটুকু ছেঁকে নিয়ে বিষয়টির সরলীকরণ করলে আমরা ‘প্রতীক’ শব্দের প্রধানত দু-ধরনের প্রয়োগ লক্ষ করব। ক. প্রায় সব ধরনের চিহ্নকেই প্রতীক বলা হচ্ছে, এবং খ. পার্সকথিত পরিভাষার নিরিখে, কেবল ‘প্রবর্তিত’ চিহ্নকেই প্রতীক বলা হচ্ছে। প্রথম শ্রেণির প্রয়োগটিই আসলে প্রতীকের সাবেকি অর্থ; আমাদের মতে, প্রতীকবাদের প্রভাবে তা আরও ব্যাপকভাবে পরিচিত ও পরিব্যপ্ত হয়েছে, বা বলা ভালো, প্রতীকবাদ সেই প্রচলিত অর্থটিই ব্যবহার করে তাকে জনপ্রিয় করেছে। প্রতীকবাদী ভাবনা (symbolism) বিকশিত হয়েছিল চিহ্নতত্ত্বের প্রায় সমসাময়িক কালেই, উনিশ শতকের শেষার্ধে, মুখ্যত শিল্প-সাহিত্যের এক বিশেষ আন্দোলন হিসেবে— বয়ানের যে-কোনোরকম গভীর ব্যঞ্জনাময়তাকেই যেখানে ‘প্রতীক’ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে (সুতরাং মোটা দাগে বিষয়টি অনেকখানিই, বলা চলে, আমাদের ধ্বনিবাদীরা যাকে ‘রসধ্বনি’ বলেছেন বা আচার্য কুন্তক যাকে ‘বক্রোক্তি’ বলতে চেয়েছেন, তারই প্রায় সমতুল)। সম্ভবত শিল্পের বা সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ

একমাত্রিকতার বিরুদ্ধে একপ্রকার বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ আকারেই একশ্রেণির কবিগোষ্ঠী বা শিল্পীগোষ্ঠীর মননে এই চিন্তাবীজ উপ্ত হয়েছিল। কিন্তু চিহ্নতত্ত্বের নিরিখে দেখলে সময়ের ব্যবধানে এই বিশেষ প্রতীকভাবনা আমাদের ততখানি বৈজ্ঞানিক মনে হয় না। চিহ্নতত্ত্বের সঙ্গে প্রতীকবাদের অন্যতম পার্থক্য এই যে, প্রতীকবাদ পল্লবিত হয়েছিল সরাসরি শিল্প ও সাহিত্যের আঙিনায়, পক্ষান্তরে চিহ্নতত্ত্বের জন্ম হয়েছিল ভাষাতত্ত্ব ও যুক্তিতত্ত্বের আঙিনায়। সুতরাং সাহিত্য ও সমাজনীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চিহ্নতত্ত্বের তৎকালীন কিছু সীমাবদ্ধতা হয়তো-বা ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে চিহ্নতত্ত্ব যেহেতু সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতির পরিসরেও বিকাশলাভ করেছে, তাই সেই খামতিটুকুও ক্রমশ মুছে গেছে। তাই 'প্রতীক' শব্দের পারিভাষিক তাৎপর্য, তথাকথিত প্রতীকবাদের প্রতিতুলনায়, পার্সের প্রস্তাবমতেই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে আমাদের মনে হয়।

৬. এই সন্দর্ভে 'রূপক' কথাটি আমরা আসলে প্রাচ্য-অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী ব্যবহার করছি না। আমাদের অলংকারশাস্ত্রমতে 'রূপক' একটি বিশেষ ধাঁচকেই বোঝায়, যেখানে সাধারণত উপমান ও উপমেয় উভয়ই উপস্থিত (যদিও তার মধ্যে উপমানই প্রাধান্য পায় ও উপমেয় গৌণ হয়ে ওঠে, যেমন 'মন-পাখি' অর্থে মনরূপ পাখি)। কিন্তু আমরা এখানে, অন্যান্য যা-কিছু অভেদকল্পনামূলক অর্থালংকার রয়েছে, সেগুলিকেও সামগ্রিকভাবে এর সঙ্গে জুড়ে নিতে চাই; বিশেষত উৎকৃষ্ট মানের সাদৃশ্যবাচক অলংকার হিসেবে সমাসোক্তি, রূপকাতিশয়োক্তি (অতিশয়োক্তি), প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা প্রভৃতির প্রসঙ্গই আমাদের লেখায় বেশি গুরুত্ব পাবে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'রূপক' শব্দটি আসলে সাধারণ অর্থে 'রূপকাতিশয়োক্তি'রই নাম-সংক্ষেপন হিসেবে প্রযুক্ত হবে (সেইসাথে গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার 'অপ্রস্তুত-প্রশংসা'ও অনেকক্ষেত্রে রূপকাতিশয়োক্তির একটি অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রায়োগিক পর্যায় হিসেবে ব্যাপ্ত ও বিবেচনাযোগ্য)। উল্লেখ্য: মোটের ওপর বিষয়টিকে 'metaphor'-ও বলা চলে; কিন্তু এই সূত্রে 'metaphor' বিষয়টি নিয়ে খানিক সংশয়মোচনের প্রয়োজন রয়েছে। শ্যামাপদ চক্রবর্তী metaphor-কে মূলত সমাসোক্তি ও রূপকাতিশয়োক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন; তবে

(অলংকারশাস্ত্রীয় পরিভাষাগুণে) রূপকের বিষয়টিকে তিনি নাকচ করেছেন— "অনেকে Metaphor-কে আমাদের রূপক বলেন, এ ধারণা ঠিক নয়" (৬৭)। কিন্তু metaphor-এর যে প্রচলিত চেহারাটি বর্তমানে সুপরিচিত (X is Y), তার সঙ্গে, তিনি যে নিরঙ্গ মালা রূপকের (এবং দণ্ডীকথিত 'ব্যস্ত' রূপকের) উদাহরণসমূহের উল্লেখ করেছেন (৭১-৭৩), সেগুলির যথেষ্ট মিল রয়েছে। কিংবা উক্ত ছাঁচটিকে আমাদের প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার সঙ্গেও তুলনা করা চলে: যেমন— 'লোকটা যেন একটা বিষাক্ত সাপ'। আবার সমাসোক্তি বা রূপকাতিশয়োক্তিও 'implied metaphor' হিসেবে ধার্য। কাঠামোগতভাবে দেখলে তুলনাটি দাঁড়ায়— ক. রূপকের ক্ষেত্রে উপমান ('vehicle') ও উপমেয় ('tenor') দুইই প্রস্তুত, কিন্তু সাদৃশ্যগুণ বা সাধারণ ধর্মটুকু ('ground') অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রস্তুত: যেমন— 'লোকটা একটা বিষাক্ত সাপ' (অনুক্ত সাধারণ ধর্ম এখানে 'বিপজ্জনক', প্রতিতুলনায় 'বিষাক্ত' কথাটি বিশেষণ হলেও এক্ষেত্রে ground হিসেবে যথাযথ নয়)। খ. সমাসোক্তির ক্ষেত্রে অপ্রস্তুত উপমানের ধর্ম প্রস্তুত উপমেয়ে আরোপিত, অর্থাৎ tenor ও ground প্রস্তুত, কিন্তু vehicle অপ্রস্তুত: যেমন— 'লোকটা তো যে-কোনো মুহূর্তে ছোবল দেওয়ার জন্য পুরো রেডি হয়ে আছে'। গ. রূপকাতিশয়োক্তির ক্ষেত্রে আবার উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নেয় উপমান, অর্থাৎ vehicle এখানে প্রস্তুত, tenor অপ্রস্তুত, আর ground কখনো হতে পারে প্রস্তুত বা কখনো অপ্রস্তুত: যেমন— 'একটা বিষাক্ত সাপ তাদের পাঁচিলের গা ঘেঁষে ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছে'। অতএব দেখা যাচ্ছে, অভেদকল্পনামূলক যাবতীয় অর্থালংকারকেই এককথায় metaphor বলা হচ্ছে। সুতরাং উল্লেখ্য: আমরা আমাদের সন্দর্ভে যখনই 'রূপক' শব্দটি ব্যবহার করব, তা ব্যাপকার্থে metaphor বোঝাতেই প্রযুক্ত হবে (এ-ছাড়া সাম্প্রতিকতর পাঠে ও পর্যালোচনায় প্রায়শই 'metaphor'-এর গণ্ডিকে খেয়ালখুশিমতো আরও বাড়িয়ে তাকে প্রতীকবাদীদের 'প্রতীক' কিংবা ধ্বনিবাদীদের ব্যঞ্জনা-বিষয়ক ধ্যানধারণার প্রায় সমগোত্রীয় হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, আমরা 'metaphor' ধারণাটির এইধরনের বিমূর্ত উদারীকরণের পক্ষপাতী নই)।

৭. এটি এককথায় ‘metonymy’-র অনেকখানি নিকটস্থ। এর মধ্যে যাকে আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক বলছি, ‘synecdoche’ বিষয়টি তার যথেষ্ট সমতুল। অলংকারগুণে এটির তুলনীয় বলা চলে ‘সামান্য-বিশেষ’ কিংবা ‘বিশেষ-সামান্য’ ভাবের ‘অপ্রস্তুত-প্রশংসা’; আর হেতুবাচক নির্দেশক যাকে বলছি, অলংকারগুণে তা ‘কারণ-কার্য’ বা ‘কার্য-কারণ’ ভাবের ‘অপ্রস্তুত-প্রশংসা’ (চক্রবর্তী ১৮১-১৮৬)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কথাসাহিত্যের জন্ম থেকে আধুনিকতা : চিহ্নের মেটামরফোসিস

> মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ গল্পের জন্মও সেদিন থেকেই। বিবর্তনের অনেকগুলি পর্ব পার হয়ে প্রস্তর যুগের পাহাড়ের কালো গুহার ভিতর বড় বড় কাঠের কুঁদো জ্বালিয়ে আমাদের শিকারজীবী পিতৃপুরুষেরা গোল হয়ে বসেছে একসঙ্গে; আগুনের রক্তাভ আলোয় শৈল-প্রাকারে তাদেরই আঁকা হরিণ ও বাইসন শিকারের বিচিত্র চিত্রকলা রচনা করেছে অপরূপ পরিবেশ। বাইরে ফার্ণজাতীয় দীর্ঘ তরুণ অরণ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করেছে আর বনের কররোলকে ছাপিয়ে ভেসে আসছে ক্ষুধাতুর নরখাদক হিংস্র জন্তুর গর্জন। সেই সময় ভিতরের ঘনীভূত নিরাপত্তার মধ্যে কথাকুশল প্রাজ্ঞেরা গল্প বলে চলেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই হৃদয়মুগ্ধকর কাব্যিক বর্ণনাটি (২০১৬ : ৩) আমাদের পৌঁছে দেয় সেই আদিম পৃথিবীতে যেখানে উপ্ত হয়েছিল গল্পের তথা কথাসাহিত্যের বীজ। আসলে 'কথা' শব্দটির পারিভাষিক প্রয়োগ মূলত গল্প হিসেবেই। দেবীপদ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেন:

> 'কথা শব্দটি মূলত প্রশ্নবোধক অব্যয়। কথম্ কেন? কেমন করে? তাই সংস্কৃতে 'কথা' ও 'কথম্' সমার্থক। মানবমনের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল শব্দটির মধ্যে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বক্তা গল্প বলছেন, শ্রোতা শুনতে শুনতে বললেন : কথা, অর্থাৎ কেমন করে? বা কোন উপায়ে? বক্তা শ্রোতার প্রশ্নের জবাব দিলেন, গল্প এগিয়ে চলল। ই. এম. ফরস্টর কথিত 'And then, and then' প্রশ্ন গল্পশ্রোতার থাকবেই। আর ওই প্রশ্নবিধৃত কৌতূহল, বিস্ময় নিয়েই কথাসাহিত্যের জন্ম। (১৯)

এসবের পাশাপাশি সন্দিহান প্রশ্ন এও যদিও জাগে যে, গুহাকন্দরে বসে আদিম মানুষের গল্প বলা, কিংবা গল্প শোনার প্রতি মানবমনের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ও কৌতূহল— সৃষ্টির প্রাথমিক যুগে তা যে কথার জন্ম দিয়েছিল, তা-ই কি সরাসরি হয়ে উঠেছিল কথাসাহিত্য, নাকি সাধারণ কথাবুনন থেকে বিশেষভাবে মৌখিক সাহিত্য হয়ে

ওঠার মধ্যবর্তী ছায়ানিলীন পর্যায়টুকু নিষিক্ত হয়ে রয়েছে নানান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার জটিলতায়; কিন্তু প্রামাণ্য যুক্তি যেহেতু ভীষণভাবে দুর্লভ, তদুপরি আমাদের মূল আলোচনার ক্ষেত্রে অনিবার্যও নয়, তাই এ-প্রসঙ্গ আপাতত সরিয়ে রাখাই শ্রেয়। তাত্ত্বিকভাবে অন্তত এটুকু ধারণা আমরা করতে পারি: লোককথায় কাহিনি বর্ণিত হয় অতীতবয়ানে, অর্থাৎ আখ্যানকাল ও কথনকালের মাঝে পড়ে থাকে প্রায়-দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান, অথচ স্মৃতি ও সত্তা পরস্পর সম্পৃক্ত রয়েছে যেখানে— প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ে শিকারজীবী কৌমগুলির মানুষেরা হয়তো তাদের পূর্বইতিহাস বর্ণনা করত উত্তরসূরিদের কাছে, কিন্তু প্রাপ্ত লোককথাগুলির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন নীতিজ্ঞান, রূপকচিহ্নের যে সৃজনশীল অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়, সেই সচেতন প্রয়াস ও শিল্পবোধ তাদের শিকারনির্ভর জৈবিক জীবনে কতটুকু গড়ে উঠেছিল বা গড়ে ওঠার অবকাশ পেয়েছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বরং মনে করা যেতে পারে, মানুষ যখন খাদ্য-সংগ্রাহক থেকে খাদ্য-উৎপাদকের স্তরে গিয়ে পৌঁছাল, এবং ধীরে ধীরে কৃষিকাজের উন্নতির ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সে উৎপাদন করতে শিখল, সমাজে ক্রমশ পুরুষ-প্রাধান্য, ব্যক্তি-মালিকানা, শ্রেণিবিভাজন প্রভৃতির পরিসর তৈরি হতে লাগল। ক্রমান্বয়ে প্রচলিত তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করল, বিশেষত "লোহা, যদিও সহজলভ্যতার কারণে কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হল, কিন্তু তা একই সঙ্গে বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের কঠোর শ্রমের বিনিময়ে একদল মানুষকে কাজ করার প্রয়োজন থেকে মুক্তি দিল" (কোসাম্বী : ২০০১ : ১৯)। এইভাবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ সংগঠনে ক্ষমতাতান্ত্রিক নীতিনিষেধগুলির বাঁধন ও তার দ্বিবাচনিকতায় যৌথ প্রতিরোধের স্বপ্ন কিংবা অবদমিত ব্যক্তিসত্তার বিলীন আকাঙ্ক্ষাই মূলত হয়ে উঠল মানুষের আবহমান সংস্কৃতির নিয়ন্তা। লোককথার পরিসর চিহ্নিত হয়ে রয়েছে এই সমাজতাত্ত্বিক প্রবণতাগুলির সাপেক্ষেই। বস্তুত প্রাক্-কৃষি পর্যায়ের শিকারজীবনকেন্দ্রিক কোনো মোটিফ লোককথার প্রচলিত মোটিফ-তালিকায় (Thompson : 1955-58) সেভাবে লক্ষ করা যায় না; যেটুকু যায়— তাকে প্রক্ষিপ্ত হিসেবেই ধরা চলে। এছাড়া সমাজে কৃষির উন্নতিতে লাঙল ও পশুশক্তির ব্যবহারের সঙ্গে পুরুষাধিপত্যের যোগটি যেহেতু ওতপ্রোত, তাই অধিকাংশ লোককথাতেই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিরিখে

নারীর অবমাননাকর উপস্থাপন এক বিশেষ সময়ের সংঘাতপ্রসূত বিদ্বেষকেই সূচিত করে, যেসব লিঙ্গ-রাজনৈতিক ধ্যানধারণা হয়তো শিকারিযুগের বাস্তবতায় তেমন সম্ভব ছিল না। এ নিয়ে আলোচনা এগোতে থাকলে একসময় তর্কের পাহাড় তৈরি হবে, যা আমাদের অভীষ্ট নয়; তাই আমরা আসলে লোককথার সূত্রে আদিম থেকে আধুনিক— সমাজবদ্ধ মানুষের চিহ্নচেতনার বিবর্তন ও তার ধর্মটুকুকে পর্যবেক্ষণ করব।

১. একটি প্রথা, ফলিত কুসংস্কার ও প্রতিমার নির্মাণ : ব্যবহৃত ভাষা ও লিপির বাইরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে আদিম মানুষের প্রথম প্রতীক-ভাবনার প্রকাশ হল টোটেম। প্রথম নির্মিত প্রতিমা গুহার দেয়ালে আঁকা পশুর চিত্র। প্রথম সচেতন সাংস্কৃতিক প্রয়াস শিকারের পরিমাণ বাড়ানোর বাসনায় ওইসকল ছবিকে কেন্দ্র করে জাদুক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠানে নাচগান। টোটেম— বিশেষ কোনো বৃক্ষ, ফল কিংবা পশুপাখিপতঙ্গ, যাতে কোনো একটি বিশেষ কৌমের সহজাত বিশেষজ্ঞতা আছে বলে মনে করা হত, এবং তৎসংলগ্ন ট্যাবু তার সঙ্গে জুড়ে যা হয়ে উঠত ওই বিশেষ কৌমের প্রতীক, তা-ই পরবর্তীকালে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন দেবতার রূপ ও কাঠামো। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী তাঁর বইতে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যেটি এই প্রসঙ্গে কিছু-বা উদ্ধৃত করা চলে:

> লসেল-ডারডোন-এর খোদাই নারীমূর্তির *(এ আই এ,* চিত্র ১০৯) মতোই তথ্যসমৃদ্ধ অ্যারিগ্‌নেশিয়ান যুগের শেষদিকের 'ভেনাস অফ উইলেনডর্ফ' (*এ আই এ,* চিত্র ১৯) যখন খুঁড়ে তোলা হয় তখন তাতেও যে কোন ভারতীয় গ্রামীণ দেবীমূর্তির মতোই 'লাল গিরিমাটির অস্তিত্ব বিদ্যমান' ছিল। সেখানকার নারী পুত্তলিকাগুলির আকৃতিও ঠিক মানুষের মতো নয়— যদিও ঐ যুগের (তুষারযুগের) জীবজন্তুর মূর্তি বা অন্যান্য চিত্রে পরিপূর্ণ শিল্পদক্ষতারই পরিচয় আছে। সম্ভবত অবিকল কোন মানুষের মুখ বানানোটা কারো বিরুদ্ধে তুকতাক হিসেবে গণ্য হত। বন্য জন্তুদের মধ্যে নৃত্যরত, জন্তুর মুখোশ পরা যে মনুষ্যদেহের ছবিগুলি গুহাগাত্রে আঁকা হয়েছে (*এ আই এ,* চিত্র ৩০, ৩১, ৭০)— যার মধ্যে লা ট্রয় ফ্রেরেস-এর 'জাদুকর' *(এ আই এ,* চিত্র ১৪২) বা গ্রীক

বনদেবতার এক অগ্রদূত (*এ আই এ*, চিত্র ১৪৩) বিখ্যাত—সেগুলির ধ্যানধারণার সঙ্গে আমাদের গণেশ-এর ধ্যানধারণারও নিশ্চিত সাযুজ্য আছে। (৩৭)

আসলে এই 'কুসংস্কার'-এর ভিতরেই ছিল প্রতীকের তাগিদ, প্রতীককে ছাপিয়ে যাওয়ারও। আদিম লোকমানস তাই পশুর মূর্ত প্রতিমা আঁকলেও কখনো সে নিজের মূর্ত প্রতিমা গড়ার সাহস অর্জন করতে পারেনি, সে ক্রমশ হেঁটে গেছে বিমূর্তায়নের দিকে, নিজেকে সে প্রকাশ করতে চেয়েছে 'জন্তুর মুখোশ পরা' অবস্থায়, পশুর মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে চিহ্নায়িত করেছে নিজস্ব পরিমণ্ডল। এই প্রবণতারই ছাপ হয়তো লক্ষ করা যাবে লোককথার সূচনায়, বিশেষত পশুকথাগুলির মধ্যে, যাকে নৃতত্ত্ববিদ ম্যাক এডওয়ার্ড লিচ বলছেন, "one of the oldest forms, perhaps the oldest, of the folktale and found everywhere on the globe at all levels of culture" (1949 : 61)। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে লোককথা বলতে বুঝে নিতে হবে পশুকথাকেই। পশু থাকলেই তা পশুকথা হবে এমনটি যে নয়, তা এখানে আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। আমরা জানি পশুকথার ক্ষেত্রে পশুকেই হতে হবে মূল চরিত্র অর্থাৎ গল্পের 'protagonist'; গল্পে এই পশুকে আঁকতে গিয়ে তার ক্রিয়াকলাপকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে মানুষ তাকে বিনির্মাণ করেছে নিজের ভাবনা-চিন্তা-অনুভূতির নিরিখে—ফলত অচেতন বিনির্মাণ-প্রক্রিয়ায় পশুর গল্প হয়ে উঠেছে মানুষের গল্প। কিন্তু পুরোপুরিভাবে এই হয়ে-ওঠাটুকু নেহাত রাতারাতি ছিল না, মানুষ একেবারে শুরুতেই রূপকের প্রয়োগকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করে ফেলেনি, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে যখন এই প্রক্রিয়ার অঙ্কুরোদ্গম-পর্ব, তখন পশুদের হাজির করা হচ্ছে খানিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক হিসেবেই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি আফ্রিকান লোককথার ('চালাক খরগোসের গল্প', Fairly stories from Africa—Retold by Florence A. Tapsell) কথা বলেছেন, যেখানে একটি খরগোশ তার বুদ্ধি ও কৌশলে বোকা বানাতে বানাতে একসময় পশুদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে মানুষের বসতির কাছে চলে এসেছিল। "আর মানুষের কাছে সব চালাকিই বৃথা। সেখানেই শিকারীর হাতে একদিন লীলাখেলা তার শেষ হয়ে গেল"— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এইভাবে লেখেন— "ধূর্ততার একটি চূড়ান্ত

নমুনা এতে পাওয়া যাবে এবং এ শিক্ষাও পাওয়া যাবে যে অন্যায় ও অসত্যের চতুরতা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য" (২০১৬ : ৪)। এখানে অস্বীকার করার উপায় নেই গল্পটির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন নীতিজ্ঞান রয়েছে, কিন্তু তা-ই প্রাথমিক অভীষ্ট ছিল বলে মনে হয় না, বিশেষত খরগোশ বা অন্যান্য পশু সরাসরি মানুষের রূপক নয়— কারণ যেহেতু 'মানুষ'-কে আলাদা করে উপস্থিত করা হচ্ছে, তখন মানুষ ও পশুর দ্বিবাচনিক সম্পর্কটুকুই মুখ্য, এবং 'মানুষের কাছে সব চালাকিই বৃথা' ও তার হাতে খরগোশটির মৃত্যু আসলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে বোঝায়, যা হেতুবাচক নির্দেশক বলা চলে: সুতরাং এখানে নীতিশিক্ষার চেয়েও যা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল, পরবর্তী প্রজন্মকুলের বয়ানে মানুষের অতীত গৌরববোধের ধারাবাহিক প্রবাহ।

২. **নীতিকথার উদ্ভব, লেখকের জন্ম ও রূপকের বাস্তবতা :** উপরোক্ত গল্পটির মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুঁজে পেয়েছেন 'পঞ্চতন্ত্র'-এর দুটি গল্পের অঙ্কুর। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ লোককথার সাধারণ মোটিফগুলি বিশ্বের সব দেশপ্রান্তের লোককথার মধ্যেই কমবেশি হেরফেরের মধ্য দিয়ে লক্ষ করা সম্ভব। আমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয় গল্পটিকে এমন কয়টি পর্বে ভাগ করা চলে, যা কিছু হলেও আলাদা আলাদা গল্পের সম্ভাবনাযুক্ত। তাহলে আমরা দেখব:

ক) মরুভূমির বিশাল পুকুরের জলে রাজাধিরাজ হাতির একছত্র অধিকার। পিপাসাতুর খরগোশ সেই জল খেয়ে ফেলল। বাঁচার জন্য অদূরবর্তী ঘুমন্ত ইঁদুরের মুখে পায়ে কাদা লাগিয়ে দিল। হাতি জল চুরির ঘটনা টের পেল। ইঁদুরের প্রাণ গেল।

খ) খরগোশ মনের আনন্দে একদিন তা প্রকাশ করে ফেলল। পশুরা তাকে তাড়া করলে সে পালিয়ে গিয়ে সিংহের আশ্রয় নিল। সিংহের ছিল খাদ্যাভাব। খরগোশ কৌশলে বোকা জন্তুদের সিংহের মুখে এনে দিল।

গ) পরেরবার থেকে পশুরা সতর্ক হয়ে গেল। সিংহের আবার খাদ্যাভাব। সে তখন খরগোশকেই খেতে চাইল। খরগোশ পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। কিন্তু ঠিক করল সিংহকে সে জব্দ করবে। তাই ঘুমন্ত সিংহের লেজটি শক্ত করে কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল। কাকুতিমিনতিতে ফল হলনা। ক্ষুধার জ্বালায় সিংহ মরে গেল।

ঘ) খরগোশ সেই সিংহের চামড়া পরে সবাইকে ভয় দেখাতে লাগল। তবু শেষরক্ষা হল না। একসময় ধরা পড়ে গেল। এবারে পালিয়ে গিয়ে মানুষের বসতির কাছে বাসা বাঁধল। এবং শেষে মানুষের হাতে মারা পড়ল।

এর মধ্যে গ) এবং ঘ) অংশ দুটি যথাক্রমে মন্দমতি সিংহের গল্প ও সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের গল্প আকারে 'পঞ্চতন্ত্র'-এ পাওয়া যাবে, যেগুলো আদতে নীতিকথা। দিব্যজ্যোতি মজুমদার তাঁর বইতে লোককথার যে আটটি শ্রেণিবিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন, কোনো প্রামাণ্য তথ্যসূত্র ছাড়াই ('সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিপ্রেমী প্রাজ্ঞ মানুষজনের অক্লান্ত গবেষণায় লোককথার শ্রেণিবিভাগের তথ্য... লোককথার শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে এইভাবে'), সেগুলি হল: ১. পশুকথা ২. রূপকথা ৩. পরিকথা ৪. কিংবদন্তি ৫. লোকপুরাণ ৬. নীতিকথা ৭. গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনি এবং ৮. ব্রতকথা (২০০৯ : ১৮)। নিজে তিনি যখন লোককথার শ্রেণিবিভাজন করছেন (২০১২ : ৮১) তখন তাতে 'নীতিকথা' ভাগটি থাকছে না। এটা অসচেতনতাবশত হতে পারে; আবার এও হতে পারে, টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি হয়তো এটি উপলব্ধি করেছিলেন যে 'নীতিকথা'-কে লোককথার আলাদা কোনো শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করাটুকু সেভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। এমনকি লোককথার সুপ্রচলিত টাইপ-ইনডেক্স-তালিকাতেও (Aarne-Thompson : 1928) প্রধান টাইপ হিসেবে নীতিকথার কোনো উল্লেখ নেই। প্রধান ভাগগুলি এইরকম:

1. Animal Tales (Types 1- 299)
2. Ordinary Folktales (Types 300 - 1199)
3. Jokes and Anacdotes (Types 1200 - 1999)
4. Formula Tales (Types 2000 -2399)
5. Unclassified Tales (Types 2400 – 2499)

এর মধ্যে 2.B. Religious Tales ও 2.C. Aitiological Tales এই উপবিভাগ দুটিকে একসাথে দিব্যজ্যোতি মজুমদার 'ধর্মীয় ও নীতিমূলক কাহিনি' (৭৫০-৮৪৯) নামে তর্জমা করছেন (২০১২ : ২৪)। এই 'নীতিমূলক কাহিনি'-গুলিও কিন্তু পুরোপুরিভাবে সমস্ত নীতিকথাকে চিহ্নিত করে না, কারণ নীতিকথার অধিকাংশই পশুচরিত্রের উপর নির্ভরশীল। *Encyclopaedia Britannica*-তে নীতিকথার সংজ্ঞায়

বলা হয়েছে, “The term is synonymous with apologue and denotes a short narrative in prose or verse designed to convey a moral or useful lesson. The characters are often animal, but inanimate objects, human beings or gods may also appear.” (1970 Ed. Vol. 9. Page 22)। বস্তুত এভাবে ভাবতে পারি সমাজ যখন আরও বেশি সংগঠিত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে, দ্বিবাচনিকতার স্তরগুলি হয়ে পড়েছে আরও বেশি জটিল, তখন আরও যথাযথভাবে নিজেকে ও সমাজকে চালিত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে নীতিশিক্ষার; তাই সে পশুকথার মধ্যে থেকে চিহ্ন আহরণ করে তাকে একমুখী (একমাত্রিক নয়) ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করেছে, পশুর মধ্য দিয়ে নিজেকে চিহ্নায়িত করার তাড়নায় সে নিজের অজান্তেই প্রতীক ছাড়িয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক ছাড়িয়ে জন্ম দিয়েছে রূপক প্রতিমার। ইতিপূর্বে যে আমরা ‘চালাক খরগোশের গল্প’-টির ভিতর ‘পঞ্চতন্ত্র’-এর দুটি নীতিকথার বীজ লক্ষ করেছি, তা কিন্তু কোনোভাবেই কাকতালীয় নয়। যেভাবে কল্লোলিত বাস্তবতার এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন চিহ্নপুঞ্জের ভিতর থেকে অভিব্যক্তিপূর্ণ একেকটি নির্দিষ্ট চিহ্নকে গল্পের একমুখী বক্তব্যের বাহক হিসেবে কাজে লাগানোর তাগিদ থেকে বিমল কর শুরু করেছিলেন ‘ছোটোগল্প: নতুন রীতি’ আন্দোলন, সেই উদ্দেশ্যপরায়ণতাই শনাক্ত করা যাবে নীতিগল্পের উদ্ভবেও। নীতিগল্প তাই লোককথার কোনো পৃথক শ্রেণি নয়, তা আসলে পশুকথারই একটি পরিশীলিত রূপ, একটি উন্নততর পর্যায় (সরাসরি মানুষের কথা যেখানে এসেছে সেই গল্পগুলি হয়তো-বা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের, যতদিনে বিবাহ, পরিবার-ব্যবস্থা, সামাজিক শ্রেণি, এবং নীতিকথার ধারণাও, যথেষ্ট বিকাশ লাভ করতে পেরেছে), যা অবলম্বন করে থাকে অতিশয় রূপকের ভাষা, ছুঁয়ে থাকে চিহ্নের দ্বিতীয় স্তর। পশুর প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ আসলে মানুষের: এভাবেই যে রূপকের বোধ গড়ে উঠল তা মানুষকে ও তার চারপাশকে আক্ষরিক তাৎপর্যের বাঁধন থেকে মুক্তি দিল। দিব্যজ্যোতি মজুমদার বাংলা লোককথার মধ্য থেকে যে মোট ১৪৭৩টি মোটিফ খুঁজে পেয়েছেন (২০১২ : ১৯৯-২৫০, ২৬০-২৬৮), তার মধ্যে কমপক্ষে ১০০০টিকেই রূপক হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে কবি

রণজিৎ দাশের কয়েকটি পঙক্তি (২০০২ : ১২০) উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো কঠিন।—

"চল্লিশ বছর আমি ঘুরে ঘুরে যা দেখেছি, সমস্ত তোমার
প্রণয়দ্বিধার দৃশ্য। কোনও জলাশয়, কোনও বাস্তবতা দেখিনি কোথাও।
ধাইবুড়ি, ফেরিঘাট, সূর্যাস্ত, রোশনচৌকি, রাত্রির গম্বুজ
যেটুকু বাস্তব, সে-ও রূপকের বাস্তবতা— তোমার নির্দেশে
কাকতাড়ুয়ার মতো দৃশ্যমান, শূন্যতার আনাচে-কানাচে।"

এই 'রূপকের বাস্তবতা'-কেই ধারণ করে আছে আদিম পৃথিবী ও তার লোককথা, কিংবা উল্টো করেও বলা চলে, এই 'রূপকের বাস্তবতা'-ই ধারণ করে আছে আদিম পৃথিবী ও তার লোককথাগুলিকে। আজ যদি আমরা বলি যে বিশশতকের প্রথমার্ধে ইউরোপেই জাদু-বাস্তবতার সূচনা, তবে তা হবে একটি অগভীর অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত। *Metamorphosis* (1915) কেবল কাফ্‌কাই লেখেননি, প্রায় দু-হাজার বছর আগে ইউরোপে বসে কাব্যের ভাষায় রোমক কবি ওভিদও লিখেছিলেন বৈচিত্র্যময় রূপান্তরের কথামালা (*Metamorphoses*, trans. by Horace Gregory), তারও আগে পৃথিবীর সকল প্রান্তের লোককথার মধ্যেই ছিল এই রূপান্তরের মোটিফ (এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য: ডি ১৮০ মানুষ থেকে পতঙ্গ, ডি ১৯২ মানুষ থেকে পোকা)। আসলে 'Magic Realism'-এর তথাকথিত প্রবক্তারা যেটি করেছিলেন তা হল: যাহাই জাদু তাহাই বাস্তব— এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দেওয়া, তাও সেটা ইউরোপীয় সভ্যতার চিন্তাপদ্ধতির সাপেক্ষেই। কারণ আধুনিক ইউরোপের আলোকপ্রাপ্ত দুনিয়ার চোখে যা নিছক জাদু বলে মনে হতে পারে, এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার আলো-আঁধারি জগতে সেটিই ছিল নির্ভেজাল বাস্তব (লাতিন আমেরিকার লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, যাকে জাদুবাস্তবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে ভাবা হয়, তিনিও নিজের লেখাকে ও তার ভিতর প্রতিফলিত পৃথিবীকে একশো শতাংশ বাস্তব বলেই মনে করেন)। এই সম্পর্কিত তারতম্যের পিছনে কারণ সন্ধানে আমরা আরও একবার কোসাম্বীর শরণাপন্ন হতে পারি। তিনি যে তুকতাক-বিষয়ক আদিম সংস্কারটির কথা বলেছেন, যুক্তিযুক্তভাবে আমরা সেটিকেই রূপকচিহ্নের জন্ম ও বিকাশের অন্যতম

প্রেক্ষাপট হিসেবে চিহ্নিত করেছি, তার সাথে আরেকটু সংযোজন আমাদের আলোচ্য বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে, তা হল— "...ধ্যানধারণাজাত কুসংস্কারগুলি ভারতবর্ষে আজও টিকে থাকার কারণ এখানকার খাদ্য সরবরাহ তুষার সংহননে সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি— ইউরোপে যা তীব্রভাবে হয়েছিল এবং তুষারযুগের সেই বিপর্যয় সেখানকার অজস্র উল্লেখযোগ্য লোকবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দিয়েছিল" (৩৭)।

পাশাপাশি এই নীতিকথাগুলি উদ্ভবের সাথে সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংঘটিত হল। সেটিকে বলতে পারি— লেখকের জন্ম (যদিও এ-কথা আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য নয়)। ইতোপূর্বেই বলেছি যে রোলাঁ বার্ত কর্তৃ-লেখকের (the author) মৃত্যুর আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখছি, একেবারে আদিম পর্বে 'লেখক' ছিলেন বস্তুত মৃতই (যেন-বা লেখক মূলত স্রষ্টা দ্রষ্টা)। লোককথাগুলির রচয়িতা হিসেবেও কোনো ব্যক্তির নামোল্লেখ থাকে না। থাকে অনির্দিষ্ট কথকসত্তার স্থিতিস্থাপক স্বর। কিন্তু যে-মুহূর্তে মানুষ নীতিশিক্ষার প্রয়োজনে গল্পকে ব্যবহার করতে শিখল, তখন থেকে তা হয়ে উঠল এক উদ্দেশ্যমূলক বিনির্মাণ। সেই পর্বেও যে রচয়িতার নাম পাওয়া গেল এমনটি নয়, তবে চরিত্রগুলির ক্রিয়াশীলতা ও দ্বিবাচনিক সম্পর্কবিন্যাস আর পুরোপুরি স্বাধীন রইল না। তা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করল সামাজিক মূল্যবোধের নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী। তাই আমরা দেখব একই গল্প জাতক, পঞ্চতন্ত্র বা ঈশপে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে বিনির্মিত হচ্ছে, চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের সম্পর্ক বদলে বদলে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন আদলে; বিশেষত জাতকে, পশুকথাগুলি যেভাবে বিনির্মিত হতে দেখি তাতে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে তার নেপথ্যে নড়াচড়া করছে অদৃশ্য কোনো লেখকের অদৃশ্য কোনো ছড়ি।

৩. **রূপকথার বিকাশ :** সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি পর্যায়ে মানুষ যখন পশুকথাকে বিনির্মাণ করছে নীতিকথারূপে (যদিও এই প্রক্রিয়া একমাত্রিক কালানুক্রম অনুযায়ী ঘটেনি, কিছু কিছু পশুকথা হয়তো সরাসরি নীতিকথা হিসেবেই গড়ে উঠেছে; মানুষ ও পরিবারকেন্দ্রিক নীতিকথাগুলি যেমন বোঝাই যায় সংগঠিত শ্রেণিবিভক্ত সমাজেই সেগুলির সৃষ্টি); তারই পাশাপাশি লোককথার একটি সমান্তরাল ধারা প্রবাহিত হয়েছে

কাল্পনিক অ্যাডভেঞ্চারধর্মী তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ কাহিনির আকারে। সাধারণ লোককথা(২) বিভাগের ঐন্দ্রজালিক কাহিনি (৩০০-৭৪৯) টাইপের গল্পগুলিকে মূলত এই ধারার আওতায় ফেলা যায়।

এই ধারাটির প্রথম সূচনা মূলত সূর্যকে কেন্দ্র করে। মানুষ তার চারপাশের প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করে সেদিন হয়তো এটি উপলব্ধি করেছিল যে, সূর্যই হচ্ছে সকল প্রাণশক্তির উৎস, তাই সূর্যই আদি প্রাণের প্রতীক। তাই সে সূর্যের গল্প বলতে চেয়েছে। আর পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির। অমানুষিক উপাদানগুলিকে মানুষরূপে চিহ্নায়িত করার প্রবণতাই মানুষের প্রতীকভাবনাকে রূপকের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যখন সে নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির শুভ/অশুভ গুণগুলিকে মানবীয় গুণের সাথে মেলাতে চেয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বইতে একটি এস্কিমো গল্পের উল্লেখ করেছেন, তাতে দেখি, শেষরাতে তুষাররাজ্যের রাজা সংহারমূর্তি ধারণ করে ঘর-পালানো দুষ্টু ছেলেটির প্রতি ধেয়ে আসছে ঝড়ের বেগে, সেইসঙ্গে ক্ষুধার্ত নেকড়ে ও ভাল্লুকের দল, আর ছেলেটিকে বাঁচাতে পিঠে নিয়ে পালাচ্ছে তার বন্ধু বল্গা-হরিণ, অবশেষে সূর্যের দয়ায় রক্ষা পাচ্ছে তারা, গলে জল হয়ে যাচ্ছে তুষারদানব (২০১৬ : ৮-৯)। তুষাররাজ্যের রাজা প্রকৃতির নিষ্ঠুর শক্তির চিহ্নায়ক, দুটি ধাপ রয়েছে এই চিহ্নটিতে, তুষাররাজার দানবীয় রূপকল্প ও তার সংহারমূর্তি সর্বনাশা তুষারঝড়ের রূপক, আর তুষারঝড় প্রকৃতির সমস্ত ক্ষতিকারক শক্তির প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক। যার বিরুদ্ধে সূর্য মানুষের রক্ষাকবচ, বিশেষত মেরু অঞ্চলে এটি ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক বাস্তব। এভাবেই মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার স্বপ্নকে সফল করতে চেয়ে রূপকথার জন্ম দিয়েছে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই স্বপ্নেরও বিবর্তন ঘটেছে, যার অভিঘাতে বদলে বদলে গেছে ভাবনা ও কাহিনির প্রেক্ষিত। সূর্য— এই চিহ্নটি আর শুধু রক্ষাকবচ বা রক্ষাকারী দেবতা হিসেবেই নির্দিষ্ট থাকেনি, বিশেষ বিশেষ সমাজব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ মূল্যবোধ ও ভাবানুভূতির নিরিখে মানুষ তাকে বিনির্মাণও করেছে। গ্রীক পুরাণে যে আপেলো ও দাফ্ন-এর কাহিনি পাওয়া যায়, তাকে সূর্য ও ঊষার কাহিনি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন জর্জ কক্স (Cox : 1879), তিনি দেখিয়েছেন যে, গ্রীকপুরাণের অনেক গল্পই 'সূর্য, মেঘ, শিশির আর অন্ধকারের প্রতীক কাহিনী' (গঙ্গোপাধ্যায় : ২০১৬

: ৯-১০)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (অথবা জর্জ কক্স) যাকে 'প্রতীক' বলছেন তা আসলে ইতিমধ্যেই প্রতীকের গণ্ডি ছাড়িয়ে রূপক হয়ে ওঠার দিকে তার যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। রাজপুত্র ও রাজকন্যার রূপকও তাই প্রথম সূর্য ঊষা মেঘ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে চিহ্নায়িত করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। আরও পরবর্তীকালে যখন দূরের পৃথিবীকে জানতে চাইছে মানুষ, মেতে উঠছে সাম্রাজ্যবিজয়ে, খুঁজে নিচ্ছে অচিনদেশ, গড়ে তুলছে নগর, বাণিজ্য, মানুষের সেই প্রথম উপনিবেশ-ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে তার প্রকৃতিচেতনা। তার সেই পৃথিবীজয়ের ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি স্থিতিশীল সুখভোগের বাসনা ইচ্ছেপূরণের গল্প হয়ে বিকশিত করছে রূপকথার ভুবন, যা আর এক সমান্তরাল বাস্তবতা। যেখানে কিন্তু নীতিকথার মতো (unlike the parables) লেখকের সচেতন খবরদারি নেই।

অবশ্য বিষয়টিকে এতখানি সরল করেও দেখা চলে না। কারণ পৃথিবীজয়ের ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা ও স্থিতিশীল সুখভোগের বাসনা— এই যোগটির মধ্যে একটি অস্পষ্ট স্ববিরোধ লক্ষ করা যায়। একটি সূক্ষ্ম শ্রেণিচেতনার বোধ আমাদের কাজে লাগাতে হয় এটি অনুধাবন করার জন্য যে, দিগ্বিজয় বা বাণিজ্যের লক্ষ্যে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া ও সেখান থেকে ধনসম্পদ, মণিমাণিক্য, অর্ধেক বা গোটা রাজত্বসহ রাজকন্যাকে লাভ করা মূলত উচ্চ ক্ষত্রিয় অথবা বণিক শ্রেণির স্বপ্ন। আর সুখী গৃহস্থ জীবনে নির্ঝঞ্ঝাট সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াটুকু সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণির সাবেক চাহিদা। এই দুটি প্রবণতার মিশেলে, দ্বিবাচনিকতায়, গড়ে উঠেছে রূপকথার বয়ান। যা তৈরি হয়েছে প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক নিম্নজীবীর অবস্থান থেকেই। প্রান্তিক শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ যখন ক্ষত্রিয় বা সামন্তরাজাদের অগাধ প্রতিপত্তি বিলাস বৈভব সমুদ্রযাত্রার নিদর্শনগুলি প্রত্যক্ষ করছে, তখন সে আকাঙ্ক্ষা করছে সেই অজানাকে ছুঁয়ে দেখার; অথচ সেই অজানা বাস্তব যেহেতু কোনোদিনই তার আয়ত্তাগম ছিল না, তাই সেই জগত তাকে গড়ে নিতে হয়েছে কল্পনায়, সে নিজেকে বিনির্মাণ করেছে ওইসমস্ত অভিজাত সামন্তপ্রভুদের আদলে, বাঁচতে চেয়েছে তাদের আলোকিত জীবন, কিন্তু তা নিজস্ব মূল্যচেতনার উপর দাঁড়িয়ে। যা সে কখনো পায়নি, কখনো পাবে না জীবনে, তাকে সে পেতে চেয়েছে হাতের মুঠোয় (এছাড়া রাজকন্যার রূপকল্পনার মধ্যে যে এক যৌন

অবদমন কাজ করে তাও অনস্বীকার্য)। রাজা-রানি-রাজপুত্র-রাজকন্যাকে তাই নিছক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক হিসেবে ধরলে হবে না, রূপক হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। রূপকথার মধ্যে প্রকৃতি (কথা-বলা গাছ, নদী, মেঘ, পাহাড়) বা মনুষ্যেতর প্রাণীরাও (পশু-পাখি-পতঙ্গ-সরীসৃপ) যেভাবে অসহায় রাজপুত্র বা দুখী মানুষের সাহায্যার্থে নিয়োজিত তা কার্যত শ্রমজীবী শ্রেণির সঙ্গে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতাকেই চিহ্নিত করে। উচ্চশ্রেণির চেতনায় এই ঘনিষ্ঠতাটুকু সেভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সেই কারণেই রূপকথায় মানবচরিত্রের সাথে প্রাকৃতিক উপাদানগুলির যে দ্বিবাচনিক সম্পর্ক, তাকে শুধুমাত্র শুভ-অশুভের বৈপরীত্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না।

৪. **পাল্টা রাজনীতি, রোমান্সের বীজ, লেখকের স্বৈরতন্ত্র :** নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "রূপকথার গল্পে শ্রেণী-বিভাগ ঘটল। তার কিছু গেল শিশুমহলে, কিছু বয়স্কদের আসরে গিয়ে নবতর সার্থকতা লাভ করল। আরও জীবননিষ্ঠ, বস্তু-সম্পৃক্ত এবং মানবতার আবেদনে মণ্ডিত হয়ে এই রূপকথাই মধ্যযুগীয় রোমান্সের তীব্র নিখাদে ঝঙ্কার তুলল। ...প্রতীক রূপকথার ইতিহাস শেষ হয়ে সাহিত্যের ইতিহাস আরম্ভ হয়ে গেল" (২০১৬ : ১৩)। কথাটুকু আংশিকভাবে মেনে নেওয়া চলে। কারণ কালানুক্রমিক বিচারে এটি সত্যি যে রূপকথার পরবর্তী যুগ রোমান্সের। রোমান্স লেখা চালু হওয়ার পর থেকে হয়তো রূপকথা সেভাবে আর সৃষ্টি হয়নি; রূপকথার ধারাটিকে প্রায় পুরোপুরিভাবে আত্তীকরণ করে নিয়েছে রোমান্স। কিন্তু এই কালানুক্রমিক বিচারভঙ্গি চিহ্নের বিবর্তনের যথার্থ মোটিফটিকে শনাক্ত করতে পারবে না যদি না আমরা তার গহন সমাজতত্ত্বে মনোযোগী হই। এক্ষেত্রে রূপকথা ও রোমান্সের মধ্যবর্তী কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিকে আমাদের অঙ্গুলিনির্দেশ করা প্রয়োজন। পূর্বোল্লেখ অনুযায়ী পৃথিবীজয়ের ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা ও সুখী নিরুপদ্রব গৃহকোণের স্বপ্ন— এই দুটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা, যা সৃজনী প্রেরণা হয়ে রূপকথাকে নির্মাণ করেছে, তা রোমান্সের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মৌলিক তফাতটুকু হয়তো এই যে, রূপকথা (যা আমরা দেখিয়েছি) মূলত নিম্নজীবী শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীজয়ের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার বিনির্মাণ, যার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে সহজসরল সুখী গৃহকোণের মায়া, ফলত যা রূঢ়ভাবে

আর ঔপনিবেশিক নয়; পক্ষান্তরে রোমান্স আসলে সেই একই আকাঙ্ক্ষার বস্তুগত নির্মাণ, তবে তা অভিজাত-শ্রেণির অবস্থান থেকে দেখা। তাই রোমান্সের মধ্যে বিমূর্তায়নের বদলে এক বস্তুগত নির্দিষ্টকরণ লক্ষ করা যায়। রূপকথার রাজা, রানি, রাজপুত্র ও ভিনদেশি রাজকন্যা রূপকধর্মী চিহ্নায়কের পরিবর্তে প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নায়ক হিসেবে বিনির্মিত হতে থাকে। এখানে চিহ্নের রাজনীতি মূলত এই যে, রূপককথার চরিত্ররা নির্ভেজাল রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা যেহেতু পরোক্ষে নিম্নজীবী শ্রেণিকেই চিহ্নায়িত করে ফেলবে, তাই রূপকধর্মিতাকে মুছে বস্তুনিষ্ঠ আকারে যদি তাকে উপস্থাপন করা যায় তা অবধারিতভাবে হয়ে উঠবে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক, নিম্নজীবীর কল্পচেতনা অলক্ষ্যেই হবে নির্বাসিত। এভাবেই কার্যত রূপকথার পক্ষীরাজ উড়ালকে সংযত করে আনা হল, যাতে সে সামন্তজীবনকেন্দ্রিক তথ্যপুঞ্জের ভার পিঠে নিয়ে, রাজপ্রাসাদের চূড়া অতিক্রম করে না উড়ে যেতে পারে। গুণাঢ্যের ‘বৃহৎকথা’-র রাজা উদয়ন বা রাজপুত্র নরসিংহ দত্ত কিংবা দণ্ডীর ‘দশকুমার চরিত’-এর কুমার রাজবাহন (নামচিহ্নের প্রয়োগ), কাউকেই আমরা সাধারণ সর্বস্তরের মানুষের চিহ্নায়ক হিসেবে ভাবতে পারি না, যা রূপকথার রাজপুত্রদের ক্ষেত্রে পারি। তাই বলা যায় রোমান্স প্রায় রূপকথার বিপরীতে লেখকের স্বৈরতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাত্ত্বিক এবং আক্ষরিক— খানিক দুই অর্থেই।

৫. প্রতিনিধির ভিড়, বণিকতন্ত্র ও আধুনিকতার স্বরূপ : কথাসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব দুটি সমান্তরাল প্রবণতার স্রোত বয়ে চলেছে গল্পকাহিনিগুলির মধ্যে। একটি স্রোত পশুকথা-নীতিকথার, যা বিষয়নিষ্ঠ ক্ষুদ্র পরিসরযুক্ত আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে ছোটোগল্পের দিকে প্রবহমান; অন্যটি দীর্ঘ আখ্যাননির্ভর কাহিনির ধারা, রূপকথা ও রোমান্সের মধ্য দিয়ে যা এগিয়ে চলেছিল উপন্যাসের দিকে। বিভিন্ন সময়ে পুরাণ-কিংবদন্তি-মিথকথাগুলি উপাদান হিসেবে এই দুটি ধারার সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। মাঝে অনেক সংযুক্তি-বিযুক্তি, অনেক ভাঙা-গড়ার ঢেউ। আসলে আদান-প্রদান-আত্তীকরণের এই প্রক্রিয়া সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে খুব স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান। তাই মানুষের সংস্কৃতিকে পুরোপুরি জ্যামিতিক দাগে শ্রেণিবিন্যস্ত করাও চলে না, যেখানে

তার প্রবহমানতা নিত্য ক্রিয়াশীল বলেই আমরা জানি। জাতক, পঞ্চতন্ত্র, আরব্যরজনী এইসব গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটগুলির দিকে তাকালে দেখব, সেখানে বিভিন্ন ধরনের কাহিনির উপস্থিতি।

বলা বাহুল্য, লোককথার তথা কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ভাগগুলির বিকাশ-সংক্রান্ত ইতিহাস রচনা ও তার কালানুক্রমিক তথ্যপঞ্জিকরণ আমাদের অভিপ্রায় নয়। আমরা কেবল এই বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমাজব্যবস্থার নিরিখে চিহ্নতাত্ত্বিক বিবর্তনের একটি রূপরেখা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। সাম্প্রতিক সময়ের একজন কবি লিখেছেন, "সমস্ত উত্থানই আসলে পতনোন্মুখ জেগে ওঠা" (বন্দ্যোপাধ্যায়: ২০১৩: ২৮)। আমাদের আলোচনাসূত্রে এর দৃষ্টান্ত আমরা আগেও পেয়েছি। দেখেছি যে-মুহূর্তে উন্মুক্ত হয় বহুস্বর-সম্ভাবনার পথ, সেই মুহূর্ত থেকেই জন্ম নেয় চিহ্নের মৃত্যুসম্ভাবনাও, যা পরবর্তীতে বহুস্বরকে ধ্বংসও করে; বা যে-কার্নিভালকে মনে হয় স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্লাটফর্ম, অনুরূপ সেইরকমই অথচ ভিন্ন এক মায়াকার্নিভাল সমস্ত পরিসরকে বানিয়ে তোলে ছায়াবাস্তব, চ্যালেঞ্জকে করে তোলে রঙিন বুদ্বুদ। তেমনই লক্ষ করা যাবে লোককথা ও প্রাচীন কথাসাহিত্যগুলির বয়ানেও। ইতোপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে মানুষের নীতিকথা বলার তাগিদ ক্রমশ প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশককে ছাপিয়ে জন্ম দিয়েছে রূপকপ্রতিমার, খুলে দিয়েছে স্বাধীন বিনির্মাণের পথ। এ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক উত্থান। কিন্তু এই স্বাধীন বিনির্মাণই আবার চিহ্নকে গুটিয়ে এনেছে বিশেষায়নের বৃত্তে, রূপক ক্ষয় পেতে পেতে হয়ে উঠেছে বিশেষ প্রতিনিধি।

উদাহরণস্বরূপ জাতকের 'বক ও কাঁকড়ার কথা' গল্পটিকে ধরা যাক। বক যেখনে মিথ্যা রটনায় মাছেদের বোকা বানিয়ে অন্য পুকুরে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে ভক্ষণ করে। এক কাঁকড়া বকের এই চক্রান্তের কথা টের পেয়ে তাকে জব্দ করে ও দাঁড়া দিয়ে গলা কেটে তাকে খুন করে। এই প্রচলিত পশুকথাটি জাতকে রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি পূর্বকাহিনি। সকলকে বোকা-বানানো জেতবনবাসী এক ভিক্ষু দর্জি ও তাকে পাল্টা বোকা-বানানো ভিনগ্রামের আর এক দর্জির গল্প। উক্ত পশুকথাটিকে চিহ্নায়ক হিসেবে ব্যবহার করে এই গল্পটিকে চিহ্নায়িত করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, জাতকের রীতি অনুযায়ী এটি ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, যাকে বলা হয় সমবধান।

জেতবনের সেই ভিক্ষু দর্জি (চীবর-বর্ধক) ছিল সেই বক, ভিনগ্রামের ভিক্ষু দর্জি ছিল কাঁকড়া, এবং 'আমি' অর্থাৎ শাস্তা ছিলেন বৃক্ষদেবতা, যিনি প্রত্যক্ষদর্শী ও কথকসত্তা। উদ্দেশ্য স্পষ্ট: ভিক্ষুদের মধ্যে অসৎ মনোভাবকে নিরুৎসাহিত করা। পশুকথাটির তাৎপর্যকে যে এই বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক পরিসরে সীমায়িত করে আনা হল, তার মধ্যে প্রথা ও প্রান্তিকায়িতের একটি বিরোধাভাস লক্ষ করা সম্ভব।

এই উদ্দেশ্যমূলকতা অন্য মাত্রা পেল পঞ্চাদশ-ষোড়শ শতকের ইউরোপে। বিশেষত ইতালীয় নবজাগরণের মধ্য দিয়ে। ইতালীয় নবজাগরণ ছিল মূলত একটি সাংস্কৃতিক বাঁকবদল; কিন্তু তার প্রেক্ষাপট অবশ্যই সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে বণিকতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে। বণিকতন্ত্রের প্রাধান্য কিছু এ-দেশে মধ্যযুগেও ছিল, এ-দেশের মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি প্রত্যক্ষ করলেই তা বোঝা যায়, কিন্তু ইউরোপে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন (যেমন, ড্রাই কম্পাস, দূরবীন, মুদ্রণযন্ত্র প্রভৃতি)। ফলে পুঁজির বিকাশ ও নতুন নতুন বাজারের সন্ধান জন্ম দিল এক বুর্জোয়া উপনিবেশবাদের। মধ্যযুগীয় উপনিবেশ-ভাবনার তুলনায় তা অনেক বেশি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাতপূর্ণ। ওই সময়েই আবির্ভাব হচ্ছে ভাস্কো-দা-গামা (১৪৬০/৬৯-১৫২৪ খ্রি.), কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) প্রমুখ কৃতি ইউরোপীয় বণিকের। এবং যেহেতু পণ্যবাদী চিন্তা ও জীবনবোধ ভীষণভাবেই বস্তুনির্ভর, তাই সেই সম্পর্কিত সাহিত্যচেতনা যে রূপকের বাস্তবতাকে মুছে ফেলবে ও প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নকে অবলম্বন করেই বিকশিত হবে, সেটিই স্বাভাবিক। মানুষ সব কিছুকেই জয় করেছে ও সব কিছুর ওপরেই সে বৈষয়িক অধিকার কায়েম করেছে, তাই তার কাছে রহস্য বলে কিছু নেই। এই সময়ে দাঁড়িয়েই *Gargantua et Pantagruel* (গারগাঁতুয়া ও পাঁতাগ্রুয়েল) রচনা করেন রাবলে (১৪৯০-১৫৫৩)। পান্যুর্জের সমুদ্রযাত্রার বিবরণকে কি বলা যাবে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণির পৃথিবীজয়ের ধ্বজা উত্তোলনের চলচিত্র? নাকি বিকল্প কোনো রাজনৈতিক স্বরলিপি? পরবর্তীকালে ডাফোর 'রবিনসন ক্রুশো' (১৭১৯) লেখাটিই-বা কীরূপ তাৎপর্য হাজির করে?

ইতোপূর্বে চতুর্দশ শতকে প্রকাশিত হয়েছে গিয়োভানি বোক্কাচ্চোর 'দেকামেরন' এবং জিওফ্রে চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেলস', যেগুলি জাতকের মতোই বহুবিচিত্র

ছোটোবড়ো গল্পের সমাহার, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে গল্পগুলির নির্মাণে প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নের রাজত্ব অনেক বেশি। প্রাচীন লোককথা থেকে জাতক, পঞ্চতন্ত্র, আরব্যরজনী হয়ে 'দেকামেরন' বা 'ক্যান্টারবেরি টেলস' অবধি লোককথার টাইপগুলি যদি আমরা নিরীক্ষণ করি তাহলে দেখব সমীক্ষাগতভাবে মূল টাইপগুলির প্রাধান্যের ছকটি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে: ১. পশুকথা, ২. সাধারণ লোককথা (যার বেশিরভাগটাই ঐন্দ্রজালিক কাহিনি), ৩. হাসি ও পারিবারিক কাহিনি— জাতক-পঞ্চতন্ত্র অবধি যাকে ক্রমতালিকায় এভাবে সাজানো যেতে পারত, 'দেকামেরন' বা 'ক্যান্টারবেরি টেলস' অবধি পৌঁছে তাকে সাজানো চলে এভাবে : ১. হাসি ও পারিবারিক কাহিনি, ২. সাধারণ লোককথা (যার বেশিরভাগটাই ঐন্দ্রজালিক কাহিনি নয়) ও ৩. পশুকথা (যা নীতিকথারূপে বিরাজমান)।

১৮-১৯ শতকের ইউরোপে এই প্রক্রিয়াই সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরও ত্বরান্বিত হল। অষ্টাদশ শতকের ইংলন্ডের দিকে আমরা যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, সেখানে "নগরকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে নগরে শহরে শিল্পাঞ্চলে অসংখ্য কফি হাউস আর ক্লাব গড়ে উঠল। ...ক্লাবকেন্দ্রিক সমাজের মূলে বণিকতন্ত্রই প্রধান। ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে শ্রমিক গৃহভৃত্য, শিক্ষানবীশ, কেরানী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীরও ভিড় বাড়তে থাকল।" (ভট্টাচার্য : ২০০৩ : ২৭)। এইভাবে যত নতুন নতুন শ্রেণির সৃষ্টি হল, সমাজের দ্বিবাচনিক সম্পর্কগুলি তত জটিল হতে থাকল। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে লেখনী নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করল প্রকাশক ও গ্রন্থবিক্রেতাদের হাতে। দেবীপদ ভট্টাচার্য থেকে আর একটু অংশ উদ্ধৃত করতেই হচ্ছে :

> সেদিনকার মুদ্রাযন্ত্র, পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশ সবই এক শ্রেণীর পুস্তক-প্রকাশকের আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছিল। গ্রন্থপ্রকাশের একচেটিয়া মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদের উপরও মালিকানাস্বত্ব যেন এসে গিয়েছিল। ডাফো তাই ১৭২৫-এ লিখেছিলেন : Writing…is become a very considerable branch of English commerce. (২৭)

এইরকম একটি সমাজে খুবই স্বাভাবিক— বস্তু, যা আসলে পুঁজি, তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় মানুষ তথা পাঠক তার অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে চাইবে। খুঁজতে চাইবে পরিচিতির মালিকানাস্বত্ব (বুর্জোয়া সমাজে যার একটি গাল-ভরা নাম রয়েছে: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য)। এইভাবে শুধু ইংলন্ডে নয়, গোটা ইউরোপেই, এমনকি তার ঢেউ লেগে আমাদের প্রাচ্যদেশেও, বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক চিহ্নচেতনা যে উনিশ শতকীয় আধুনিকতাকে নির্মাণ করেছে, তারই গর্ভে লালিত পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্প।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যের চিহ্নকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ইতোপূর্বে আমরা প্রাচীন জনশ্রুতিনির্ভর মৌখিক (বর্তমানে মুদ্রিত) লোককথাগুলির সম্ভাব্য জন্মকাল তথা আঁতুড়ঘর থেকে শুরু করে হাঁটতে হাঁটতে সাম্প্রতিক সময়ের মুদ্রিত ও পঠিত (প্রধানত বাংলা) 'আধুনিক' গল্প-উপন্যাসের ফটকদরজা অবধি পৌঁছানোর পর যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে আমাদের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কথাসাহিত্যের বর্গায়িত রূপরেখাচিত্র ও চিহ্নচেতন চেহারা-চরিত্রের বিবর্তনতালিকা নির্মাণের দ্বারা মূলত মুদ্রণনির্ভর বাংলা গল্প-উপন্যাসের আলোচনায় প্রবেশ করার একটি পাদভূমি আমরা গঠন করতে চেয়েছি। সেখানে বিশেষত রূপকচিহ্নের প্রয়োগকেই প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি আমাদের প্রগাঢ়রকম প্রেম ও পক্ষপাতিত্ব। কারণ আখ্যানের রূপকধর্মিতাই সময়ের বহুমাত্রিক পাঠগুলিকে বয়ানের গভীরতলে লুকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে সমর্থ হয়, তাকে জুড়ে দিতে পারে আবহমানের শরীরে, যদিও এই প্রকল্পে নির্দেশকচিহ্নের গুরুত্বও নেহাত কম কিছু নয়। আমরা এখানে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে 'কল্লোল'-সমসাময়িক বা 'কল্লোল'-পরবর্তী কোনো কোনো লেখক যথা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ পেরিয়ে আরও পরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কিংবা বিমল কর, হাংরি গোষ্ঠীর গল্পকার বাসুদেব দাশগুপ্ত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের লেখকদের কেউ কেউ, এছাড়া সুবিমল মিশ্র, নবারুণ ভট্টাচার্য কিংবা সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অবধি দীর্ঘ সময়ের সাহিত্যকারের রচনা থেকে কিছু-বা এলোমেলো ও খাপছাড়াভাবেই নানাবিধ ব্যঞ্জনার ভাষা ও ভাঁজ কিংবা অভিব্যক্তিগুলিকে আহরণ করে যথাসম্ভব বিশ্লেষণ ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বুঝতে চেয়েছি চিহ্নতাত্ত্বিকতার বিচিত্র সম্ভাবনা ও সংলাপ।

৩.১. চিহ্নের লোকায়ত বীজ: জাদুব্যঞ্জনার গহনভাষ্য ও ত্রৈলোক্যনাথ

আগের অধ্যায়টি যে-যুক্তির পাদপীঠে এসে মিশেছে, সেই যুক্তিতত্ত্বকেই মৌল একক ধরে আমরা এই পরবর্তী আলোচনায় পদার্পণ করতে চাইছি। ইউরোপে রেনেসাঁ-প্রসূত বুর্জোয়া সমাজ-কাঠামোয় চিহ্নচেতনার নতুন সংস্করণ যে আধুনিকতার জন্ম দিচ্ছে, সেখানেই ক্রমশ মাথা তুলছে কথাসাহিত্যে উপন্যাসের জয়ধ্বজা। আর এই তথাকথিত নবজাগরণের ঢেউ যে এ-দেশেও আছড়ে পড়েছিল, সে বিষয়েও আমরা সকলে অবহিত। ইউরোপীয় সমাজের সেই একই প্রেক্ষিত একই মোটিফ আমাদের তৎকালীন বাংলাদেশেও, একটু দেরিতে, বিবর্তনের বিশেষ ধারায় লক্ষ করা যায়। বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে মুদ্রণযন্ত্রের যোগটি যে ওতপ্রোত, সে-প্রশ্নে আমাদের দ্বিমত হওয়ার কোনো জায়গা নেই। এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের (একটা ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে হলেও) একটা সমাজতাত্ত্বিক অভিমুখ রয়েছে। দেবীপদ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে লেখেন:

> রেনেসাঁস-পরবর্তী মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ। যন্ত্রশিল্প মূলতঃ নাগরিক ও বণিকতন্ত্রী সমাজের সৃষ্টি। আর মুদ্রিত গ্রন্থ, পুস্তিকা বা সাময়িক ও সংবাদপত্র বর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন পাঠকের জন্যই। Listening public বা শ্রোতা-সাধারণের জন্য পালা-গীত, পালা-কীর্তন বা কথকতাই স্বাভাবিক। কিন্তু নাগরিক সমাজে Reading public বা পড়ুয়া-সাধারণ দেখা যায়। তখন ছাপা বইয়ের প্রয়োজন হয়। ...কাজেই নগরকেন্দ্রিক সমাজ, গ্রামত্যাগী, শহরবাসী, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবীর সমাবেশ, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সূচনা, বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্‌ভব, মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব যখন বাংলাদেশে তখনই সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক, পুস্তিকা, নক্‌শা, মননশীল রচনা সবই গদ্যাশ্রিত রূপ নিয়ে দেখা দিতে পেরেছে। (১০৫-১০৬)

সুতরাং সমাজতাত্ত্বিক নিয়ম মেনেই, বাংলা কথাসাহিত্যের এই বিকাশও, প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নভাবনাকে অবলম্বন করেই হয়েছিল। ১৮২১ সালের ৯ই জুন ‘সমাচার দর্পণ’-এর জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত সংখ্যায় ‘বাবুর উপাখ্যান’-এর প্রথম অংশ থেকে শুরু করে বাংলা উপন্যাসের দীর্ঘ সূচনাকাল, বঙ্কিমযুগ, প্রায়

সমস্তটাই এই ক্ষমতা-কেন্দ্রিকতার অংশ। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিসরে এই বাস্তবতার এক স্বাভাবিক ধর্ম আছে, তা হল, এর ভিতরকার দ্বন্দ্ব, এর ভিতরকার দ্বিবাচনিক কাঠামো, যা এদেশীয় প্রেক্ষিতে এক নিজস্ব উন্মেষ। একদিকে যেমন আলোকপ্রাপ্তি, ইউরোপীয় যুক্তিবাদ নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নিচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিকে, আবার পাশাপাশি দেশীয় লোকসংস্কৃতির এক পরাজিত ঐতিহ্যও অন্তঃসলিলা হয়ে রয়ে গেছে। যা শুধু রক্ষণশীলদের নেতিবাচক স্থূল বিরোধিতার মধ্যেই দৃশ্যমান নয়, সেই একমাত্রিক স্তরটুকু অতিক্রম করলে দেখা যাবে, কখনও তা গঠনমূলক সূক্ষ্ম দীর্ঘশ্বাসরূপেও তার বাষ্পবিকিরণ করেছে। ইউরোপীয় বণিকতান্ত্রিক সভ্যতার চিহ্নচেতনার আগ্রাসনের ভিতর দাঁড়িয়ে বহু লেখকই হয়তো প্রাচ্যপৃথিবীর নিজস্ব চিহ্নবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়তো প্রচ্ছন্নই রয়ে গেছে। এ-নিয়ে গবেষণামূলক অনুসন্ধান করা যেতেই পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে উপাদানের অভাব হয়তো একটি বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে; কারণ সেইসময়ে প্রকাশিত অনেক গ্রন্থই বর্তমানে পাওয়া যাবে না। সমালোচকদের লেখা থেকেও সেভাবে কিছু পাওয়া মুশকিল, কারণ তথাকথিত অদ্ভুতরসের কাহিনিগুলি হয়তো 'শিশুপাঠ্য', 'কিশোরপাঠ্য' বা 'মনোরঞ্জনমূলক লেখা' বলে উপেক্ষিত। এগুলির মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের *কঙ্কাবতী*-ই (১৮৯২) শুধু সেসব উপেক্ষা বহন করেও পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম অবধি ক্লাসিক সাহিত্য হিসেবে টিকে আছে। কিন্তু এর বাইরেও কিছু উদাহরণ রয়ে গেছে কিনা সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। যেমন একটি সংশয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর বইতে ক্ষেত্র গুপ্ত ১৮৬৯/৭০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত গদ্য গল্পগ্রন্থগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন (২০০৮ : ৪২), যেখানে আমরা *হংসরূপী রাজপুত্রাদির বিষয়* (১৮৫৭), *মৎস্যনারীর উপন্যাস* (১৮৫৮), *চকমকির বাক্স ও অপূর্ব বাজযন্ত্র* (১৮৬৭), *চীনদেশের বুলবুল পক্ষীর বিবরণ* (ঐ) প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থের নামোল্লেখ পাচ্ছি, যেগুলির লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, যেগুলি অনুমানভিত্তিকভাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত চিহ্নতাত্ত্বিক প্রতিরোধকল্পের সন্ধান দিলেও দিতে পারে। কিন্তু এইজাতীয় বইগুলি, উনিশ শতকের অন্যান্য অনেক বইয়ের মতোই, সুলভ না হওয়ার দরুন আমাদের মূলত ত্রৈলোক্যনাথ ও *কঙ্কাবতী*-র (১৮৯২) উপরেই নির্ভর করতে হবে।

তার আগে একঝলক আমরা দেখে নিতে চাই, বাংলা উপন্যাসের ইউরোপীয় ধাঁচের প্রতিস্পর্ধী যা-কিছু প্রয়াস উনিশ শতকে দেখা গিয়েছিল তার স্বরূপ ও তাৎপর্যটুকু ঠিক কেমন ছিল। তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর বইতে এইরকম কিছু টেক্সট-কে চিহ্নিত করেছেন যেখানে কিনা "একই পাঠকৃতিতে একাধিক সন্দর্ভ পরস্পর-নিবিষ্ট হয়ে সামাজিক অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিকতাকে স্পষ্ট করে তোলে"; সেগুলি হল—

- ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: *নববাবুবিলাস* (১৮২৩) ও *নববিবিবিলাস* (১৮২৩)
- হ্যানা ক্যাথারিন মলেন্স: *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২)
- কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য: *দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ* (১৮৫৭), *বিচিত্রবীর্য* (১৮৬৪)
- প্যারীচাঁদ মিত্র: *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮), *মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়* (১৮৫৯)
- হরিনাথ মজুমদার: *বিজয়বসন্ত* (১৮৫৯)
- লালবিহারী দে: *চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান* (১৮৫৯)
- কালীপ্রসন্ন সিংহ: *হুতোম পেঁচার নক্‌শা* (১৮৬২)

উপরিউক্ত আখ্যানগুলি সম্পর্কে তিনি একজায়গায় লিখেছেন— "বিকল্প বয়নের সম্ভাবনা তৈরি করেও ওইসব রচনা যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো—তারও প্রধান কারণ ঘনায়মান ঔপনিবেশিক সমাজ-সংস্থার সাংস্কৃতিক রাজনীতি।" (১৯৯৬ : ৭৩) এবং এগুলির মধ্যে যে দুটি টেক্সট-কে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়, সেই *আলালের ঘরের দুলাল* (লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র) ও *হুতোম পেঁচার নক্‌শা* (লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ) সম্পর্কেও তিনি মূল্যায়ন করেন— "দুটি প্রতিসন্দর্ভের নির্মাতা যেহেতু সামাজিক অবস্থানগত অনিবার্যতায় অন্তেবাসী জনের পরিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারেন নি এবং তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গাত্মক সমালোচনা সত্ত্বেও বয়নের অন্য কোনও বিকল্প অবলম্বন নির্দেশিত হয় নি— আখ্যান-সংগঠনের প্রতীচ্যায়িত ধারার সমান্তরাল প্রতিস্রোত গড়ে উঠলো না।" (৭২) তপোধীরবাবুর এই খেদোক্তিকেই আমাদের সমর্থনবাক্য হিসেবে ধরে আমরা আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আসলে *আলালের ঘরের দুলাল* বা *হুতোম পেঁচার নক্‌শা* যতই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাহায্যে রক্ষণশীলদের গোঁড়ামি ও নতুন

মধ্যবিত্ত বাবুসম্প্রদায়ের ভণ্ডামিকে কটাক্ষ করুক না কেন, তা শেষমেশ উপন্যাসের পাশ্চাত্য মডেলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারল না, কারণ সেগুলিতে 'বয়নের অন্য কোনও বিকল্প অবলম্বন' নির্দেশিত হল না, গড়ে উঠল না 'আখ্যান-সংগঠনের প্রতীচ্যায়িত ধারার সমান্তরাল প্রতিস্রোত'। তার প্রধান কারণ, তপোধীরবাবুর কথামতো, 'ঘনায়মান ঔপনিবেশিক সমাজ-সংস্থার সাংস্কৃতিক রাজনীতি'; আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করব যে, সেই সাংস্কৃতিক রাজনীতি মূলত চিহ্নের রাজনীতি, সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ চিহ্নতাত্ত্বিক প্রবণতার আগ্রাসন। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে, স্বাভাবিক সমাজতাত্ত্বিক কারণেই ইউরোপীয় বণিকতন্ত্র তার সাংস্কৃতিক পরিসরে যে প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নায়ককেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছে, সেই চিহ্নের বোধকে পাথেয় করেই গড়ে উঠেছে আধুনিক উপন্যাস। প্রাচ্যদেশের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত উপন্যাসও একই চিহ্নভাবনাকে লালন করে। প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখেরা পাশ্চাত্যবাহিত বণিকতন্ত্রপ্রসূত আধুনিকতার অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করলেও, যেহেতু তাঁরা প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নকেই অবলম্বন করেছেন, আখ্যানের বয়নে রূপকের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেননি, তাই সেসব রচনা যে শেষাবধি ইউরোপীয় ছকের বিপরীতে কোনো জোরালো প্রতিস্রোত তৈরি করতে পারবে না, তা যেন পূর্ব-নির্ধারিতই ছিল।

সুতরাং আলোচনার্থে আমরা ত্রৈলোক্যনাথের লেখার কাছে ফিরে আসব। স্মরণীয়, 'লুল্লু' গল্পের শেষে ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন, "গোঁগোঁ যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র অফিসেই তাঁর অদৃশ্যভাবে যাতায়াত আছে। অন্যান্য কাগজের লেখকেরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনো কখনো গোঁগোঁ তাঁহাদিগের ঘাড়ে চাপেন। ভূতগ্রস্ত হইয়া লেখকেরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন, তাহার কথা আর কি বলিব! তাই বলি, লেখক দল! সাবধান!" (১৯৯৫ : ৪২৪)। উল্লিখিত এই গোঁগোঁ ভূত প্রায় স্পষ্টতই মুদ্রণশাসিত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে রূপকান্বিত করে। ত্রৈলোক্যনাথ এই ভূতের খপ্পরে সেভাবে পড়েননি— একথা বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সেইসময় ও দেখতে গেলে পরবর্তীতেও দীর্ঘকাল অবধি *কঙ্কাবতী*-র (সেইসঙ্গে

ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য রচনারও) যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। যতদিন না অবধি হয়তো বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার পরিসরে নব্য-মার্ক্সবাদী[১] সমালোচনা-পদ্ধতির সেভাবে বিকাশ ঘটেছে ততদিন অবধি *কঙ্কাবতী* (এবং ত্রৈলোক্যনাথ) একপ্রকার উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। *কঙ্কাবতী* (সুজন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯)-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ-কৃত যে সমালোচনাটি রয়েছে ('সাধনা', ফাল্গুন ১২৯৯), তাকে একধরনের উৎকৃষ্ট মানের ব্যাজস্তুতিই বলতে পারি আমরা। তিনি যতই 'বাজে কথা'-র তত্ত্ব, নির্মল আনন্দরসের তত্ত্ব এনে হাজির করুন না কেন, তাতে তিনি বইটিকে যে 'বালক-বালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরস গ্রন্থ' বা 'ছেলেমানুষি বই' হিসেবেই দেখছেন সেকথা লুকিয়ে থাকে না, লুকিয়ে থাকে না এই ধারণাটিও যে বইটিতে আসলে 'সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, তাহা নহে', অথবা কোনো কথারই তাৎপর্য নেই; সমালোচনার শেষ স্তবকটিকে নিছক ভদ্রতাপ্রয়াস বা কথার কৌশলী পলায়ন বলেই মনে হয়, যেখানে প্রশংসার ছলে নিন্দা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে 'উপাখ্যান'-টির যে দুটি 'ত্রুটি' তিনি 'মার্জনা' করে দিয়েছেন, সে-দুটি একটু দেখে নেওয়া যাক: প্রথমত, তা স্বপ্নের মতো 'সৃষ্টিছাড়া' হলেও স্বপ্নের মতো 'অসংলগ্ন' নয়, কিছু কিছু ঘটনা কঙ্কাবতীর স্বপ্নদৃষ্টির বাইরে ঘটছে, এছাড়া কিছু কিছু 'ভাব' ও 'দৃশ্য' কঙ্কাবতীর উপযোগী নয়, অর্থাৎ স্বপ্নের কাহিনি ও স্বপ্নদর্শী চরিত্রের ঐক্য এখানে রক্ষিত হয়নি। এটি আপাতত স্বীকার করে নেওয়া যাক, অথবা অন্যত্র আলোচনার জন্য তোলা থাক, তার আগে আমরা দ্বিতীয় অভিযোগটি দেখে নিই— তা হল, প্রথমাংশের 'বাস্তব' ঘটনা বহুদূর অবধি অগ্রসর হওয়ার পর গল্পকে হঠাৎ অসম্ভব রাজ্যে এনে ফেলা, তাঁর মতে যা কিনা 'সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত' (৫-৭)। বাস্তব-অবাস্তবের এই বাইনারি, গল্পের গতিপথ বিচ্যুত হওয়ায় বিরক্তির বোধ প্রভৃতি এটিই নির্দেশ করছে যে, সমালোচক আখ্যানের ইউরোপীয় কাঠামোর অনুবর্তী প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকচিহ্নের মিছিল হিসেবেই কাহিনিকে দেখতে চাইছেন: এক্ষেত্রে বলার, বহুমুখী প্রতিভা ও মননশীল চিন্তাচেতনার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে তাঁর যুগমানসকে বা নিজস্ব সময়খণ্ডের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে না, এটি তার এক অন্যতম দৃষ্টান্ত।

যা-হোক এই প্রসঙ্গগুলি আপাতত সরিয়ে রাখাই শ্রেয়, এইজাতীয় সমালোচনার ইতিহাস খুঁজতে শুরু করলে খেদোক্তি ও অভিযোগ-অনুযোগের পাহাড় তৈরি হবে, সেসব মামলা-মোকদ্দমায় না গিয়ে আপাতত আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে *কঙ্কাবতী* উপন্যাসটিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করি।

উপন্যাসটি দৃশ্যত দুটি ভাগে বিভক্ত। কিন্তু আমরা যদি আরেকটু নিবিষ্টভাবে দেখতে চাই, তাহলে দেখব যে আখ্যানটিকে ধারণ করে আছে আসলে তিনটি পৃথক সময়-পরিসর। এক. প্রাচীন কথা, দুই. কুসুমঘাটীর তথাকথিত বাস্তব, এবং তিন. তথাকথিত অবাস্তব জগত। 'প্রাচীন কথা' অংশটি প্রথম ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদ হিসেবে গ্রন্থিত হয়েছে, খুব সাধারণ গৌরচন্দ্রিকার মতো, কিন্তু এই অংশটি আলাদা এক গুরুত্ব দাবি করে। আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন, এই লোককথার গল্পটি কত প্রাচীন, কী তার তাৎপর্য, কেনই-বা তার অবতারণা। তা কি মূল কাহিনি শুরুর আগে একজন কথকের নিছক প্রাথমিক আড়মোড়া ভাঙার পরিসর, নাকি প্রকৃতই কোনো বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে অংশটির! গল্পটিতে দেখছি যে, ভাই ভগিনীকে বিবাহ করতে চাইছে ও মা-বাবা তাকে বোঝাচ্ছেন অর্থাৎ নিষেধ করছেন, এই চিহ্নটি সেই সময়ের প্রত্নস্মৃতিকে তুলে ধরছে যখন ভাইবোনের বিয়ে সমাজে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু খুব জোরালো ট্যাবুতে হয়তো পরিণত হয়নি, এবং ততদিনে সেই সমাজ-সংস্থান নিশ্চিতভাবে পুরুষতান্ত্রিক, কারণ বাবা-মায়ের কোমল নিষেধের পর ভাইয়ের দাপুটে ঘোষণা, "আমি নিশ্চয়ই কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব" ও তাতে কঙ্কাবতীর মনে 'ভয়' হওয়া ও তার 'নিরুপায়' হয়ে যাওয়া সেটিই ইঙ্গিত করে। ভাইয়ের খামখেয়ালি ইচ্ছের বিরুদ্ধে যখন সমাজে কোনো প্রতিরোধ নেই, তখন মরিয়া প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয় কঙ্কাবতীকে নিজেই, যা ওই ব্যবস্থার ভূমিতে থেকে সম্ভব নয়, তাই কঙ্কাবতী গড়ে তোলে নিজস্ব 'নৌকা', ভেসে যায় খিড়কি পুকুরের মাঝখানে। কঙ্কাবতীর 'নৌকা' তার স্বনির্ভরতা অর্থাৎ আত্মশক্তির রূপক। যা তাকে নিয়ে যায় পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। 'খিড়কি পুকুরের মাঝখান' সেই প্রতিস্পর্ধী বিকল্প জগত, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার হাত পৌঁছয় না; কঙ্কাবতীর 'ভাই', যে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি, সে কঙ্কাবতীকে 'বিবাহ' করতে অর্থাৎ তার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে না (বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু

আমরা জানি পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার পরোক্ষ মাধ্যম); খিড়কি পুকুর হয়ে ওঠে কঙ্কাবতীর নিজস্ব স্পেস। এবং প্রাচীন ইতিহাসের চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা জানেন যে পুকুর বা 'পুষ্করিণী'-র সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সাংস্কৃতিক যোগ রয়েছে। সুতরাং লোককথার গল্পটি আসলে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাবৃত্তকে অস্বীকার করে প্রতিস্পর্ধী পরিসর খুঁজে-নেওয়া এক নিরুপায় নারীর গল্প। এই গল্পটিকেই ত্রৈলোক্যনাথ যেন পুনর্বিন্যস্ত (বিনির্মাণ?) করলেন উনিশ শতকের আলো-অন্ধকার বাংলাদেশের সময়-পরিসরে।

সেই সময়-পরিসর "শহর অঞ্চলে নয়, বন্য প্রদেশে, কুসুমঘাটী বলিয়া একখানি গ্রাম" (মুখোপাধ্যায়: ২০০৯: ১২)। সুতরাং লেখক যে আখ্যান পেশ করতে চলেছেন তা যে 'শহর অঞ্চল' তথা কেন্দ্রীভূত নাগরিক সমাজ-সংস্কৃতির গল্প নয়, প্রতিকল্পে তিনি যে 'বন্য প্রদেশ' তথা প্রান্তিকায়িতের বয়ান ফুটিয়ে তুলতে চান, তা শুরুতেই কিছুটা স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রান্তিক জীবনের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে, অথচ নগরকেন্দ্রের রোম্যান্টিক মায়াঞ্জন-চোখে সেই জীবন ও প্রকৃতিকে দেখা হচ্ছে, এমনটি এখানে ঘটেনি। কুসুমঘাটী নামক যে গ্রামটির কথা বলা হয়েছে, সেখানে খুনে ডাকাতের দল আছে, তাদের গ্রাম থেকে গ্রামে মৃতদেহ পাচারের অভিনব কৌশল আছে, ষড়যন্ত্র আছে, সেইসঙ্গে রয়েছে বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে পিতামহী ও মাতামহীদের সাবধানবাণী— "ডাইনীরা পথে 'কুটা' হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তৃণ যেন মাড়াইও না, তাহা হইলে ডাইনীতে খাইবে" (ঐ), অতি সামান্য সাধারণ তৃণের ডাইনিরূপে আবির্ভূত হওয়া ও মানুষকে গ্রাস করার লোকায়ত এই কল্পতথ্যটি রূপকার্থে গ্রাম-রাজনীতির আপাত-নিরীহ কুটিল বীভৎসতাকে ব্যক্ত করে; নদীর ভিতর বহুসংখ্যক 'জীবন্ত পাথর'ও অনুরূপ ব্যঞ্জনা বহন করে; আরও দেখি, শিকড়ের গুণে বাঘে পরিণত হতে পারে মানুষ, যাদের কেউ কেউ শিকড় না খুলতে পারলে চিরকাল বাঘই রয়ে যায়, যারা "লোকের প্রতি ভয়ানক উপদ্রব করে"— এখানে মানুষ থেকে বাঘে রূপান্তরের মোটিফটিও আসলে পরিস্থিতিমাফিক মানুষের গোপনে গোপনে হিংস্র হয়ে ওঠার কাহিনি, এবং যারা এই ক্ষমতার মোহ যারা কাটিয়ে উঠতে পারে না, তারা জনসাধারণের পক্ষে হয়ে ওঠে ভয়ানক, মাথায় পরিধান করার ঐন্দ্রজালিক 'শিকড়' তাই এখানে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার সংযোগের রূপক (খেতুর

শেকড় পরিধান-প্রসঙ্গ অবশ্য খানিক ব্যতিক্রম, যেহেতু তা কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগতের অংশ অর্থাৎ শোষিতজনের দমিত ইচ্ছের বয়ানে নির্মিত)।

এই আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার ভীষণ ষড়চক্র ও তার বিবিধ কুটিল অভিসন্ধির অজস্র দৃষ্টান্ত আমরা পাব এই উপন্যাসের প্রথম ভাগ জুড়ে, এবং দ্বিতীয় ভাগেও, কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগতের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেবে কুসুমঘাটীর নির্জলা বাস্তব, যা শুধু কুসুমঘাটীরই নয়, হয়তো-বা উনিশ শতকের প্রান্তিক বাংলার সামগ্রিক চালচিত্র। তনু রায় চরিত্রটি দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। তার বৈষয়িক লোভ ও নির্লজ্জতা, অধিক টাকার লোভে বয়স্ক পাত্র দেখে কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার পরিকল্পনা, বাঘ-জামাতাকে খাদ্য হিসেবে বুড়ি গাই ও দু-জন অপ্রিয় মানুষের নাম প্রস্তাব করা— সমস্ত কিছুই তাকে একটি জঘন্য নীচ দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু আমরা এখানে এসব ভালো-মন্দ নিন্দা-প্রশংসার দ্বন্দ্বজোড় নিয়ে ভাববাদী আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। এখানে বরং লক্ষ করার মতো বিষয়, তনু রায় লোকটি বিধবা বিবাহের সমর্থক। তাতে হয়তো আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু আরও লক্ষ করার মতো বিষয় যে, তনু রায়ের পুত্র, যাকে তনু রায়ের ছায়া বলা চলে, কাহিনির বয়ানে যাকে তনু রায়েরই অবিকৃত উত্তরসূরি হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সে অথচ সহমরণ প্রথার সমর্থক। প্রশ্ন এখানেই যে, একই প্রবণতাবিশিষ্ট দুটি (আদতে একটিই বলা যায়) মানুষের কাছে একই সঙ্গে সহমরণ ও বিধবা বিবাহ গ্রহণীয় হয় কোন্ যুক্তিতে। এর উত্তর সামাজিক ন্যায়নীতি মূল্যবোধের নিরিখে পাওয়া সম্ভব নয়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনার চেষ্টা করছিলাম যে, পুঁজিবাদের নিজস্ব কোনো মতাদর্শ নেই, তার অভীষ্ট কেবল মুনাফা। এখানেও তাই বিধবা বিবাহ বা সহমরণের প্রকৃত তাৎপর্য কিংবা তার সামাজিক সুপ্রভাব-কুপ্রভাব নিয়ে তনু রায় ও তার পুত্রের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। এই জাতীয় সমর্থন বা অসমর্থনের পিছনের মূল কারণ আমরা দেখব, ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় বলা হয়েছে— "তনু রায় পণ্ডিত লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতটি যেই বাহির হইল, আর ইনি লুফিয়া লইলেন।" (৩২) এই 'লুফিয়া' নেওয়ার নিহিতার্থটুকু আমরা পাই নিরঞ্জনের অপ্রিয় বচনে— "বিধবা-বিবাহটি প্রচলিত হইলে তনু রায়ের ব্যবসাটি চলে ভাল।" (ঐ) সহমরণ প্রসঙ্গে তনু রায়ের পুত্রের মনোভাবও আসলে অনুরূপ— "আজ-কাল আর

সহমরণ প্রথা নাই বলিয়া, ইনি মাঝে মাঝে খেদ করেন। কারণ, তাহা থাকিলে ভগিনী দুইটি নিমিষের মধ্যে স্বর্গে যাইতে পারিতেন। বসিয়া বসিয়া মিছামিছি বাপের অন্নধ্বংস করিতেন না। সাহেবেরা স্বর্গের দ্বারে এরূপ আগড় দিয়া দেন কেন?" (১৬) কঙ্কাবতীকে লেখাপড়া শেখানোর প্রসঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি তনু রায়ের সমর্থনও কিছুটা অনুরূপ যুক্তিতে গাঁথা। এমনকি কন্যাপণ হিসেবে আকর্ষণীয় পরিমাণ টাকা পেলে বাঘের সঙ্গেও তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে প্রস্তুত (অতিরঞ্জিত হলেও এই তথ্যটুকু যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ)। আজ একুশ শতকের পুঁজিবাদী সমাজে আমরা যেমন দেখি যে, political economy আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, হয়তো উনিশ শতকের ক্ষয়িত ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ক্ষয়িত সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ভিতরেও সেই পুঁজিবাদী মানসিকতার বীজ ছিল অঙ্কুরিত। তনু রায় যেন আধুনিক পুঁজিবাদেরই উনিশ শতকীয় মানব প্রতিমূর্তি। পরবর্তীতে ত্রৈলোক্যনাথেরই সৃষ্ট ডমরুধর চরিত্রটি যেন এই তনু রায়েরই বৈচিত্র্যময় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। *ডমরু-চরিত* যেহেতু একক ধারাবাহিক কোনো আখ্যান সেভাবে উপস্থাপন করে না, এটি মূলত একটি চরিত্রনির্ভর টেক্সট, খণ্ড খণ্ড গল্পের একটি সিরিজ, যার মধ্যে সময়ের কিঞ্চিৎ নকশাধর্মিতা রয়েছে, এবং এক্ষেত্রে তার সবটুকু আমাদের সন্দর্ভে জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক নয়, তাই আমরা কেবল একটি বিশেষ অধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের আলোচনাকে অন্বিত করার চেষ্টা করব: সেটি হল 'কুম্ভীর-বিভ্রাট', দ্বিতীয় গল্পের অষ্টম পরিচ্ছেদ। সেখানে আমরা একটি অতিলৌকিক কুমীরের দেখা পাচ্ছি, যা অসম্ভব রকমের দীর্ঘ, আকারে-প্রকারে পৌরাণিকতাকেও ছাপিয়ে যায়। "অন্যান্য কুমীর জীবজন্তুকে ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু এ কুমীরটা আস্ত গরু, আস্ত মহিষ গিলিয়া ফেলিত। রাত্রিতে সে লোকের ঘরে ও গোয়ালে সিঁদ দিয়া মানুষ ও গরু-বাছুর লইয়া যাইত" (১৯৯৫ : ২৮৯)। সুতরাং যে-'কুমীর' আস্ত গরুমহিষ গিলে ফেলে, এমনকি রাতে লোকের ঘরে সিঁদ কেটে মানুষ অবধি নিয়ে যায়, তা আর যা-ই হোক, অন্তত 'কুমীর' নামক যে 'বাস্তব' প্রাণীটির সঙ্গে আমরা সাধারণভাবে পরিচিত, তার সঙ্গে মেলে না। তাহলে এখানে 'কুমীর' নামচিহ্নটির মধ্য দিয়ে যে অতিলৌকিক রূপকল্পটি আমাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হচ্ছে, তাকে আমরা কীভাবে দেখব? আমরা একে তাৎপর্যহীন 'আজগুবি গপ্পো' হিসেবে দেখতে পারি, অথবা এর

ভিতর অনুসন্ধান করতে পারি 'ম্যাজিক রিয়্যালিজম'-এর তত্ত্ব; আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম যে, 'ম্যাজিক রিয়্যালিজম' মূলত 'রূপকের বাস্তবতা', অর্থাৎ রূপক-প্রতিমার চিহ্নায়ন। তেমন এখানেও, বার্ত-কথিত চিহ্নের দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে, আমরা কোন্ বিশেষ চিহ্নায়িতের মুখোমুখি হব? গল্পে আমরা দেখি যে, সেই কুমীর একটি নৌকা ডুবিয়ে আরোহীদের একেবারেই গিলে ফেলে, যাদের মধ্যে একজন কলকাতা-থেকে-আসা এক 'ভদ্রলোক' ও তার স্ত্রীও ছিলেন। এবং তারপর পৃথকভাবে এক সাঁওতালনীকেও গিলে নেয়, বেগুনের ঝুড়িসমেত। অবশেষে যখন কুমীরটিকে মারা হয় ও তার পেট কেটে ফেলা হয়, সেখানে আমাদের লক্ষ করার মতো বিষয় এই যে, উক্ত পূর্বদেশীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি অর্থাৎ কুমীর তাদেরকে পুরোপুরি হজম করে নিয়েছে; অথচ সেই বেগুন-বেচা সাঁওতালনী অক্ষতশরীরে বিরাজমান। এখানে আমাদের ভাবতে হয়: এ এমন কী পাচনতন্ত্র, যা ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের হজম করতে পারলেও, এক সাঁওতাল নারীকে হজম করতে অর্থাৎ নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করে নিতে পারল না? 'ভদ্রলোক' বা 'ভদ্রমহিলা' বললে আমরা প্রায় পৌঁছে যাই 'ভদ্রলোকের সংস্কৃতি'-র কাছে, যা তৎকালীন শিক্ষিত (বা সম্ভ্রান্ত) মধ্যবিত্ত শ্রেণীবৃত্তকে চিহ্নিত করে, যে-শ্রেণী মূলত বণিকতন্ত্রী বুর্জোয়া সামাজ ও সংস্কৃতির নির্মাণ; আর সাঁওতাল নারীটি মূলত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। যে পাচন-প্রক্রিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে গ্রাস করে সম্পূর্ণরূপে আত্তীকরণ করে ফেলে, অথচ আদিবাসী সত্তাকে সাময়িক গ্রাস করলেও বিন্দুমাত্র আত্তীকরণ করতে পারে না, তার সাংস্কৃতিক নিহিতার্থ খুঁজতে গেলে উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিকতার ভাবকল্প আমাদের চোখের সামনে আভাসিত হয়। উপনিবেশের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বরূপটিকে আমরা অন্বিত করে নিতে পারি এই গল্পের সঙ্গে। দামী গয়না, যা 'ভদ্রমহিলা' তথা এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহিণীর হয়ে-ওঠার বিশেষ চিহ্নায়ক, তার হাতবদল ঘটে সাঁওতাল নারী অবধি। কিন্তু সেই সাঁওতাল নারী শেষ অবধি তথাকথিত ভদ্রমহিলায় রূপান্তরিত হয়নি, চ্যুত হয়নি নিজের জীবিকাধর্ম থেকে, তার পরেও তাকে বেগুন বেচতে দেখা যায়। যদিও প্রাপ্ত 'সমুদয় গহনা' সাঁওতালগণ কীভাবে ব্যবহার করেছিল তার স্পষ্ট উত্তর নেই; কেবল দিনকয়েক শূকর মেরে ও মদ খেয়ে তাদের

‘আমোদ-প্রমোদ’ করার কথা আছে, তাও তা ডমরুধরের দৃষ্টিকোণ থেকে। সেইসঙ্গে আরও লক্ষণীয়, সেই কুমীরের ‘উদর’ ডমরুধরের ‘দালানটির মতো’। আগেই বলেছি, ডমরুধর চরিত্রটি ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি; সুতরাং তার দালান অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের দালানের সঙ্গে তুলনীয় যদি হয় ঔপনিবেশিকতার আগ্রাসন, তবে কোথাও যে এক সাদৃশ্যমূলক ভিতর-সংযোগ রয়েছে দুয়ের মধ্যে, তা স্বীকার করতেই হয়। যা-হোক, আবার আমরা ফিরে আসি *কঙ্কাবতী* উপন্যাসটির কাছে, সতীদাহ-প্রসঙ্গ, বিধবাবিবাহ-প্রসঙ্গ, তনু রায় ও তার পুত্র ও তাদের কূটবুদ্ধির তাৎপর্যের ভিতর; তাহলে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, তৎকালীন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই চিত্রণ কীভাবে প্রচলিত একমাত্রিক বাইনারির ধারণাকে ছাপিয়ে সময়ের এক বহুমাত্রিক পাঠ তৈরি করে।

পাশাপাশি আমরা ষাঁড়েশ্বরকেও দেখব। দেখব চরিত্রটি কীভাবে রক্ষণশীলতা ও তথাকথিত আধুনিকতার এক ঘৃণ্য আঁতাতকে চিহ্নিত করছে। সে একাধারে ‘হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের একজন চাঁই’, তার দালানে হরি-সংকীর্তন, তার বৈঠকখানায় বিধর্মী কর্তৃক পরিবেশিত ব্র্যান্ডি ও বিলিতি মাংসের আয়োজন, মা-র জন্য কেনা পাথরের শিবমূর্তি পকেটে রাখার জন্য সে দেবতায় খেতুর ভক্তির প্রতি কটাক্ষ করে, আবার পাদরী সাহেবের কাছে তা নিয়ে উপহাস করে খেতুকে ভীরু জালিয়াত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়। আবার বরফ খাওয়ার অভিযোগে খেতু ও খেতুর পরিবারকে একঘরে করেছিল যে গ্রাম্য রাজনৈতিক চক্র তার অন্যতম অবলম্বন হল খোদ ষাঁড়েশ্বর। বরফ, অর্থাৎ ‘যবনের জল’ খাওয়ার ‘অপরাধে’ ক্ষেত্রচন্দ্রকে তার পরিবার সমেত একঘরে করা হয়; অথচ খেতুকে একঘরে করতে পারার সেই সাফল্য উদ্‌যাপনের জন্য ষাঁড়েশ্বর চার বোতল মহুয়ার মদের বন্দোবস্ত করে ও তারিফ শেখের বাড়ি থেকে চুপি চুপি মুরগি রাঁধিয়ে আনে (লক্ষণীয়, ষাঁড়েশ্বর যে মদ-মুরগি খায়, সেকথা বলার জন্য নিরঞ্জনের নামে মানহানির মামলা করার হুমকি দিয়েছিল ষাঁড়েশ্বর)— এখানে বলা প্রয়োজন, ‘যবন’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক না কেন, ‘যবন’ বলতে হিন্দুরা সাধারণভাবে বর্বর মাংসাহারী অ-হিন্দু জাতিই বোঝে: সেক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রস্তুত করা বরফ খেলে যদি হিন্দুর জাত যায়, মুসলমানের প্রস্তুত করা (বা

পরিবেশন করা) মাংস খেলেও হিন্দুর জাত যাবে, এবং এ-বিষয়ে ষাঁড়েশ্বর কিছুমাত্র অজ্ঞাত নয়, তাই তাকে তারিফ শেখের বাড়ি থেকে মুরগি 'চুপি চুপি' রাঁধিয়ে আনতে হয়। সেইসঙ্গে নিরঞ্জনের বাড়িতেও যে 'ক্রমাগত প্রতি রাত্রিতে... ঢিল ও গোহাড় পড়িতে লাগিল', তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়তো খুব একটা ভুল হবে না যে, ষাঁড়েশ্বর নিয়মিত গোমাংসও ভক্ষণ করত, তা না হলে হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামেগঞ্জে প্রতিরাতে গো-হাড়ের যোগান নিছক ভাগাড় থেকে আসা সম্ভব নয়। এখানে ধর্মতত্ত্ব ন্যায়নীতি ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিত প্রভৃতি প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার লক্ষ্যমুখ নয়[২], বরং এখানে ষাঁড়েশ্বরস্থানীয় ব্যক্তিদের ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতাটুকুই লক্ষ করার বিষয়। এই চক্রের আরেকজন সমাজপ্রভু গোবর্ধন শিরোমণিকে আমরা দেখব 'ব্রহ্মহত্যা'র সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকতে, উৎকোচ/উপঢৌকন হিসেবে পাওয়া ডাকাতির ধন একজোড়া ভালো গরদের কাপড় পরে কন্দর্পকান্তি হয়ে উঠতে, এমনকি সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড যার দ্বারা সুসম্পন্ন হয় সেই কমল ভট্টাচার্যও স্বয়ং ব্রাহ্মণ, আবার এই খুন ও ডাকাতির আরেক প্রত্যক্ষ অংশীদার গদাধরই পরবর্তীতে সাক্ষ্য দেয় খেতুর বরফ খাওয়া নিয়ে। এই সূত্রে তপোধীরবাবু লেখেন— "এদের ঘৃণ্য অমানবিকতার যে-বীভৎস ছবি (১:১২: ষাঁড়েশ্বর, ১:১৩: বিড়ম্বনা, ১:১৪: গদাধর-সংবাদ) ত্রৈলোক্যনাথ কঠোর ব্যঙ্গময় ভাষায় এঁকেছেন, তাতে 'কঙ্কাবতী'র আখ্যানে চিত্রিত ভূতের সমাজতত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।" (১৯৯৬ : ৮৭) ভূত তো বটেই, পাশাপাশি নদীবক্ষে জীবন্ত পাথর ও পথে 'কুটা' হয়ে পড়ে-থাকা ডাইনির সমাজতত্ত্বও যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেইসব জনার্দন-শিরোমণি-ষাঁড়েশ্বর-কমল-গদাধরদের উপস্থাপনে। আমাদের দেখার বিষয়: একটি গ্রামীণ ব্যবস্থা কীভাবে প্রতিটি চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ও পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থের লোভে অতিবৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরির সঙ্গে নিজের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিতে চায় তনু রায়; সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির দম্ভে শেষ বয়সে পৌঁছেও তরুণী স্ত্রী লাভের মোহ ছাড়তে পারে না জনার্দন চৌধুরি; নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় গ্রামীণ ক্ষমতাবলয়ের কেন্দ্রে অবস্থান করতে-চাওয়া গোবর্ধন শিরোমণি, ষাঁড়েশ্বর বা অন্যান্য পারিষদেরা এই সিদ্ধান্তকে নির্লজ্জ সমর্থন করে; খেতু কঙ্কাবতীকে ভালোবাসে ('ভালোবাসা' বিমূর্ত ধারণা, আসলে সে কঙ্কাবতীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চায়,

কঙ্কাবতীও), তাই সে জনার্দন চৌধুরিকে তার বিয়ের সিদ্ধান্ত থেকে নিরত হওয়ার অনুরোধ জানায়; এই নিয়ে কথাকাটাকাটি হলে খেতুর অপ্রিয় সত্যভাষণে জনার্দন ও তার স্তাবকদের রোষ গিয়ে পড়ে খেতুর ওপর, এবং মিথ্যা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে খেতুর পরিবারকে একঘরে হতে হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াই এক সুতোয় গাঁথা— বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষের নিছক বদমায়েশিমাত্র নয়। যারা এই ক্ষমতাবলয়ের বাইরে অবস্থান করে, যারা সব কিছুর সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে সার্বিক শোষণপ্রক্রিয়াকে ক্রমাগত তোষণ করে চলতে পারে না, সেই 'অপর' মানুষদের এভাবেই প্রচলিত সমাজ-কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তাই খেতুকে একঘরে ও নিরঞ্জনকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তাই কঙ্কাবতীকে সইতে হয় অশেষ ভোগান্তির পালা।

এরপর আমরা দেখি, জ্বরপীড়িত কঙ্কাবতী (স্বপ্নের ভিতর) তার 'পিপাসা' ও 'গায়ের জ্বালা' জুড়োতে নদীর ঘাটে যায়— এখানেই কাহিনিটি মূলত অন্বিত হয়ে যায় লোককথার উল্লিখিত প্রাচীন গল্পটির সঙ্গে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, জল বা পুষ্করিণীর সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের এক সাংস্কৃতিক সংযোগ রয়েছে। সুজিৎ চৌধুরী তাঁর *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* বইতে এ-বিষয়ে গুণগ্রাহী আলোচনা করেছেন। সাবিত্রী-সত্যবান, কার্তিকেয়, বৃহন্নলা, পরশুরাম, রেণুকা, যক্ষিণী, অপ্সরা, উর্বশী, দেবদাসী, নারী-পুরোহিত প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনাসূত্রে তিনি দেখিয়েছেন, জল ও জলাশয়ের সঙ্গে (আনুষঙ্গিকভাবে শস্যের সঙ্গেও, যে-সূত্রটুকু এক্ষেত্রে যদিও অপ্রাসঙ্গিক) মাতৃতান্ত্রিক সমাজের স্বক্ষমতার প্রত্নস্মৃতিটুকু কীভাবে ওতপ্রোত হয়ে আছে (২০১৬)। এখানে কঙ্কাবতীও যে মূলত সেইসকল মাতৃকাদেবী ও নারী-পুরোহিতদের সমকক্ষ বা উত্তরাধিকার, এমন সরলীকৃত একমাত্রিক দাবি আমরা করছি না, কিন্তু অসহায়তার চূড়ান্ত পর্যায়ে এক নারী তার শেষতম আশ্রয় হিসেবে 'জল'কে বেছে নিচ্ছে (এবং এই বেছে-নেওয়াটুকু যেখানে দ্বিপাক্ষিক), এই চিহ্নের মূল ইঙ্গিতটুকু ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের অনেকটাই গভীরে প্রবিষ্ট বলে মনে হয়; এবং যেহেতু শুরুতেই এক বিশেষ 'প্রাচীনকথা'-র উল্লেখ আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই অনুমানগুলিকে নিছক কষ্টকল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। পাশাপাশি এর সঙ্গে সম্পর্কিত, কঙ্কাবতীকে জলচর জীবজন্তুদের 'রানী' বানানোর প্রসঙ্গটিও আমাদের

বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। জলচর জীবজন্তুদের গণতান্ত্রিক সভায় কঙ্কাবতীকে তাদের রানি করার সিদ্ধান্ত হয়। রানি হিসেবে কঙ্কাবতীর ভূমিকা কী হবে, তা আমরা মাছেদের কথায় জানতে পারি: বঁড়শি দিয়ে কেউ মাছেদের গাঁথলে কঙ্কাবতী সুতো ছিঁড়ে দেবেন বা জেলেরা জাল ফেললে কঙ্কাবতী ছুরি দিয়ে তা কেটে দেবেন। সুতরাং বঁড়শি-ফেলা মানুষদের বিরুদ্ধে, জাল-ফেলা জেলেদের প্রতাপের বিরুদ্ধে কঙ্কাবতীকে মাছেরা পেতে চায় প্রতিস্পর্ধী সুরক্ষাশক্তি (protecting counter force) হিসেবে। এখানে শোষিত সম্প্রদায়ের রানিরূপে কঙ্কাবতীর এক বিশেষ গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অপরপ্রান্তে শোষকশক্তি হিসেবে উপস্থাপিত জেলেরা বা বঁড়শিধারী মানুষেরা, প্রতিসরণমূলক রূপকের ব্যঞ্জনায়, কোথাও যেন-বা পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে অন্বিত হয়ে যায়।

তবু এই অন্বয় বা অনন্বয়, বিপ্রতীপ জোড় তথা শোষক-শোষিতের দ্বান্দ্বিক দ্বৈততাকে একমাত্রিকভাবে উপস্থাপন করে না। স্বাভাবিক সংগ্রামী চেতনার সরলীকৃত রূপটির বহুস্তর গভীরে ক্রিয়াশীল থাকে সূক্ষ্মতর বিভিন্ন রাজনৈতিক সূত্র ও সমীকরণ। কঙ্কাবতীকে 'রানী' করার প্রস্তাব প্রথম যার মুখ থেকে আমরা পাই, সে হল 'চতুর বাটা মাছ'; এখানে প্রশ্ন জাগে: বাটা মাছটি 'চতুর' কেন? বা উল্টোদিক থেকে বললে, মাছেদের মধ্যে যে মাছটি 'চতুর', তার থেকেই কেন আমরা কঙ্কাবতীকে রানি করার প্রস্তাবটুকু পেলাম? কেন তা সাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত দাবি হিসেবে অন্য কোনো গড়বুদ্ধিসম্পন্ন মাছের মস্তিষ্ক থেকে উঠে এল না? বস্তুত, প্রস্তাবকারী বাটা মাছের চতুরত্বের প্রতি এই নিহিত ইঙ্গিতটুকু, কঙ্কাবতীর দেহের জ্বালা ও পিপাসার প্রতি মাছেদের সহমর্মিতার পাশাপাশি, মাছেদেরই চোখে কঙ্কাবতীর সম্ভাবনাময় সামর্থ্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য মাছেদের গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার পরিসরকে চিহ্নিত করে। কারণ চতুরতার মধ্যে বুদ্ধির যে কূটনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তা কার্যকারণ সূত্রের বস্তুগত সমীকরণের উপর নির্ভরশীল। মনে রাখতে হবে, উক্ত বাটা মাছটির 'চতুর' বিশেষণও আবার কঙ্কাবতীর দৃষ্টিভঙ্গিকে বহন করছে, যেহেতু এই ঘটনা ও তথ্য আসলে তারই স্বপ্নদৃশ্যের অংশ।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে শোষক-শোষিতজনের সম্ভাব্য যুদ্ধপরিস্থিতির চালচিত্র আকারে কোনো ইচ্ছাপূরণের রোম্যান্টিক বিপ্লবগাথা উপস্থাপিত হয়নি। ফলে এক্ষেত্রেও পাঠকের সরল গল্পপিপাসা সেভাবে পূরিত হয় না। লেখক (কার্যত লিখন) অবগাহন করেন সমাজতত্ত্বের গভীরে। প্রান্তিক জনমানসের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক (যা প্রকারান্তরে রাজনৈতিকও বটে) সীমাবদ্ধতাগুলিও সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত হতে থাকে। একজায়গায় আমরা দেখি, জীবজন্তুদের গণতান্ত্রিক সভায় "তপস্বী মাছের দাড়ি আছে দেখিয়া সকলে তাহাকে সভাপতিরূপে বরণ করিলেন"— সুতরাং জাল অথবা বঁড়শির প্রতাপের বিপরীতে শোষিত সম্প্রদায়ের রূপকল্প হিসেবে আমরা যাদের দেখতে চাইছি, তাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও যথেষ্ট স্বচ্ছতা ও গভীরতার অভাব থেকে যাচ্ছে : 'তপস্বী' (তোপসে?) মাছের ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য ও বিচক্ষণতার নির্দেশক হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে তার একটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য (দাড়ি)— সভাপতিত্বের প্রকৃত যোগ্যতা যথার্থ উপায়ে পর্যালোচিত হচ্ছে না। এই সামাজিক প্রবণতাই একটি সম্প্রদায়কে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রবণতার দিকে নিয়ে যায় যা বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার ওপর তার যাবতীয় শক্তি ও সম্ভাবনা ক্ষয় করে ফেলে। এখানেও আমরা দেখি, যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কঙ্কাবতীকে রানি করতে চাওয়া হয়েছিল তার চেয়েও যেন বড়ো হয়ে ওঠে কঙ্কাবতীর জন্য রাজপোশাক ও রাজমহল বানানোর উদ্যোগ। কঙ্কাবতীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিশেষ তোয়াক্কা না করেই জলজগতের প্রাণীগণের প্রতিনিধি 'কাঁকড়াচন্দ্র' ('কাঁকড়ামহাশয়') কঙ্কাবতীকে নিয়ে চলে (বা, চলেন) দরজির কাছে। কাঁকড়ার অলীক নাকের মিথ্যে অহং (পরবর্তীতে আমরা দেখব, 'ব্যাঙ-সাহেব'ও অনুরূপ ভ্রান্তভাবে অভিমানী নিজের নাক-প্রসঙ্গে তথা উন্নাসিকতার অস্বীকৃতি বিষয়ে) তার পোশাকি মুরুব্বিয়ানার অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রায় প্রহসনের আকারে ব্যঞ্জিত করে। সে কঙ্কাবতীর প্রতি স্নেহশীল হলেও কঙ্কাবতীকে 'ছেলেমানুষ' হিসেবে গৌণ করে রাখতে চায়। দরজিও পোশাক-বুননের সুবিধার্থে কঙ্কাবতীকে 'শিমুল তুলা' রূপেই দেখতে চায়। কাঁকড়া কিংবা দরজির ওপর ব্যক্তিক দোষারোপ নয়, আমরা আসলে শোষিত সমাজবৃত্তের সেই ব্যবস্থাপনার দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই, যা নারীকে 'রানী'-র আসনে বসালেও তাকে 'ছেলেমানুষ' ও 'শিমুল তুলা' হিসেবেই গণ্য করতে চায়। কিন্তু কঙ্কাবতী নরম শিমুলতুলো হয়ে খেরোর খোল প'রে

‘বালিশ’ হিসেবে ব্যবহৃত হতে চায়নি। যেহেতু এটি কঙ্কাবতীর স্বপ্নের মধ্যকার ঘটনা, তার গহন চেতনা এখানে প্রতিফলিত, তাই তার আত্মমর্যাদা তাকে দৃশ্যত ‘রানী’ কিন্তু কার্যত ‘বালিশ’ হয়ে থাকতে অনুমতি দেয় না। তাই সে বাধা দেয়, টুঁ শব্দটুকু অন্তত করে। এবং যেহেতু, তার অভিজ্ঞতার জগৎ তার স্বপ্নেও প্রতিবিম্বিত, তার চেনা পৃথিবীর চেনা পুরুষতান্ত্রিকতার ছায়া তার প্রতিকল্প স্বপ্নের জগতেও ছড়িয়ে পড়ে। খলিফার কাছ থেকে প্রস্তুত-করা নানারত্নখচিত মহামূল্যবান রাজপরিচ্ছদ তাকে পরানো হয়, ‘সুসজ্জিত অলংকৃত মনোমোহিত অট্টালিকা’ মোতিমহলে (অর্থাৎ ঝিনুকের ভিতর) তার স্থান হয়। স্রেফ পোশাকের জন্যই ব্যয় দুই তোড়া মোহর, যা হতদরিদ্রা কঙ্কাবতীর কাছে একপ্রকার অপচয় মনে হয়েছিল। সুতরাং আমরা দেখলাম, কঙ্কাবতীর উক্ত বিকল্প দুনিয়াতেও আয়োজন ও আড়ম্বরের ঘোর নেহাত কম কিছু নয়। তবু সেখানে তার আত্মশক্তির খোঁজ, তার আত্মচেতনার দ্যোতনাটুকু আমাদের বাড়তি পাওনা হিসেবে রয়ে যায়।

সুতরাং আলোচ্য আখ্যানের বিশেষ চিহ্নায়ক-প্রকরণ কীভাবে ছোটো ছোটো নানা ব্যঞ্জনায় তার তাৎপর্যকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তা আমরা অনুধাবন করতে পারছি। খিড়কি পুকুর, নৌকা, বাটা মাছ, তোপসে মাছ, কাঁকড়া, ঝিনুক, শিমুলতুলো, শিকড়, বাঘ, জীবন্ত পাথর, এমনকি পথের খড়কুটো অবধি নিজ নিজ রূপকার্থ উন্মোচন করছে। তপোধীর ভট্টাচার্যের অসামান্য বিশ্লেষণে (২০০৯ : ৮৯) আমরা পাই:

> যেন মানুষের অবয়বে অতিব্যক্ত পাশবিকতার প্রতি তর্জনী-সংকেত করার জন্যে হাসির আড়ালে জীবনের মর্মসত্য (‘প্রতিটি সত্তাই সহযোগী সত্তা’ : বাখতিন) প্রকাশ করেছে জন্তু-সরীসৃপ-কীট-পতঙ্গ-ভূত-পেত্নীর ছদ্মবেশধারী কুশীলবেরা।... বাখতিন-কথিত বিপ্রতীপায়নের অসামান্য দৃষ্টান্ত পাচ্ছি ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিবেদনে। মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর (এবং, বাস্তব ও প্রকল্পনার) এমন পারস্পরিক ভূমিকা-বদল কার্নিভালের সৃষ্টিশীল সম্ভাবনারই প্রমাণ।

এই ‘সৃষ্টিশীল সম্ভাবনার’ আরও কিছু প্রমাণ মজুত, যেগুলো আমরা কেবল অতি সংক্ষেপে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। যেমন মিস্টার গামিশ (‘ব্যাঙসাহেব’) চরিত্রটি পাশ্চাত্যের পোশাকি অনুকরণপ্রয়াসী এ-দেশীয় ব্যক্তিদের রূপকায়িত করছে। তার

মিথ্যে উন্নাসিকতার দ্বন্দ্ব-সংশয়, ইংরেজি বুলি থেকে কথ্য 'নেটিভ' ভাষায় ফিরে আসা, তার সূক্ষ্ম হিসেবি কার্পণ্যপ্রসূত শোকবেদনা (আধুলির ঋণশোধ-প্রসঙ্গ) তার অক্ষম প্রচেষ্টার অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করে (যদিও পরবর্তীতে কঙ্কাবতীকে সহায়তা করা ও তাকে সহমরণ থেকে নিরত করার উদার প্রগতিশীল প্রকল্পে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে উপন্যাসে তার চারিত্রিক উত্তরণও কিছুটা ঘটে)। এই একই সংকটে তাড়িত 'ভূত কোম্পানি'। দেশীয় উপাদানগুলির প্রতি যথেষ্ট আস্থা জ্ঞাপন না করা বা সেগুলোকে যথাযথ মর্যাদা না দেওয়া, ও পক্ষান্তরে ইউরোপীয় উপাদানগুলির প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও বাড়তি গুরুত্ব প্রদান করা, ঔপনিবেশিক বাংলার এক বিশেষ যুগধর্ম। এইপ্রসঙ্গে নরমুণ্ডের বিবিধ ক্ষোভ ও খেদোক্তি বিশেষ আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য উন্মোচন করে। উপযুক্ত সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় তাই বাঙালি ভূত যে কোম্পানি খোলে তার নাম রাখা হয় 'স্কল স্কেলিটন অ্যান্ড কোং'— কার্যত এই একই নিরাপত্তাহীনতা 'ব্যাঙমশাই'-কেও চালিত করেছিল স্বঘোষিত 'ব্যাঙসাহেব' হয়ে ওঠায়। এছাড়া আকাশে তালপাতার 'দুর্দান্ত সিপাহী'-র দেখা মেলে, যা সমসাময়িক (লেখনকালের, বিনির্মাণে পঠনকালেরও) বস্তুজগতের যাবতীয় অসৎ ভীরু আপাত-প্রভাবশালী কনস্টেবল বা পুলিশি পদসত্তার রূপকল্প হাজির করে। এইসকল তাৎপর্য যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও সংশয়লেশহীন, এবং সাম্প্রতিককালে আলোচিতও হয়েছে যথেষ্ট, তাই আমরা এগুলির প্রসঙ্গে বিশেষ চর্বিতচর্বণের মধ্যে যাচ্ছি না। আমরা কেবল 'মশাপ্রভু'দের বিষয়ে আর সামান্য কয়েকটি কথা বলে আমাদের এই উপন্যাসের আলোচনাকে আপাতত গুটিয়ে আনার চেষ্টা করব। ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস তাঁর বইতে (২০১২ : ৩৪-৩৫, ৭৪) 'মশাপ্রভু' রূপকের আড়ালে মূলত 'ইংরেজ প্রভুদের' আদল খুঁজে পেয়েছেন। মশাদের সভায় মোটমাট যে-সিদ্ধান্তটি হয়, অর্থাৎ এই যে, "কলিকালে ভারতবাসিগণ চক্ষে ঠুলি দিয়া হাত জোড় করিয়া অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া থাকিবে। আর পৃথিবীর যাবতীয় মশা আসিয়া তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিবে" (মুখোপাধ্যায়: ২০০৯: ১৫৫), সেখানে 'মশা' চিহ্নায়কটি আসলে শোষণকারী যে-কোনো ঔপনিবেশিক শক্তিকেই রূপকান্বিত করে; আমাদের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে যেহেতু সেই শক্তি ইংরেজ রাজশক্তি, প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক হিসেবে 'ইংরেজ প্রভুদের' কথা

আমরা বলতে পারি। কিন্তু এই রূপকার্থ গাণিতিকভাবে একমাত্রিক নয়, তার অতিরিক্ত আরেক মাত্রাযোগ আছে। আমরা দেখি, রক্তবতীর পিতা দীর্ঘশুণ্ড নামক মশাটি কঙ্কাবতীকে বলে, "...আমি তোমাকে কিনিয়া লইবার বাসনা করি। আমার তালুকে অনেক মানুষ আছে। মানুষের অভাব নাই। আমার সম্পত্তি নরনারীগণের দেহে যে রক্ত আছে তাহাই খায় কে?" (১৫২); লক্ষণীয় 'তালুক' শব্দটি এখানে জমিদারতন্ত্রের অনুষঙ্গ বহন করে আনে, সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে বুর্জোয়া আমলাতন্ত্রের একপ্রকার আঁতাত যে-পরিসরে লক্ষ করা যেত। কঙ্কাবতীকে 'কিনিয়া লইবার' প্রসঙ্গে অচিন্ত্যবাবু লেখেন:

> লক্ষণীয় হল উদ্ধৃত অংশে মশার আড়ালে কেবলমাত্র ইংরেজ প্রভুদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত (!) হয়নি, তৎকালীন সমাজে নারীর অপমানজনক অবস্থাটি আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেছে। বাস্তবে জনার্দন যা চেয়েছে পরাবাস্তবে কঙ্কাবতীকে কিনে নিতে চেয়ে মশা সেই একই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। (৩৪)

যদিও মশা যে অন্তত এক্ষেত্রে একই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেনি, তা আমরা উপন্যাসপাঠে দেখি; কিন্তু জনার্দন যে কঙ্কাবতীকে একপ্রকার কিনতেই চেয়েছিল, তা নিয়ে কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। বস্তুত পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী যে কোনো-না-কোনো পুরুষের 'সম্পত্তি' ('পিতা', 'পতি', 'পুত্র' প্রভৃতি এই মালিকানা-স্বত্বের একক), এবং সেই সম্পত্তির মালিকানা যেভাবে একটি সামন্ততান্ত্রিক পরিসরে হস্তান্তরিত হয়ে চলেছে নারীর নিজস্ব মতামতকে গ্রহণ না করেই, সেই আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়াটুকু এই উপন্যাসে শ্লেষ আকারে ব্যঞ্জিত হয়। একটু আগেই যে আমরা *ডমরু-চরিত*-এর সেই কুমীর-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম, সেখানেও বুর্জোয়া উপনিবেশবাদ ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের এক বিশেষ অন্বয় আমরা লক্ষ করেছি। সেই বিশেষ অন্বয়, মশাপ্রভুদের নিহিতার্থের ক্ষেত্রেও, আমরা দেখি, একমাত্রিকতাকে অতিক্রম করে চলেছে। তাই খর্বুরের প্রশ্নের উত্তরে যখন মশার ঘোষণা শুনি— "সকলকে অন্ধকূপ খনন করিতে হইবে, চক্ষে ঠুলি দিয়া সকলকে সেই অন্ধকূপে বসিয়া থাকিতে হইবে। অন্ধকূপ হইতে বাহির হইলে, কি চক্ষুর ঠুলিটি খুলিলে পাপ হইবে, জাতি যাইবে, আর 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হইবে।" (১৬০)— তখন সেখানেও ক্ষমতার একাধিক প্রেক্ষিত ও স্বর

মিলেমিশে থাকে। কারণ সকলকে অন্ধকূপ খনন করতে হবে ও চোখে ঠুলি দিয়ে তার ভিতর বসে থাকতে হবে— এই হুকুম যদি ঔপনিবেশিক শক্তির স্বরকে হাজির করেও থাকে; তবু 'জাতি যাইবে'— এই হুমকি (threat) তথা ভীতিপ্রদর্শন স্বভাবতই উচ্চবর্ণ সমাজপ্রভুদের (যারা আবার সামন্ততান্ত্রিক বৃত্তের আশ্রয়ে সুরক্ষিত) স্বরকে স্মরণ করায়। তাই এই 'একঘরে' হয়ে যাওয়া, একদিকে যেমন গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতাবলয় থেকে নিরঞ্জন ও খেতুর (পরোক্ষে কঙ্কাবতীরও) 'একঘরে' হয়ে যাওয়া বোঝায়, আবার অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মর্যাদাবৃত্ত থেকে দেশীয় লোকায়ত ঐতিহ্যের অপসারণকেও (এমনকি ত্রৈলোক্যনাথ ও তাঁর গল্প-উপন্যাসের নির্বাসনকেও, এভাবেও ভাবতে পারি, যেহেতু তৎকালীন কথাসাহিত্যে ইউরোপীয় ধারার অন্ধ অনুকরণ প্রায় এক অন্ধকূপই নির্মাণ করেছিল) ইঙ্গিত করে। তবে এইসব টাইপ-চরিত্র সারাক্ষণ নির্দিষ্টভাবে একক চিহ্নায়িতের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকেনি; উপন্যাসের যাত্রাপথে, কার্নিভালের ভিতর, প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হয়েছে।

সুতরাং সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, চিহ্নায়ক-প্রকরণে রূপকের প্রয়োগকে অবলম্বন করার ফলে কত সহজেই সময়ের বহুমাত্রিক বয়ান উঠে আসছে, যার ভিতর একীভূত আধিপত্যের রাজনীতির প্রতিস্পর্ধী বিকল্পপাঠ গড়ে ওঠা সম্ভবপর হচ্ছে। পরিবর্তে লেখক যদি ঔপনিবেশিকতার নিয়ন্ত্রণ মেনে তথাকথিত নির্জলা বাস্তব আখ্যান লেখার চেষ্টা করতেন, রূপকচিহ্নের বিমূর্ততা বর্জন করে গতানুগতিক মূর্ত কাহিনি রচনায় মনোনিবেশ করতেন, তা মূলত ক্ষমতার বৃত্তগুলিকেই পরোক্ষে পুষ্টতা দিত, এবং তা শত প্রয়াস সত্ত্বেও সর্বার্থে (বণিকতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পুরুষতন্ত্রের বিপরীতে) কোনো জোরালো প্রতিস্রোত তৈরি করতে হয়তো শেষমেশ ব্যর্থই হত।

উল্লেখপঞ্জি:

১. নব্য-মার্ক্সবাদ মার্ক্সবাদী চিন্তারই একটি অধুনা বিশেষ ঘরানা, এই ধরনের সমালোচনাক্ষেত্রে সেইসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়, ধ্রুপদী মার্ক্সবাদের সীমায় যেসবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দুরূহ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে

ক্ষমতা ও রাজনীতির সূক্ষ্মতর জটিল আবর্ত কিংবা বয়ানের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাধর্মিতা কিংবা বিকল্প স্বর ও সম্ভাবনাগুলিকে পর্যালোচনার প্রশ্নে তা কার্যকরী হয়ে দেখা দেয়।

২. নইলে মুসলমান-পরিবেশিত মাংস বা কাটলেট ভক্ষণে খেতুর আপত্তিটুকুও যে নেহাত প্রশ্ন বা বিতর্কের ঊর্ধ্বে, তা বলা যায় না; হয়তো এও অস্বীকার করা যায় না যে, খেতুকে একটি আদর্শায়িত চরিত্র হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা প্রাথমিকভাবে উপন্যাস-লেখকের ছিল— ষাঁড়েশ্বরকে যেমন রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার নেতিবাচক মিশ্রণ হিসেবে দাখিল করা হয়েছে, ক্ষেত্রচন্দ্রও তেমনি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক ইতিবাচক মিশ্রণ হিসেবে উপস্থাপিত— কিন্তু কার্নিভালধর্মী টেক্সট যেহেতু লেখকের সচেতন হস্তক্ষেপ দ্বারা শেষ অবধি নিয়ন্ত্রিত হয় না, চরিত্ররা খুঁজে নেয় নিজস্ব দ্বিবাচনিক পরিসর, তাই খেতুর ভিতরেও এইরকম কিছু সূক্ষ্ম সীমাবদ্ধতা রয়েই যায়, যা আসলে সময় ও ব্যবস্থার নিজস্ব নির্মাণ।

৩.২. বস্তু ও ব্যঞ্জনার সমঝোতামূলক সহাবস্থান: রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরোত্তর

> তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথামুণ্ডু অর্থ কী আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয়তো কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে। (ঠাকুর: ১৪০৫: ১৬২)

শুভারম্ভটুকু আমরা করতে চাইছি রবীন্দ্র-গল্পেরই ('একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প') এই বিশেষ শ্লেষসিক্ত খেদোক্তিবাক্যের মধ্য দিয়ে; আসলে উপরোক্ত উদ্ধৃতিমধ্যে যে বিশেষ গল্পটির ('অতিক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর অত্যন্ত পুরাতন একটি গল্প') কথা বলা হচ্ছে তা হল একটি কাদাখোঁচা ও একটি কাঠঠোকরার গল্প। যদিও বিশেষ কোনো খণ্ডকাহিনি হিসেবে নয়, গল্পের আদলে আলোচ্য দুই পক্ষীজাতির নিত্যকালীন স্বাভাবিক ধর্মকেই প্রকাশ করা হয়েছে আবহমান বাস্তবের রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে। এবং এই দুই পাখি যে বিশেষ গোত্রের মানবচরিত্রকে রূপকান্বিত করছে, তা আজকের পাঠকের চোখে যথাপরিমাণ স্বচ্ছ; প্রতিতুলনায় কোকিল ও শ্যামা নাম্নী দুই গায়ক পাখির দ্যোতনাও অনুরূপভাবে আনুষঙ্গিক। এক্ষণে, এই চিহ্নায়নের লেখক-অভিপ্রেত তাৎপর্যটুকু অনুধাবনের জন্য আমাদের অবশ্যই গল্পের নিহিত ও পরিবেশগত প্রেক্ষিতের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। উল্লেখ্য যে, লোককথার আদলে ব্যক্ত এই ব্যঞ্জনাগহন অভিজ্ঞতার বার্তা, অর্থাৎ কাঠঠোকরা ও কাদাখোঁচার কথাটুকুই গল্পের সবটুকু নয়, তাকে ধারণ করে আছে প্রসঙ্গের প্রণিধানযোগ্য পাটাতন; যেখানে বসে কথক তথা গল্পলেখক তাঁর হতাশাবিহ্বল বেদনার ভাষ্য উপস্থাপন করছেন (যার মধ্য দিয়ে একইসাথে অদৃশ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সক্রিয় উপস্থিতিও ব্যঞ্জিত হচ্ছে)। সেইসকল খেদোক্তির মধ্যে অবশ্যই অভিমানের গূঢ় স্বর আমাদের অনুভবকে এড়িয়ে যায়নি। কারণ, আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় বিশেষ করে সেই মন্তব্যের অনুষঙ্গটিকে, যেখানে গল্পশ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কথক বলেন, "তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও ত্রুটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিছু আত্মগৌরবও অনুভব করিবারও চেষ্টা করিয়া থাক।" (ঐ) এই অনুযোগের মধ্যে নিহিত শ্রোতাদের চরিত্রাভাস যখন পরবর্তীতে উল্লিখিত 'গল্প'টির

কাদাখোঁচা ও কাঠঠোকরার জীবনচর্যাতেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, তখন শ্রোতাদের সঙ্গে উক্ত পক্ষীজাতির জরুরি ভাবসাদৃশ্যটুকু প্রকট হয়ে ওঠে (অবশ্যই শ্রোতা বলতে এখানে সর্বজনীন অর্থে নয়, নিন্দাবাদী বেরসিক সমালোচকরাই মূলত লেখকের এই উপমাতিক্ত বিক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু)। প্রথম অধ্যায়ে চিহ্নের বর্গীকরণের সময় আমরা এইরূপ অভ্যন্তরীণ ভাবসাদৃশ্যকেই রূপক-প্রতিমা (metaphor icon) বলে চিহ্নিত করেছিলাম; সেইসঙ্গে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আমরা এমনও মতপ্রকাশ করেছিলাম যে, প্রধানত জাদুবাস্তব হল এই রূপক-প্রতিমারই চিহ্নায়ন। এখানে তা পুনরুল্লেখের বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না, যদি না নিম্নোক্ত একটি যুক্তি পেশ করার জন্য তা অনিবার্য হত।

আমরা দেখি, উক্ত গল্পটি নিছক পেশ করেই গল্পকথক ক্ষান্ত হননি, ব্যবহৃত রূপকের অভিপ্রেত তাৎপর্য খানিক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করারও চেষ্টা করেছেন। অন্তর্নিহিত দ্যোতিতের কথা (connotation) সরাসরি ব্যক্ত করেননি ঠিকই, তবে দ্যোতকের গূঢ়ার্থ পাঠকের কাছে যথাসম্ভব বোধগম্য করে তুলতে চেয়েছেন সাদৃশ্যধর্মের বিশ্লেষণমূলক উপস্থাপনায়। সুতরাং রূপকচিহ্নের এই প্রায়োগিক ব্যাখ্যাটুকু স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দেখি, গল্পশ্রোতারা (অর্থাৎ পাঠকগণ) গল্পের 'মাথামুণ্ডু অর্থ' যে কিছু বুঝে উঠতে পারেনি সে-সম্বন্ধে একপ্রকার নিঃসংশয় হয়েই কথক তাদের বলেন যে তারা 'হয়তো কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে'। সুতরাং কথকের মতানুযায়ী আমাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ততখানি সমস্যা হয় না যে, উদ্দিষ্ট পাঠকমণ্ডলীর সাহিত্যবোধ নেহাতই নাবালকত্বের পর্যায়ে রয়ে গেছে, সাহিত্য-সমালোচনার পরিসরে তারা প্রত্যাশিত কোনো পরিণত-মনস্কতা অর্জন করতে পারেনি। অর্থাৎ বাচনের অভিধাগত অর্থের গভীরলোকে লুক্কায়িত ব্যঞ্জনামূলক তাৎপর্যের বয়ানকে অনুধাবন করার অক্ষমতাকে কথক এখানে অপরিণত-মনস্কতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে ধরছেন। এবং সেই মানদণ্ডের নিরিখে তৎকালীন পাঠককুলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যে সাবালক হয়ে উঠতে পারেনি, তা উক্ত মন্তব্যের অমসৃণ শ্লেষ থেকে স্পষ্ট হয়। প্রশ্ন হল, যে-উপমহাদেশ জাতক-পঞ্চতন্ত্র ও নানাবিধ লোককথা-উপকথার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে লালন করছে, সেই

সমাজ-সংস্কৃতিতে পাঠক এতখানি অপারগ কীভাবে হতে পারে যে তারা ভাবার্থের রূপকভাষ্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়? এর পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে আমরা দায়ী করেছিলাম (দ্র. অধ্যায় ৩.১) বুর্জোয়া-ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক চিহ্নচেতনার আগ্রাসনমূলক কাঠামোটিকে (প্রসঙ্গত আমরা 'লুল্লু' গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গোক্তি ও সে-বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাটুকু আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাইব)। এখানে রবীন্দ্রনাথেরও অহিংস বিষোদ্গার মূলত ওইসকল বুর্জোয়া পাঠককুলের উদ্দেশ্যেই, বলা যায়। আখ্যান-পরিবেশনের পাশ্চাত্য মডেলের প্রতি তৎকালীন মধ্যবিত্ত পাঠকের মূঢ় আসক্তিমূলক যান্ত্রিকতা কোথাও কি তবে রবীন্দ্রনাথকেও পীড়িত করেছিল? তাহলে, পক্ষান্তরে, *কঙ্কাবতী* উপন্যাসের রূপকের ভাষা ও ব্যঙ্গাত্মক জাদুবাস্তবকে তিনি কেন সাবালকত্বের স্বীকৃতি দিলেন না— প্রশংসা (স্তুতি) করেও কেবল কেন শিশুমনোরঞ্জনমূলক কাহিনি (যদিও শিশুর পিতামাতার 'মনোরঞ্জন' করার বিষয়টিও সেইসঙ্গে সৌজন্যবশত জুড়ে দেওয়া হয়েছে) হিসেবেই আখ্যানটিকে দেখলেন? সুতরাং আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ নিজেই যথেষ্ট দ্বিখণ্ডিত ছিলেন নিজের সাহিত্যরুচিগত ঝোঁক বা প্রবণতার বিষয়ে; পাঠক হিসেবে তাঁর নিজেরও যেন-বা একপ্রকার অবস্থানগত দোলাচল ছিল। অর্থাৎ একদিকে তিনি গল্প-উপন্যাসের রেনেসাঁ-প্রসূত বাচনপ্রণালীর প্রতি সম্পূর্ণ কায়মনোবাক্যে সমর্পিত হতে চাননি, আবার একইসাথে দেশীয় লোকায়ত ভঙ্গির সমর্থনে জোরালো প্রতিস্পর্ধী ধারার বিকাশেও উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয় হতে পারেননি (অবশ্য তাঁর সাহিত্যিক মানসলোকের এই অপূর্ব দ্বান্দ্বিকতার ফলাফল যে ভাবীকালের পক্ষে ততখানি অশুভ হয়নি, সে-আলোচনায় আমরা পরে আসছি)।

তাঁর বহু লেখাতেই রবীন্দ্রনাথ রূপকের ব্যঞ্জনাশক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন দেশকাল তথা সমাজমানসের ত্রুটিগুলিকে কটাক্ষ করার ক্ষেত্রে। তাঁর *সে* (১৯৩৭) নামক রচনাটিতে আমরা দেখি বস্তুত একই প্রবণতার ছাপ। আপাতদৃষ্টিতে একটি শিশুর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই গড়ে-তোলা একটি কাল্পনিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে অদ্ভুত সব খাপছাড়া ঘটনাপুঞ্জের কোলাজ হয়ে উঠেছে লেখাটি। কিন্তু নিবিড় ও মনোযোগী পাঠগ্রহণ করলে, সেগুলির অনেকাংশেই ব্যঙ্গাত্মক বাস্তবতা মূর্ত হয়ে ওঠে। অথচ যে-

পুপেদিদির জন্য এইসকল কল্পকাহিনিচূর্ণের বিপুলতর আয়োজন, আলোচ্য সেই সে-সর্বনামক মানুষটির জন্ম, সেই পুপেদিদিই 'যথেষ্ট বয়স' প্রাপ্ত হবার পর উক্ত আয়োজনকে বলে 'ছেলেমানুষি' (ঠাকুর: ১৩৯৬: ৪৫৩) আর উক্ত গল্পগুলিকে বলে 'আজগুবি গল্প' (৪৫৭)! অর্থাৎ পুপেদিদি পরিণতমনস্কতার কারণে তার অতীত পাঠাভ্যাসকে নাকচ করতে চাইছে। যে-বাস্তবতা প্রত্যক্ষ নয়, যার গহনে লুকিয়ে আছে অন্যতর চিহ্নায়িতের বাস্তব, তাকে চিনতে না-পেরে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই পুপে নামের মেয়েটি হঠাৎ বড়ো হয়ে ওঠে। যদিও ('একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প'-এর মধ্যে) রবীন্দ্রনাথ 'বয়স প্রাপ্ত' হওয়ার শর্ত হিসেবে সম্পূর্ণ বিপরীত বুদ্ধিগুণের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন (যা আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি)। অথচ পুপে নামের প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েটি যে-গল্পগুলিকে 'আজগুবি গল্প' বা 'ছেলেমানুষি' বলে উল্লেখ করেছে, সেগুলিকে কিন্তু একেবারেই নিরর্থক গল্প বলা চলে না। তা আমরা নিবিড় বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব।

প্রথমেই ২নং পরিচ্ছেদে আমরা পাচ্ছি হুঁহাউ দ্বীপের কথা; যা "বাইরে থেকে মনে হয় আজগুবি, কিন্তু আসলে সমাজব্যঙ্গ" (গুপ্ত: ১৯৯৩: ৮২)। এখানে এই বিশেষ যে-দ্বীপরাজ্যটির কথা বলা হচ্ছে, সেই নির্জন প্রদেশে একদল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বসতি স্থাপন করে তিনটি (মূলত দুটি) প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে চাইছেন। একটি হল, পেট নামক উপসর্গ তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষুধা ও তৎসংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে চিরকালের মতো জয় করা; দ্বিতীয়টি— শিশুসুলভ চতুষ্পদী (হামাগুঁড়ি) চালে ফিরে গিয়ে নিজেদের হৃদ্‌যন্ত্র পাকযন্ত্র প্রভৃতির স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা; এবং তৃতীয়টি (দ্বিতীয়টির প্রলম্বিত যুক্তি হিসেবেই যেটিকে আমরা দেখতে চাইছি) হল, মৌনব্রত অবলম্বনের মাধ্যমে শ্বাসক্ষয় (ফলস্বরূপ আয়ুক্ষয়) রোধ করা। নিঃসন্দেহে খুবই উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষামূলক প্রয়াস। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থে আসলে তা বিশেষ কোনো সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতিমূলক সম্ভাবনাগুলিকে ইঙ্গিত করে। কোন্ সমাজব্যবস্থা?— যেখানে "দ্বৈপায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগ্‌নি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন" (ঠাকুর: ১৩৯৬: ৩৮৯)। অর্থাৎ মুখ দিয়ে খাদ্যগ্রহণের বিকল্প হিসেবে তাঁরা নাক দিয়ে নস্য নেওয়াকেই (তাও আবার তামাকচূর্ণের পরিবর্তে তৃণচূর্ণ) কার্যকরী বলে

ধরে নিয়েছেন। নিহিতার্থ স্পষ্টভাবে যদিও ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবু অনুমানভিত্তিকভাবে আমরা বলতে পারি যে, বিষয়টি পরোক্ষভাবে (ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে) খাদ্যাভ্যাস-সংক্রান্ত বিধিনিষেধের ধর্মীয় অনুশাসনগুলিকেই বিদ্রুপ করতে চাইছে। সমস্যার যথার্থ সমাধান-চেষ্টার বদলে ছদ্ম সমাধানকল্পের এই প্রহসন সেই ব্যবস্থাগত ত্রুটিকে নির্দেশ করে। যদিও এর উৎসমূলে তৎকালীন অন্য কোনো উপাত্ত মজুত রয়েছে কিনা আমরা জানি না। এবার আমরা মৌনব্রত অবলম্বনের প্রসঙ্গটিতে যদি নিবদ্ধ হই, তাহলে আমরা এভাবেও ভাবতে পারি যে, মৌনব্রতের কারণমূলে রয়েছে বাক-স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত (~~বাকস্বাধীনতা~~ < মৌনব্রত), যেহেতু বাক্য না থাকলে বাক-স্বাধীনতাও নেই; সুতরাং বিষয়টি মূলত একধরনের প্রতিবাদহীনতাকে চিহ্নিত করে। অপিচ অতিকল্পনায়, 'ইশারার ভাষা' বর্ণনা করতে গিয়ে আরও যা-কিছু বলা হয়েছে ("কখনো ঢেঁকি-কোটার ভঙ্গিতে... দর্শকের চোখে জল আসে"— পৃ. ৩৮৯), তাতে ওই বিশেষ অনুচ্ছেদটিকে নির্বাক সিনেমার কৌতুক-সমালোচনা বলেও কারো কারো মনে হতে পারে, যদিও সে ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে সেভাবে কার্যকরী হবে না। আরও উল্লেখ্য, এই অনুষঙ্গে বানর ও হনুমানের কথাও (যদিও এদেরও নিজস্ব ভাষা রয়েছে) পেড়েছেন লেখক, যে প্রাণী-দুটি আদিম টোটেম-দেবতা থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মেরও অংশ (প্রসঙ্গত: গেছো বাবা— পরে আলোচ্য), সুতরাং এক্ষেত্রেও খানিক ধর্মীয় বিদ্রুপ সম্পৃক্ত রয়েছে দেখতে পাই। বস্তুত, আমরা রবীন্দ্রনাথের নানান লেখায় হিন্দুধর্মের কট্টর আনুষ্ঠানিকতাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করার প্রয়াস প্রায়শই লক্ষ করে থাকি; এখানেও তার ছায়াপাত রয়েছে। এবং রয়েছে যে হামাগুঁড়ির কথা, সেখানেও নিহিত রয়েছে বিশেষতর বার্তা; 'চতুষ্পদী চাল'— শিশুত্বের (অবশ্যই মানব-শিশুত্ব) নির্দেশকের পাশাপাশি, বা তার চেয়েও অধিকগুণে, পশুত্বের নির্দেশক— যা মূলত মানববুদ্ধির অবনমন, বা প্রত্যাগমন, বা পশ্চাদ্‌ভ্রমণকে চিহ্নিত করছে। অনুরূপভাবে ৯ নং পরিচ্ছেদেও, কল্পবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সে-র মাথায় ভরে-দেওয়া বনমানুষের কিংবা বানরের মগজও, যথারীতি একই বিষয়ভাবের উদ্রেক করে। প্রসঙ্গত মনে পড়বে: 'শেষ কথা' গল্পে আমরা 'behaviorism'-এর বিরুদ্ধ যুক্তিগুলির অনুসন্ধানের উল্লেখ পেয়েছিলাম, তা-ই কেবল নয়, 'behaviorism'-এর বিপরীত

মনোবৃত্তির অনুশীলনও আমরা দেখেছিলাম পাত্রপাত্রীদের মধ্যে। অতএব লেখকের মনোভাব এখানেও কতক মূর্ত হয়।

এরকমই ৩য় পরিচ্ছেদে 'শিবা-শোধন-সমিতি'র একটি রিপোর্ট আমরা পাচ্ছি, তাও অনুরূপভাবে (সে-র কথামতো) "আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি" (৩৯৪); একটি শেয়ালের শিক্ষিত শীলিত হয়ে উঠতে চাওয়ার, 'মানুষ' হয়ে উঠতে চাওয়ার গপ্পো। সমিতির দ্বারা সর্বপ্রথম তার নামের বদল ঘটানো হয় (~~হৌহৌ~~ শিবুরাম), দ্বিতীয়ত তার সাধের লেজ কাটা পড়ে, সর্বোপরি নাপিত ডেকে খুর দিয়ে তার লোম অবধি চাঁছিয়ে ফেলা হয়— সব মিলিয়ে তার এই সংশোধিত চেহারায় তাকে আর শেয়াল বলেই শনাক্ত করা যায় না। এখানে, শেয়াল থেকে শিবুরামে সত্তার এই যে অভিবাসন, তা কাদের কী ধরনের সংকটকে প্রকট করে তুলছে আমরা দেখব। বিষয়টি সেইসব ব্যক্তিত্ব-সংকটের কথাই বলে, যেখানে কেউ-একজন নিজের শেকড়ের মাটিকে ভুলে, নিজের প্রকৃত অবস্থানক্ষেত্রকে অগ্রাহ্য ক'রে, 'উচ্চতর' কোনো সমাজ-সংস্কৃতির মোহে অন্ধ অনুকরণের ওপর নির্ভর করে পরিচিতির অসমঞ্জস দ্বান্দ্বিকতায় পতিত হয়— সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (প্রসঙ্গত, *পঞ্চতন্ত্র*-এর সেই 'নীলবর্ণ শৃগালের গল্প' তো আমরা প্রায় সকলেই জানি, এই গল্পটিকে তারই একটি উনিশ-বিশ-শতকীয় বিনির্মাণ বা পুনর্গঠন বলে দাবি করতে পারি আমরা)। আলোচ্য এই সমিতির সভাপতির নাম গৌর গোঁসাই, 'গোঁসাইজি'র কথামতোই শেয়াল নিজেকে 'শোধন' করেছে, সেই সুবাদে শেয়ালরূপ অতিশয়োক্তির অন্তরালে অনুক্ত উপমেয়টুকু এখানে— হয়তো সেইসকল 'নিম্নবর্গীয়' বা উপজাতিক মানুষজনকে বোঝায়, যাঁরা 'উচ্চবর্ণ' শ্রেণিকাঠামোর অনুকরণে নিজেকে পরিশীলিত করে তুলে সম্মানিত হতে চান— তাই যখন "গোঁসাই বললেন, রঙ মিলিয়ে সবর্ণ হতে চাও যদি, তবে রোঁয়া ঘুচিয়ে ফেলো" (৩৯২), তখন এ-দেশীয় বর্ণব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিতই প্রকাশ পেল। কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিসরে এ-ভাষ্যের এক ভিন্নতর ভাবার্থ উপস্থিত, এক বিশেষতর বয়ানের কথা আমাদের মাথায় আসে, তা হল ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণপ্রয়াসে নিযুক্ত এ-দেশীয় কিছু মানুষজনের বিশেষ দুরবস্থার ছবি (এই প্রেক্ষিতেই *কঙ্কাবতী*-র সেই 'ব্যাঙসাহেব'-এর কথা আমাদের মনে পড়বে)।

অতঃপর গেছো বাবার গল্পে আমরা দেখি, গেছো বাবার কৃপায় কীভাবে ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের সৌভাগ্য সূচিত হয়, এবং সেই 'গেছো বাবা' পরবর্তীতে (বিষয়লোভী মূঢ়ের দৃষ্টিতে) কীভাবে হনুমানের সঙ্গে একরূপ হয়ে যান ('কপিরূপ' ঈশ্বর, টোটেম-দেবতার বিবর্তিত অনুষঙ্গ); ধর্মকেন্দ্রিক অন্ধবিশ্বাসের প্রহসন এই অতিসংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটুকুর মধ্য দিয়ে একরকম করে ফুটে ওঠে। ভেকুর স্বয়ংঘোষিত ঈশ্বরপ্রদত্ত গামছার গরিমাগুণে রথতলার কাছে বা হোঁদলপাড়ার মেলায় রীতিমতো তার পসার জমে ওঠে। তথাকথিত ধর্মভীরু গ্রামবাসীদের থেকে প্রাপ্ত নৈবেদ্যের বলে ভেকুর পেট ভরে যায়। গাজন পালের চাকরি (রাজবাড়িতে কোতোয়ালের সেবা করার, অর্থাৎ সোজা কথায়, ক্ষমতাকে তুষ্ট রাখার কাজ) পাওয়ার ঘটনায় এই দেবমাহাত্ম্যের প্রচার আরও নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে। এখানে এক প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব আমরা লক্ষ করতে পারি। প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব বলতে আমরা বলতে চাইছি সেই বিশেষ যুক্তিবিভ্রমের কথা— যেখানে কোনো বিশেষ ফলাফলের পূর্বপ্রান্তে প্রযুক্ত (অথবা নিম্নতলে নিযুক্ত) প্রধান বা প্রকৃত কারণটিকে শনাক্ত করতে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে, বা তাকে বলপূর্বক উপেক্ষা করে, অন্য কোনো ছদ্ম বা গৌণ কারণকে উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রেও, গাজন পালের চাকরি পাওয়ার ছদ্ম বা গৌণ কারণ হল তার উল্লিখিত দেবভক্তি (অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদিত ধান, এমনকি পাঁঠাও), এবং যে মূল কারণটুকু রয়েছে প্রচ্ছন্ন, তা হল: তার রাজভক্তি (উমেদারি বা চাটুকারিতা)। সেইসঙ্গে সামগ্রিকভাবেও, গেছো বাবার গোটা গল্পটিকেই আমরা এই একই শ্রেণির হেতুবাচক নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। ভেকুর ওই বিশেষ গামছা (~~শাল দোশালা~~) লাভের ঘোষিত কারণ হল গেছো বাবার অলৌকিক কৃপা (~~পার্থিব ক্রয়পদ্ধতি~~): এই ছদ্ম প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করেই ওই গামছা দেবত্বের বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

এরপর ৫ম পরিচ্ছেদে স্মৃতিরত্নমশাইয়ের মনুমেন্ট চাটার বৃত্তান্তও যথেষ্ট ব্যঞ্জনাধর্মী। আপাত অদ্ভুতরসাত্মক এই বিবরণ নিহিতার্থে যথেষ্ট তাৎপর্যমণ্ডিত মনে হয় আমাদের। আমরা দেখি, গোলকিপার হিসেবে পাঁচ-গোল খাওয়ার পর খিদের চোটে (!) স্মৃতিরত্নমশাই নীচ থেকে শুরু করে চূড়া অবধি গোটা মনুমেন্টটাই চেটে দেন, এবং একজন 'শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে' মনুমেন্টের মতো একটি বৃহদাকার বস্তুকে 'এঁটো' করে

দেওয়ার জন্য বদরুদ্দিন মিঞার সঙ্গে তাঁর বিবাদের এক বিশেষ বাতাবরণ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বদরুদ্দিন মিঞাও মনুমেন্টের গায়ে তিনবার থুতু ফেলে (ইসলাম ধর্মবিধি অনুযায়ী শয়তানের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের সূচক) সংবাদমাধ্যমের কাছে নালিশ জানাতে ছুটে যান। সুতরাং একটি ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ সাধারণভাবেই এর মধ্যে স্পষ্ট। তা আরও বেশি বিশ্লিষ্ট হবে, যদি আমরা 'মনুমেন্ট' চিহ্নটির ওপর আলোকপাত করি। মনুমেন্ট তৎকালীন কলকাতার সম্ভবত উচ্চতম সৌধ। অর্থাৎ তার চূড়া— আমরা ভাবতেই পারি, খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ বিন্দুকে দ্যোতিত করছে। অতএব তা চেটে দিয়ে আগাগোড়া 'এঁটো' করে দেওয়াটা, ক্ষমতাসৌধের চূড়ান্ত বিন্দু অবধি গ্রাস করতে চাওয়ার স্বাক্ষর, কলকাতাকে একপ্রকার কুক্ষিগত করার মহড়া। তাই বদরুদ্দিন মিঞা এই কার্যে এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ তিনিও এই আগ্রাসনপ্রণালীর একজন গুরুত্বপূর্ণ শরিক, প্রতিযোগী। পাশাপাশি, এঁটোকাঁটার ছুঁৎমার্গও এখানে প্রকাশ পাচ্ছে, যদিও তা প্রতিষ্ঠালোলুপ লড়াইগুলির চরিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না। কিন্তু অদ্ভুতরসের কাহিনির বোধ হয় এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, এখানে ভাবার্থের কেন্দ্রবিন্দু ক্রমশই সরে সরে যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা পাচ্ছি বাঘের রূপক। আমরা জানি, বনজ বাস্তুতন্ত্রে বাঘ হল খাদ্যশৃঙ্খলের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধিত্বমূলক একটি খাদক প্রাণী। একইভাবে শ্রেণীবিভাজনের নিরিখে, মানব-সমাজেরও নিজস্ব খাদ্যশৃঙ্খল রয়েছে। সুতরাং বাঘ খুব সহজেই রূপকগুণে মানব-সমাজস্থিত খাদকশ্রেণি তথা শোষক/শাসকগোষ্ঠীর অতিশয়োক্তিতে পরিণত হয়। এখানে দুই-প্রকার ব্যাঘ্র-সম্প্রদায়ের কথা বলতে চেয়েছেন কথক। উল্লেখানুযায়ী প্রথমটি হল প্রাচীন— বাঘেদের মাংস-লোলুপতার সংস্কৃতির মধ্যে অতিকাল্পনিক বাছবিচারের সূক্ষ্মজটিল নানারকম নিয়মকানুন আরোপ করার মাধ্যমে, তাদের আগ্রাসনধর্মকে এ-দেশীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের সদৃশতায় বুনে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বিচিত্র বারণবিধি ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রণালী পরোক্ষে আমাদের প্রথাকণ্টকিত জাতপাত-জর্জরিত ভারতীয় জনসমাজকেই বুঝি বিম্বিত করে। প্রসঙ্গত *অচলায়তন* (অথবা *গুরু*— সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) নাটকে উল্লিখিত কিম্ভূত আচারসর্বস্বতার কথা আমাদের মনে পড়বে। এবং দ্বিতীয় প্রকার যে বাঘের বিবরণ

আমরা পাচ্ছি সেই বাঘ যথারীতি 'আধুনিক', 'যুক্তিবাদী' ও 'প্রগতিওয়ালা'— খাদ্যসম্পর্কে কোনোরকম বাছবিচারের তোয়াক্কা করে না। স্বভাবতই এই বাঘ মূলত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রূপকল্প হাজির করে (বলা বাহুল্য, পুঁজিবাদের চরিত্রের সঙ্গেও এ-হেন ব্যাঘ্রধর্ম বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ)। অর্থাৎ বাঘের এই 'আজগুবি' গালগপ্পোগুলি আদতে মানব-সভ্যতা সম্বন্ধে অতিশয় গুরুগম্ভীর বয়ানই পেশ করে চলেছে। এবং বাঘ নিয়ে মহাপয়ার মিশ্রবৃত্তে যে গুরুগম্ভীর কবিতাটি ("তোমার সৃষ্টিতে কভু... পরিহাস", পৃ. ৪১৮, ঐ) রয়েছে, সেখানে 'বাঘ' শব্দটির উল্লেখমাত্র না-থাকায় পুপেদিদি যখন বিস্ময় প্রকাশ করে ("কিন্তু, এর মধ্যে বাঘটা কোথায়", ঐ), তখন তার উত্তরে কথক যে-কথাটি বলেন ("যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তবু আছে ভয়ংকর গোপনে", ঐ) তাতে উক্ত স্বভাবোক্তির মধ্যে বাঘের নামোল্লেখটুকুর গোপনীয়তাই শুধু নয়— বাঘের অভিপ্রেত তাৎপর্যটুকুর গোপনীয়তাও ব্যঞ্জিত হয়।

এছাড়া অন্যত্রও, টুকিটাকি নানান ক্ষেত্রেই (যেমন ১০ নং পরিচ্ছেদে পুপেহরণ-বৃত্তান্তে, একপ্রকার শিশুস্বপ্নমনস্তত্ত্বের যুক্তিতেই হয়তো, চাঁদ খরগোশে আর ঘড়ি ঘণ্টাকর্ণে রূপান্তরিত হয়ে যায়) ভাষার রূপকপ্রতিভা এভাবেই নিজগুণে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুতরাং সব মিলিয়ে বলতে গেলে, আপাত অদ্ভুতরসের এই বিস্ময়কর সন্দর্ভটি আমাদের শতসহস্র সম্ভাবনাময় সমাজ ও জীবনভাষ্যের নানানবিধ গভীরতর বয়ানকে ধারণ করতে চেয়েছে, অর্থকে তার আভিধানিক রাজকোষাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত থেকেছে নিরন্তর। অনুরূপ নিদর্শন আমরা পাই *গল্পসল্প*-এর 'বড়ো খবর' শীর্ষক পরিচ্ছেদে, *লিপিকা*-র একাধিক গল্পে/গল্পিকায়, *ব্যঙ্গকৌতুক*-এর দুটি-একটি রসিকতাসূত্রে।

'বড়ো খবর'-এ আমরা দেখি, একটি নৌকাকে আমাদের সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার একটি উপমান হিসেবে হাজির করে সেখানে পাল ও দাঁড়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে মানুষিক শ্রেণিসংঘাতের রূপক আকারে চিত্রায়িত করা হয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিয়েছে উপমান, তবু লেখকের এ-সম্বন্ধীয় মন্তব্যের মর্মার্থ 'সহৃদয়পাঠক'গণের বুঝতে ততখানি অসুবিধা হয় না। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) দুই দশক পরে লেখা এই বিশেষ রূপকভাষ্য শ্রমজীবী শ্রেণির বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বার্তাই আসলে

প্রকাশ করতে চায়। আমরা দেখি, পালের 'ফাঁকা বাবুয়ানা' নিম্নজীবী দাঁড়গোষ্ঠীকে সততই বিক্ষুব্ধ করে তোলে— দাঁড়েরাই যৌথভাবে নৌকার প্রধান চালিকাশক্তি হওয়া সত্ত্বেও 'অহংকেরে পাল' বুক ফুলিয়ে তাদের 'ছোটোলোক' বলে হেয় করতে থাকে। তাই দাঁড়েরা সদলবলে কাজে ইস্তফা দেওয়ার হুমকি দিলে রীতিমতো সংকটে পড়েন মাঝিমশাই (অর্থাৎ মূল-নেতৃত্ব: পুঁজিবাদী রাষ্ট্রপ্রশাসন?)— তিনি সুচতুর কৌশলে দাঁড় ও পাল দুইশ্রেণিকেই হাতে রাখার চেষ্টা করেন। অতএব এখানে মাঝির যাপনে বা জীবনদর্শনেও একধরনের সুবিধাবাদী শ্রেণিসমঝোতার মতাদর্শই প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই কুটিল সমর্থনের প্ররোচনায় পালের বায়বীয় গৌরব আরও শ্লাঘাবিহ্বল হয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। পক্ষান্তরে দাঁড়গুলির মজবুত হাড়ের ভেতর নিহিত থাকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানোর বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার সংবাদকেই কথক বলতে চেয়েছেন 'বড়ো খবর'। কিন্তু কুসমির কাছে তা ঠাট্টা মনে হয়, কারণ তা দৃশ্যত খুবই তুচ্ছ। তাই কুসুমকে বোঝানোর জন্য তার দাদামশাই বলেন— "খাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে, যেমন বীজ। ডালপালা নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে" (৪৮২)। সুতরাং তা আসন্নের সংকেত। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষজীবনের লেখা *আরোগ্য* (১৯৪১) নামক কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতাতেও ('ওরা কাজ করে' নামে সমধিক পরিচিত) এই একই সুরের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। সেইসাথে কুসমির সম্ভাব্য ভূমিকাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। দাদামশায়ের প্রস্তাব অনুযায়ী সে "যেখানে দাঁড় বেশি কচ্‌কচ্‌ করে সেখানে দেবে একটু তেল" (ঐ)। অর্থাৎ কুসমি— বর্তমানের বালিকা, ভবিষ্যতের পরিণতমনস্কা নারী— আসন্ন বিপ্লবের কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে শ্রমের কর্কশতা ও কাঠিন্যকে স্নেহ দিয়ে, স্নিগ্ধতা দিয়ে, শম ও শুশ্রূষা দিয়ে সাজিয়ে তুলবে, নবযুগের কঠোর সাধনাকে সুষমামণ্ডিত করে তুলবে নিজস্ব মাধুর্যগুণে। ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় (১৯৯৩ : ৬৪-৬৫) আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও (১৪২১ : ৭৯) কুসুমের এই ভাবী দায়িত্বের বিষয়টিতে আলোকপাত করতে চেয়েছেন।

'তোতাকাহিনী'-তে (*লিপিকা*, ১৯২২) আমরা দেখি, একটি পাখিকে 'শিক্ষা' দেওয়ার রাজকীয় আয়োজন তার যাবতীয় অনুপুঙ্খসমেত কী নিখুঁত ব্যঞ্জনায় একটি আধুনিক বুর্জোয়ারাষ্ট্রের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তুলছে; যার

প্রাসঙ্গিকতা এমনকি আজও অম্লান— বলা যায়। এবং পাখিটি, বলাই বাহুল্য, এ-হেন বিশেষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে আসলে যে-কোনো নবীন ছাত্র তথা শিক্ষার্থীর অব্যর্থ উপমান। তার অনিচ্ছুক বন্দিত্ব, তার ডানা কাটা পড়ার অনিবার্য নিয়তি, তার ক্রমনির্ধারিত নির্জীবতা ও সর্বোপরি তার 'মৃত্যু'— সবকিছুই একজন তরুণ শিক্ষার্থীর স্বাধীন প্রাণোচ্ছল যাপনের অন্তরায়সমূহকে, তার কল্পনাশক্তির চূড়ান্ত অবদমনকে বা চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের তুমুল বাধা ও বিনষ্টিকে সূচিত করে। পাখি হিসেবে তোতাও এখানে উক্ত রূপকভাষ্যের সাপেক্ষে যথেষ্টই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ "তোতাকে বলা হয় শুকগোষ্ঠীর পাখি; তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনর্গল মুখস্থশক্তির অনুষঙ্গ" (ঘোষ: ২০১৮: ৩৪৬)। বস্তুত, বাগধারা হিসেবে 'পাখি পড়ানো' কথাটি আমরা সাধারণভাবেই নানা প্রসঙ্গে ব্যবহার করে থাকি। আলোচ্য শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে তাই রাজকীয় প্রত্যাশার প্রকোপ এক প্রবল প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়ে চলেছে, আজও। বিশেষত তা রাষ্ট্রব্যবস্থার নিজস্ব প্রয়োজনেই। পুথির শুকনো পাতা সেই(/এই) বাধ্যতামূলক নীরস উপলব্ধিহীন অপ্রায়োগিক জ্ঞানেরই দ্যোতক। সর্বান্তে, সেই শুকনো পাতাগুলির বিপ্রতীপে বাইরের নববসন্তের দখিন হাওয়ায় কেঁপে-ওঠা সজীব সরস কিশলয়গুলির 'দীর্ঘনিশ্বাস' যেন পরোক্ষে কথক তথা লেখকের গভীর নিরুপায় সমবেদনাকেই প্রকাশ করতে চাইছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ শিক্ষাচিন্তার ছাপ আমরা তাঁর গঠনমূলক বিবিধ উদ্যোগে অথবা জীবনচর্যায় ও নানান ভঙ্গির লেখাপত্রে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকি, এখানেও তারই এক নিবিড় মরমী শিল্পিত ভাষ্য আমাদের হৃদয়কে (অথবা যেমন— মুকুলিত বনের আকাশকে) আকুল করে তোলে।

'কর্তার ভূত' গল্পের উল্লিখিত 'ভূতশাসনতন্ত্র'ও দেখতে গেলে এরকমই একটি উল্লেখযোগ্য রূপকাতিশয়োক্তি। 'ভূত' শব্দটি, আমরা দেখি, সাধারণত দুটি অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে: একটি হল 'প্রেতাত্মা', অন্যটি 'অতীতকাল' (এর বাইরেও কিছু অনুষঙ্গ উপস্থিত, যেমন, 'পঞ্চভূত' শব্দটির ক্ষেত্রে)। আপাতভাবে। কিন্তু আসলে আলোচ্য দুটি অর্থই এক, অভিন্ন আর ওতপ্রোত। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, প্রেতাত্মাও আসলে কোনো-না-কোনো ব্যক্তিসত্তার (অথবা বস্তুপিণ্ডের) বিশেষ বর্তমানস্থিত একটি অতীত সংস্করণকেই চিহ্নিত করে। সুতরাং এই সূত্রে এই নিহিত মিলটুকু অবলম্বন করে কর্তার

‘ভূত’ তথা প্রেতাত্মা আসলে সংস্কারগতভাবে আমাদের অতীত অভ্যাস, ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের রূপক (উপমান) হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কথক যখন বলেন— “ভবিষ্যতকে মানলেই তার জন্য যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই” (ঠাকুর: ১৩৯৬: ৩৪৬), তখন ভবিষ্যতের বিপ্রতীপে ‘ভূত’ শব্দের আলোচ্য তাৎপর্য আরও স্পষ্টরূপে ধরা দেয়। সেইসাথে আরও দ্রষ্টব্য: এই ভূত কার্যত ‘কর্তার’ ভূত। সুতরাং, তা স্বয়ং কর্তৃত্বের দাপটকেই দ্যোতিত করে (the authority itself): একপ্রকার অতীতকালীন কর্তৃত্বের ছায়াতেই যেন মানুষের চালচলন নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের পক্ষে সাবলম্বী জীবনচেতনার আর কোনো বালাই থাকে না। তবু যারা ‘স্বভাবদোষে’ এসব শাসনবিধি ও সম্মোহন না-মেনে নিজবুদ্ধি প্রয়োগ করে জীবন ও জগতকে বুঝে নিতে চায়— ‘তারা খায় ভূতের কানমলা’ (ঐ); অর্থাৎ ‘ভূতগ্রস্ত’ সমাজ সেইসব স্বাধীনচেতা মানুষদের প্রচেষ্টা ও প্রতিবাদকে দমন করে, তাদের শাস্তি দিয়ে শায়েস্তা করে। প্রসঙ্গত, ‘তোতাকাহিনী’তেও আমরা দেখেছি, নিন্দুকদের নিরস্ত করা হচ্ছে ‘কানমলা’ দিয়েই (আপেক্ষিকতার নিরিখে ‘নিন্দুক’ শব্দটি সেখানে নেতিবাচক অর্থে নয়, বরং একপ্রকার সদর্থেই, প্রতিবাদী বা ‘অপ্রিয় সত্যভাষী’ বোঝাতেই মূলত ব্যবহৃত হয়েছে)। এরপর যে আমরা ‘ভূতুড়ে জেলখানা’র উল্লেখ পাই— তার চেহারা অদ্ভুতভাবে আমাদের পরিচিত জেলখানার মতো নয়, কারণ তার দেয়াল ‘চোখে দেখা যায় না’; সুতরাং ‘অদৃষ্ট’ যার দেয়াল, সেই জেলখানা যে জোরালোভাবে একটি রূপক তথা অতিশয়োক্তি, তা যথাসাধ্য অনুমেয়; সুতরাং তা এমন এক বাধ্যতামূলক বন্দিত্বকে সূচিত করে, যা বস্তুগত নয়, যা নিরাকার, যা কোনো-না-কোনো সমাজ-সংস্কৃতিগত অভ্যাস বা চিন্তাপদ্ধতি বা যাপনপ্রক্রিয়ার প্রকল্পায়ন। আমাদের অভিজ্ঞতায় তা আমাদের ভারতীয় বা এশীয় সমাজব্যবস্থাকেই স্মরণ করায়, যদিও অন্যান্য যে-কোনো প্রথানির্ভর রক্ষণশীল সমাজ-সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই রূপকটি প্রযোজ্য। এবং উল্লিখিত জেলখানার দারোগা হিসেবে নিযুক্ত থাকে ‘ভূতের নায়েব’— এখানে ‘নায়েব’ শব্দটির মধ্য দিয়ে এদেশীয় জমিদারতন্ত্রের অনুষঙ্গও ফুটে ওঠে। এ-স্থলে খানিক সংশয়ও তৈরি হয়: ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ধর্মান্ধতা, ‘অদৃষ্টের চাল’ তথা নিয়তিবাদী ঝোঁক, অথবা পরবর্তীতে উল্লিখিত ‘সনাতন’ ঘুম, শিরোমণি-চূড়ামণির দল ও কৃষ্ণনামের প্রসঙ্গ প্রভৃতি তো একপ্রকার ধর্মতন্ত্র বা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের আবহ

জাগিয়ে তোলে— তাহলে জমিদারতন্ত্রের অনুষঙ্গ কি আলোচ্য বয়ানকে বিপর্যস্ত বা খণ্ডিত করে তুলছে না? না, কারণ নিয়তিবাদী ভাবধারাগুলির সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর এক গভীর আঁতাত বা ভিতর-সংযোগ রয়েছে বলেই আমাদের ধারণা (যে ষড়যান্ত্রিকতা এমনকি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে ভাবীকালের কাঠামোয়); সেহেতু সবটুকু মিলিয়ে শাসনতন্ত্রের যেন এক বিমিশ্র আদল উপস্থাপিত হয়েছিল সমসাময়িক বাস্তবতায়। সেখানে যে বিশেষ 'ঘানি'-র প্রসঙ্গ রয়েছে, তাও এক নিরন্তর নিরর্থকতার সংস্কৃতিকেই চিত্রায়িত করে: ঘানিতে উৎপন্ন তেলের অভাবটুকুর সঙ্গে একই সরলরেখায়— সাদৃশ্যে— অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অভাবের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশে উক্ত ঘানি আসলে সমাজরূপ পেষণযন্ত্র হিসেবেই ব্যঞ্জিত হয়। এরই দ্বান্দ্বিকতায় অন্যান্য দেশের যে ছবি উঠে আসে তা ঘানির উৎপাদনশীলতার সঙ্গে অন্বিত। ক্রমান্বয়ে আমরা পাচ্ছি লোকছড়ায় উদ্ধৃত বর্গি ও বুলবুলির কথা। 'বর্গি'— এই চিহ্নের নির্যাসটুকু হল: একটি বহিরাগত লুণ্ঠনকারী গোষ্ঠী। এক্ষেত্রে কালপ্রেক্ষিতের পরিবর্তনে, লেখনকালের নিরিখে, তা মূলত একটি ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীকেই চিহ্নিত করে যারা ক্রমে রাজশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। পাশাপাশি 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' অংশটিরও বিনির্মিত রূপকভাষ্য বের করে আনেন লেখক। 'নানা জাতের বুলবুলি'ও একইভাবে পূর্ববর্তী নানান বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রূপক হয়ে ওঠে, যারা এ-দেশীয় সম্পদ স্বেচ্ছাচারপূর্বক আত্মসাৎ করেছে বিভিন্ন সময়খণ্ডে। আমরা দেখি, খাজনা দেওয়ার দ্বিবিধ বাধ্যবাধকতা শাঁখের করাত হয়ে চেপে বসে জনগণের উপর। তবু একইসাথে বহাল থেকে যায় আবহমান ঘুমের (অনন্ত নিষ্ক্রিয়তার) রাজনীতিও; 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' নিজেদের রূপকাচ্ছাদন উন্মোচন করে— যেন বা হয়ে ওঠে ক্ষমতার পক্ষাবলম্বনকারী স্থিতাবস্থার পরিপোষক ভাবাদর্শের প্রচারকমণ্ডলী। যদিও জেগে ওঠার প্ররোচনা শেষাংশে আভাসিত হয়, এমনকি কর্তার কথাতেই, আমরা অনুভব করতে পারি যে, অনিরাপত্তার ভয়কে কাটিয়ে ওঠার মধ্যেই লুকানো রয়েছে ভূতকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার বলিষ্ঠ সম্ভাবনা।

'ঘোড়া' রূপকথার আদলেই লিখিত। তবে এটিকে 'রূপককথা' বলা হবে কিনা, তা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট দ্বিধা-দোলাচল রয়েছে। তবু, ঘোড়াকে যদি আমরা রূপক

হিসেবে চিহ্নিত করতেও চাই, তাহলেও, এখানে ঘোড়া আসলে কীসের রূপক? এক্ষেত্রে আমাদের মূলত মনে হয়, ঘোড়া এখানে বস্তুত ঘোড়া হিসেবেই উপস্থিত অর্থাৎ অভিধাগতভাবে আমাদের চিরচেনা সুনির্দিষ্ট প্রাণিটিকেই এখানে হাজির করা হচ্ছে, কেবল তার ইতিহাসগত প্রেক্ষাপটকে অভিনব একটি মৌলিক পুরাণকল্পের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে করে সে রূপক (metaphor) হয়ে ওঠে না, বড়োজোর তাকে একটি নির্দেশক (index) হিসেবে দেখতে পারি আমরা। ঘোড়াকে সাধারণভাবেই গতির নির্দেশক হিসেবে জেনে (ও ব্যবহার করে) আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু প্রশ্ন হল: সেই 'গতি'র তাৎপর্য ও চরিত্র কী? বহু দশক পরে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মাংসখেকো ঘোড়া' গল্পে (পরবর্তীতে আলোচ্য) একটি অতিপ্রাকৃত ঘোড়া যেমন অতিপুঁজিবাদী আগ্রাসনের রূপক হয়ে ওঠে। কিন্তু *লিপিকা*-র এই পা-বাঁধা অসহায় অবদমিত ঘোড়াটি আসলে কীসের দ্যোতক? আখ্যানের শেষাংশে যখন 'বিষম বোঝা' ও মনুষ্যত্বের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হল, তখন কি তা বিশেষ কিছুর রূপক হয়ে উঠল শেষ অবধি? সমালোচক তপোব্রত ঘোষ এই বিষয়ে বলেন, "ভারতে ইংরেজশাসনের সাম্রাজ্যতান্ত্রিক আভিজাত্যের বাহনরূপেই *লিপিকায়* ঘোড়া-রূপকটি প্রযুক্ত হয়েছে" (৩৪৫)। যদিও আমরা ভাবগতভাবে উক্ত ঘোড়াটিকে 'সাম্রাজ্যতান্ত্রিক আভিজাত্যের বাহন' হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে খানিক দ্বিধান্বিত। কারণ সেক্ষেত্রে ঘোড়ার পা-বাঁধা প্রতিবন্ধকতা যথেষ্টই বেমানান। তবে বস্তুগতভাবে ঘোড়াকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপব্যবহৃত বাহন হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। সেক্ষেত্রেও তাকে নির্দেশকই বলতে হবে, রূপক নয়। ঈষৎ অন্যভাবে দেখলে: আরও একপ্রকার ভাবার্থ আমরা অনুমান করতে পারি। উল্লেখ্য: রবীন্দ্রনাথের *পথের সঞ্চয়*-এর (১৯১২) ঘোড়া-বশ-করার গল্পে ঘোড়ার গতিবেগকে 'ডাকাতি' করে নিজের কাজে খাটানোর মধ্য দিয়ে যে 'মানুষের অদম্য অগ্রগতি অভিনন্দিত হয়েছে' (ঘোষ: ২০১৮: ৩৪৫), তা-ই *লিপিকার* ঘোড়া-বশ-করার গল্প (১৯১৯) অবধি পৌঁছে লেখক-কর্তৃক নিন্দিত হতে দেখি। সম্ভবত সময়ের ব্যবধানে লেখকের এই অনুভব জাগরিত হয়েছিল যে, ঘোড়ার গতিবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজেও গতিশীল হয়ে-ওঠার বদলে মানুষ আসলে নিজের নিটোল স্থাণুত্বকেই ঘোড়ার ওপর আরোপ করে তাকে আবদ্ধ ও অবদমিত করে তুলেছে। ফলত এই স্বোপার্জিত

ট্রাজেডিই মানুষের পক্ষে হয়ে উঠেছে 'বিষম বোঝা', যা কিনা (উক্ত বিধাতার মতে) মানুষের মনুষ্যত্বেরই অন্যতম সূচক। এখানেই 'ঘোড়া' চিহ্নটি আমাদের মতে রূপকত্বে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ঘোড়াকে আমরা ভাবতে পারি চিরচলমান সময়-ইতিহাসের উপমান: এবং মানুষ, নিজের গোঁড়ামি দিয়ে, স্বার্থপরতা দিয়ে, চালাকি দিয়ে ও সর্বোপরি মূঢ়তা দিয়ে সেই গতিময় ইতিহাসকে যেন স্থাণু ও পঙ্গুবৎ করে রেখেছে। বিশেষ করে তৎকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমত পাঠকৃতি ও ব্যাখ্যা আমাদের ততখানি অপাঙক্তেয় মনে হয় না।

'নামের খেলা' গল্পে মামার স্বনামখ্যাতির প্রবল বাসনা ভাগ্নের বালখিল্য স্বনামক্রীড়ার মোহের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় তুল্যমূল্যভাবে বর্ণিত হওয়ায় বিশেষ ব্যঞ্জনার স্বর ফুটে উঠেছে। একাধিক বইতে ছাপার অক্ষরে মামার নাম দেখে প্রলুব্ধ হয়ে নাবালক ভাগ্নেটিও ছাপাখানা থেকে সীসের অক্ষর জোগাড় করে এনে কালি দিয়ে ছাপ তুলে নিজের নামটি এলোপাতাড়ি বিভিন্ন জায়গায় মুদ্রিত করে চলে— যা দেখে মামার মনে হয়েছে, 'এ কী রকম খেলা'; কিন্তু মামাটি টের পায়নি যে, ভাগ্নের এই বিশেষ ছেলেখেলা বৃহত্তর অর্থে তার (মামার) নিজেরই বিপুল অহংবাসনার বিদ্রুপাত্মক প্রতিবিম্ব (parody) হয়ে উঠছে। এবং তা আরও অব্যর্থভাবে প্রকাশ পায় 'পরস্পরসদৃশ' দুই 'ছেলে-ভোলানোর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে', যেখানে "মামা তার বয়সের মর্যাদা হারিয়ে একেবারে শিশু ভাগনেটির সমপর্যায়ে অবনমিত হয়েছে" (ঘোষ: ২০১৮: ৩৬১)। ভাগ্নে যেমন ক্ষীরপুলি বা রেলগাড়ি প্রভৃতিকে অবহেলা করে নিজের নামের জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে; মামাও তেমনি ফুটবল ম্যাচ, ঠাণ্ডা-হতে-থাকা খাবার কিংবা নতুন লেখা শোনানোর অনুরোধ প্রভৃতিকে অস্বীকার করে নিজের নামের শোকে বুঁদ হয়ে থাকে। সর্বোপরি, গল্পটি সমাপ্ত হয় ভাগ্নের গালে মামার চড় কষিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এই বিষয়ে তপোব্রত ঘোষের সঙ্গে সহমত পোষণ করে আমরা বলতে পারি— "ভাগ্নেকে মারা কি আসলে মামার নিজের সারা জীবনের নামমোহগ্রস্ত নির্বুদ্ধিতাকেই মারা নয়?" (৩৬১) সেইসাথে মামাও, আসলে কোনো ব্যক্তিবিশেষ মাত্র নয়, পার্থিব তথা সামাজিক পরিচিতির মোহে কমবেশি আচ্ছন্ন হয়ে-থাকা প্রায় আমাদের

সকলেরই প্রতিনিধিস্থানীয়, বলা চলে। এবং ভাগ্নেটিও অহংনিবিষ্ট আমাদের অন্তর্নিহিত বাল্যখিল্যতা অথবা নাবালকত্বেরই দ্যোতক।

'মুক্তি' গল্পে আমরা এক বিরহিনীকে দেখি নিজের ছেড়ে-যাওয়া প্রেমিকের মূর্তি বানিয়ে তাকে পুজো করার মরিয়া প্রকল্পে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে। এই মূর্তিপূজা আসলে কাঙ্ক্ষিতজনের এক বিশেষ ভাবমূর্তিকেই হৃদয়পটে সংরক্ষিত রাখার প্রবণতাকে নির্দেশ করে। যা মূলত পুরোহিতজনের মানসলোক থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে স্মৃতির ভাণ্ডারে টান পড়তে থাকলে, কাঁচামালে ক্রমশ ঘাটতি দেখা দিলে (যেহেতু "রাতের বেলাকার পদ্মের মতো স্মৃতির পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে যেন মুদে এল", পৃ. ৩৬৪), সেই ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে থাকে। তখন সেই আত্মগ্লানি ঘোচাতে আরও বেশি আয়োজনের (গয়না, পদ্মের ডালি, গন্ধতেল বা স্বর্ণপ্রদীপ), অতিরঞ্জনের প্রয়োজন পড়ে। এমনকি যাবতীয় বাহ্যিক আয়োজন ও সবরকম উদ্‌যাপনের ভেতর সেই মূর্তিও একসময় চাপা পড়ে যায়। সুতরাং বিরহ যতক্ষণ না বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সুষমভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে বা জীবনের মধ্যে যথাযথভাবে জারিত হচ্ছে, ততক্ষণ তা যে এক কট্টর ভাববিলাসী আনুষ্ঠানিকতার অচলায়তন বা ছদ্মবেশী স্বার্থপরতার নামান্তর হয়েই রয়ে যায়— এই গভীর দর্শনটুকুই আলোচ্য মূর্তিপূজার বর্ণনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। সবশেষে তাই দেখি, পুজোর বেদী বিলীন হয়ে যায় চলমান পথের ভেতর, আর মূর্তির মুক্তি ঘটে জীবন্ত মানবস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়ে।

এছাড়াও এসবের বাইরে যে-গল্পের কথা এরূপ রূপকধর্মিতার ক্ষেত্রে টেনে আনতে হচ্ছে, এমনই মুক্তির প্রসঙ্গে, তা আসলে 'একটা আষাঢ়ে গল্প'। রূপকের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজস্ব উপমহাদেশের জীবন-সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই গল্পে। তাসের রূপকে প্রধানত আমাদের ভারতীয় জনসমাজেরই সংকীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত আবদ্ধতার বাস্তব চিত্রটি রূপকথার আদল নিয়ে ফুটে উঠেছে। তপোব্রত ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, "তাসের দেশ সমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপভূমি। বহির্ভুবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জাতিবর্ণে বিভাজিত একটি দ্বৈপায়ন সভ্যতা" (৭৮)। যদিও বলা বাহুল্য এই 'দ্বৈপায়ন সভ্যতা' জলবেষ্টিত ভারত-ভূভাগকেই চিহ্নিত করে,

তবু তার গহন তাৎপর্য এমনকি স্থান-কাল-পাত্রের বিশেষকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। সমুদ্রের প্রকৃতি-বর্ণনায় স্নেহপরায়ণা জননীর আভাস ও আকাশের চরিত্রচিত্রণে পক্ষীমাতার রূপকল্প তাসের দেশের চিরশিশুত্বকে সূচিত করে (ঘোষ: ২০১৮: ৭৯)। প্রশ্নহীন প্রচেষ্টাহীন এই চূড়ান্ত নিদ্রাবেশের ছবি আমরা ইতোমধ্যে *লিপিকা*-র 'কর্তার ভূত' গল্পেও পেয়েছি। ১০টি ছোটো-মাঝারি পরিচ্ছেদে গল্পটি পরিণতি পেয়েছে, তাসজন্মের শাপমোচন ঘটেছে বিদেশী রাজপুত্র-কোটালপুত্র-সদাগরপুত্রের বৈপ্লবিক অভিঘাতে। উল্লেখযোগ্য যে, বিদেশী রাজা বা কোটাল বা সদাগরের হাতে নয়, মুক্তির পতাকা উত্তোলিত হয়েছে তাদের 'পুত্র'গণ অর্থাৎ তরুণতর প্রজন্মের হাতে, ভাবী নাগরিকের দায়িত্ব বহন করতে চলেছে যারা। এই প্রকল্পে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি একক হল, হরতনের বিবি। হরতনের বিবির মধ্য দিয়েই নিয়মের অচলায়তনে প্রথম জানলাপথটি উন্মুক্ত হয়, তাসের দেশে প্রবেশ করে বেনিয়মের যৌবন-বাতাস। তাসের বিবি বিবর্তিত হয় প্রেমাকুলা জীবন্ত রমণীতে। তাস-রূপকের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিউইস ক্যারলের *অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড*-এর কথা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্র-সমালোচক তপোব্রত ঘোষ, এইসংক্রান্ত মিল ও অমিল সম্পর্কে তিনি বলেন, "তাসের হৃদয়রূপী হরতন চিহ্নটি আসলে প্রেমেরই প্রতীক। এই বিশেষ প্রতীকটির সঙ্গে বিবির চরিত্রের সংগতি রবীন্দ্র-কল্পনাতেই রক্ষিত হয়েছে" (৭৮)। হরতনীর এই জাগরণের বিশেষ রূপক-তাৎপর্যটুকু আমরা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রেক্ষিতেই দেখি, বা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো বিশেষ আভাস হিসেবেই দেখি (ঘোষ: ২০১৮: ৭৮), দু-ক্ষেত্রেই তার মাধুর্য ও গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে। অতিরিক্ত আরও একটি অনুষঙ্গ এই বিষয়ে উল্লেখ্য: এই গল্পেরই যে রবীন্দ্রকৃত নাট্যরূপ *তাসের দেশ* (ভাদ্র ১৩৪০), সাম্প্রতিককালে চিত্র-পরিচালক কৌশিক মুখার্জি ওরফে Q তার চলচ্চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে এই রচনার অন্য একটি বিশেষ যৌন-সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্য উপস্থাপন করেছেন। বিপ্লবাত্মক মুক্তির আলোচ্য এই রাবীন্দ্রিক দর্শনের এক অভিনব বিনির্মাণ আমরা সেখানে লক্ষ করি। সুতরাং রবীন্দ্রকল্পিত তাসের দেশের বিচিত্র রূপক-তাৎপর্য সময় ও চিন্তার বিবর্তনেও গুরুত্বসহ বাহিত হয়ে চলেছে।

‘একটা আষাঢ়ে গল্প’ ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসেই ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালের সঙ্গে নামকরণের এই সুমধুর সামঞ্জস্য বিশেষভাবে পূর্ব-পরিকল্পিত কিনা বলা কঠিন। তবে পরবর্তী আষাঢ়ে ওই একই পত্রিকায় যে ‘অসম্ভব কথা’-টি প্রকাশ পেয়েছিল, সেখানে, এবং আমাদের আলোচ্য গল্পের ভাববস্তুতে, বর্ষার এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্ষাঋতুর নিবিড় মায়াবী আবহ আমাদের মনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় কল্পনার শিশুমনস্তত্ত্বজাল, সে-কারণেই বৃষ্টিধারার প্রেক্ষিতে রূপকথার আকর্ষণ আমাদের কাছে প্রবল হয়ে ওঠে। আমরা নিজেদের মধ্যেই কাল্পনিক রাজপুত্রাদির চিহ্নায়িত রূপ আবিষ্কার করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। এইসূত্রে যে ‘অসম্ভব কথা’টুকুর অনুষঙ্গ আমরা টেনে আনছি, তার আলোচনাক্ষেত্রে যথারীতি আমাদের এনে রাখতে হবে চিহ্নতাত্ত্বিকভাবে একটি বিশেষ ধাঁচের অস্থিকাঠামো— চিহ্নের এই ব্যাকরণটিকে আমরা নাম দিতে চাই: প্রত্নপ্রতীকের পুনর্গঠন। *লিপিকা*-র ‘সুয়োরানীর সাধ’, ‘রাজপুত্তুর’, ‘ভুল স্বর্গ’, ‘পরীর পরিচয়’ প্রভৃতি গল্পেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়— যেখানে একটি কোনো পরিচিত প্রতীকভাবনা (অথবা রূপক-সংকেত), যেটিকে ভেঙেচুরে নতুন পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হচ্ছে, বিশেষরকম বিকল্পায়নের মধ্য দিয়ে তাকে নতুনতর তাৎপর্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে।

‘অসম্ভব কথা’ গল্পে দেখি, গল্পের ‘আমি’ (অর্থাৎ কথকের শিশুকালীন পর্যায়) এক বর্ষার রাতে দিদিমার মুখে রাজকন্যা ও ব্রাহ্মণবালকের পরিণয়ের গল্প শুনতে শুনতে উক্ত ব্রাহ্মণবালকের সঙ্গে যেন বারবার একাত্ম হতে চেয়েছে। পাঠক/শ্রোতার এই একাত্মতার সাদৃশ্যসূত্রেই যেন রাজকন্যার পরিণয়কাহিনি শিশুহৃদয়ের অঙ্কুরিত স্বপ্নবাসনার একটি উল্লেখযোগ্য যৌনসূচক হয়ে ওঠে। সেই কারণেই সাপের ছোবল খাওয়ার পরেও গল্পের নায়ককে বেঁচে থাকতে হয়, যেহেতু নায়কের উপমেয় (signified) সেই শ্রোতা সশরীরে সমুজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। চিহ্নায়িতের এই উত্তরাধিকার-গ্রহণের মধ্য দিয়েই আখ্যানের বিনির্মাণ ঘটতে থাকে নতুন নতুন রূপে। মৃত আখ্যান পুনরুজ্জীবিত হয়। এইভাবে একে আমরা কাহিনির জন্মান্তরও বলতে পারি।

তাই "মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন ক'রে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে" (ঠাকুর: ১৩৯৬: ৩৩৯)— রাজপুত্তুরের কাহিনির ক্ষেত্রেও এই একই বার্তা প্রযুক্ত হয়। *লিপিকা*-র 'রাজপুত্তুর' গল্পেও অনুরূপ ভাবনা এইভাবেই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। গল্পের রাজপুত্তুর ও রাজকন্যার চিহ্নায়িত রূপ নানান পরিসরে নানা চেহারায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও ফুটে ওঠে। আমাদের ধুলোমাটির পৃথিবীতে, বিবর্ণ যত শহরে ও গ্রামে, পদদলিত সব ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর কুটিল জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। আলোচ্য গল্পে যে-রাজপুত্তুরকে আমরা পাই, সে "পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসাখরচ চালায়", তার "গায়ে বোতামখোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ" (৩৩৯)। এবং তার প্রতিবেশিনী যে রাজকন্যা, তারও "চাঁপাফুলের মতো রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না" (ঐ), সে গরিব বাপের একমাত্র মা-মরা মেয়ে, নববর্ষার নামহারা ফুলের সঙ্গে তুলনীয়। বাবার মৃত্যুর পর খুড়োর বাড়িতে থাকাকালীন এক প্রতিপত্তিশালী ধনী বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির করা হয়। এখানেও সুতরাং রাজপুত্তুর ও রাজকন্যার সময়োপযোগী বিনির্মাণ ঘটে এইভাবে। পরবর্তী ঘটনাক্রমেও তৎকালীন সমাজচিত্রেরই একটি কদর্য আদল ধরা পড়ে। আমরা চক্রান্তমূলক বিচারাধীনে নাগরিক জেলখানার ভেতর নিপীড়িত এক ছদ্মবেশী রাজপুত্তুরের অবয়ব যেন আবিষ্কার করতে পারি। জেলের বাইরেও তার অসহায়তা আমাদের ব্যথিত করে। সেখানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাকে এই দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র যে 'দয়াময় দেবতা', তিনি যম, যাঁর হাতে মৃত্যুর 'সোনার কাঠি'। আর দৈত্যপুরীর ভেতর বন্দিনী রাজকন্যার কথা আমরা এমনকি জানতেও পারি না। তবু, তা সত্ত্বেও, আমাদের সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ভেতর নির্যাতিতা অবদমিতা অগণিত মানবীর মধ্যে, উল্লিখিত সেই রাজকন্যাকে খুঁজে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। ঠিক যেরকম খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না ক্ষমতার চক্রান্তে নিহত নিপীড়িত পদদলিত শোষিত মানুষদের মধ্যে উল্লিখিত রাজপুত্রের রূপকল্প। কথক তাই বলেন, "ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, সে রাজপুত্তুর" (৩৪০)। আমরা আমাদের সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রূপকথা ও রোমান্সের আলোচনাপ্রসঙ্গে রূপকথার রাজপুত্রকে যে সর্বজনীন রূপক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম,

এই গল্পটি যেন বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই যুক্তিকেই আরও গভীর ও নিবিড় সুষমায় ব্যক্ত করে চলেছে।

'পরীর পরিচয়' গল্পেও আমরা এমন এক ছদ্মবেশী পরীর দেখা পাই। যার সন্ধান মিলেছিল 'রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক-সরোবরের ধারে' (পূর্বোক্ত : ৩৬৬)। মেয়েটির নাম কাজরী, পাহাড়তলির একটি প্রান্তবাসিনী কালো মেয়ে, কানে তার শিরীষফুল। সুতরাং পরীর যে বিশেষ রূপকল্পের সঙ্গে আমরা চিরপরিচিত, তাকে প্রতিস্থাপন করছে উক্ত মেয়েটির রূপ ও পরিচয়। রাজপুত্র তারই মধ্যে নিজের মানসলোকের পরীকে খুঁজছে। সেই কারণেই মেয়েটির বাহ্যরূপ ও বাহ্যপরিচয় তার মিথ্যে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সাময়িক 'ছদ্মবেশ'— তাকে সে দেখতে চাইছে কাঙ্ক্ষিত চেহারায়। কিন্তু রূপকথা প্রভৃতির প্রতিতুলনায়, কাজরীর এখানে শারীরিকভাবে তথা বাহ্যিকভাবে কোনো রূপান্তর আমরা লক্ষ করি না। রাজপুত্রের স্বপ্নচোখে যা 'ছদ্মবেশ', কাজরীর নিজের কাছে তা স্পষ্টতই 'নিজ রূপ'। সুতরাং, তাকে 'পরী' হিসেবে পেতে গেলে রাজপুত্রকেই নিজের পরী-সম্পর্কিত বাহ্যরূপের ধারণাকে বিনির্মাণ করতে হবে; রাজপুত্র শেষমেশ পেরেছেও তা। রাজপারিবারিক প্রত্যাশার জাল ছিন্ন করে পরিশেষে কাজরী চলে গিয়ে রাজপুত্রকে মনে-প্রাণে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, বাহ্যরূপে সে পরী হোক বা না-হোক, জীবনধর্মে ও চরিত্রের মর্যাদাগুণে সে পরী। বিশেষত 'পরী' বলতে আমরা কল্পকাহিনির ডানাবিশিষ্ট অলৌকিক ধরনের কোনো মানুষকে (সাধারণত নারী, কখনোসখনো পুরুষও হয়ে থাকে) বুঝি। এখানে কাজরীর পিঠে কোনো পার্থিব ডানা নেই ঠিকই— তবে রাজপুত্র ও রাজপরিবারের সুনির্দিষ্ট ধ্যানধারণা ও চাকচিক্যময় চাহিদাবৃত্তের খাঁচা থেকে নিজেকে মুক্ত করার যে স্বাধীনচেতা প্রয়াস তার মধ্যে সফলভাবে ফুটে ওঠে, তাতে তার অপার্থিব ডানা-দুটি 'সহৃদয়পাঠক'গণের অন্তর্দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এইসূত্রে আরও একটি দিক দিয়েও বিষয়টিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে পারি আমরা।— নারী হিসেবে যে 'পরী'-র রূপকল্প আমরা পাই তা এমনিতেও পুরুষতন্ত্রের বিপরীতে এক প্রদীপ্ত প্রতিবয়ান হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সে রূপ একদিকে যেমন পুরুষতন্ত্রের কামনার ধন, আবার একইসাথে পুরুষতন্ত্রের কাছে অধরাও বটে। সম্ভবত মানুষী পরিবারতন্ত্রের পার্থিব স্বর্ণপিঞ্জরে (অথবা কাষ্ঠপিঞ্জরে)

তারা কেউই গৃহিণী-আকারে বন্দিনী হয়ে থাকে না; নারী হিসেবে তারা যে একেকজন মুক্তনারী, তাদের ডানার অলৌকিকত্বই তার রূপক-সাংকেতিক প্রমাণতত্ত্ব, বলা যায়। এবং এই ধরনের যে-কোনো মুক্তনারীর ধারণাই আমাদের মতে মাতৃতান্ত্রিকতার আদিমতম অনুভবের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে। এছাড়া, জল ও জলাশয়ের সঙ্গে (আনুষঙ্গিকভাবে শস্যের সঙ্গেও) মাতৃতান্ত্রিক সমাজের স্বক্ষমতার প্রত্নস্মৃতিটুকু যে গভীরভাবে ওতপ্রোত হয়ে আছে— তা সুজিৎ চৌধুরী তাঁর *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* (২০১৬) বইটিতে নানান উল্লেখযোগ্য বিষয়ে (সাবিত্রী-সত্যবান, কার্তিকেয়, বৃহন্নলা, পরশুরাম, রেণুকা, যক্ষিণী, অপ্সরা, উর্বশী, দেবদাসী, নারী-পুরোহিত প্রভৃতি প্রসঙ্গে) গুণগ্রাহী আলোচনার সূত্রে দেখাতে চেয়েছেন। এখানে কাজরীকেও আমরা বসে থাকতে দেখি পদ্মবনের ধারে (অর্থাৎ কাম্যক-সরোবরের ধারে), তার ঘড়ায় জল ভরে নিয়ে ঘাটের ওপর; আর সে "তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্য ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে" (ঠাকুর: ১৩৯৬: ৩৬৭)। এবং তার উপস্থাপনে যৌনভীতির অভাব ("যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী", ঐ) সেইসাথে পুরুষতান্ত্রিক নারীত্ব-ভাবনার প্রকল্পকে সংশয়ান্বিত করে। বাপ-ভাইয়ের শিকারে চলে যাওয়ার তথ্যও শিকারজীবী কৌম জন-সংগঠনের প্রতীতি আনে (যদিও তার বিয়েতে 'যৌতুক' দেওয়ার পরিকল্পনা এক্ষেত্রে খানিক বিরোধাভাস তৈরি করে)। সুতরাং সামগ্রিকভাবে কাজরী মূলত পুরুষতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের উল্টোদিকে এক প্রতিস্পর্ধী ভাষ্য হিসেবে দেখা দেয়।

'ভুল স্বর্গ' নামক রচনায়, 'স্বর্গ' বলে কথিত ধারণাটিকে বিশেষভাবে বর্গায়িত করার ঝোঁক লক্ষ করা যায়। 'স্বর্গ' মূলত আমাদের কাঙ্ক্ষিত জীবনদর্শনের একটি সর্বোত্তম বা সমৃদ্ধতম পর্যায়কে চিহ্নিত করে। সুতরাং প্রত্নরূপকের খোলস ছাড়িয়ে, ভাবগতভাবে, আপেক্ষিকতার নিরিখে, এই 'স্বর্গ' পৃথক পৃথক ব্যক্তিমানুষের কাছে পৃথক পৃথক চালচিত্র নিয়ে ধরা দিতে পারে। সে-কারণেই, যে-লোকটির "স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর", যখন "দূতগুলো মার্কা ভুল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল" (পূর্বোক্ত : ৩৩৭), তখন স্বর্গের এই আপেক্ষিক বিচিত্রতার দর্শনটুকু আরও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। 'কেজো লোকের স্বর্গ'— এইরূপ চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে উক্ত স্বর্গকে যেন একপ্রকার

আর্থ-সাংস্কৃতিক আভিজাত্যবোধের সঙ্গে অন্বিত করে তোলা হয়েছে যা বুর্জোয়া উপযোগিতাবাদের আভাসে গঠিত; পক্ষান্তরে গল্পের নায়কটিকে আমরা দেখি প্রতিস্পর্ধী শিল্পীসত্তার প্রকাশ হিসেবে। সময়ের মূল্যায়নের পার্থক্যের মধ্য দিয়ে ("সময়ের মূল্য আছে" বনাম "সময় অমূল্য"— তদেব) দুই দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য সূচিত হয়। লেখকের পক্ষপাত এক্ষেত্রে সেই 'অকেজো' (শ্লেষার্থে) শিল্পীসত্তাটির প্রতি। কাহিনির শেষে তাই কেজো স্বর্গের বিপ্রতীপে আসলে প্রেম ও অবকাশের জয়ই ঘোষিত হয়েছে।

'সুয়োরানীর সাধ' লেখাটিতে দেখা যায়, দুয়োরানির জীবনের সারল্য ও সুষমাকে বাহ্যিকভাবে অনুকরণের চেষ্টায় ব্যর্থ সুয়োরানি কীভাবে নিজের সত্তার মূলবিন্দু থেকে অপসারিত হয়েছে। চরিত্রের বিপ্রতীপ সাধনায় মগ্ন ও মরিয়া হয়ে কীভাবে শেষমেশ দুঃখকেই জীবনের ধন হিসেবে পেতে চেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল: ধীরে ধীরে দুয়োরানির যাবতীয় আর্থিক সম্পদ ও সামাজিক অধিকার আত্মসাৎ করে ফেলার পরেও সুয়োরানির এ-হেন মতিভ্রম কেন দেখা গেল? চরিত্রগত এই গভীর অসন্তোষের মধ্যে নিহিত সুয়োরানির গহন সংকটকে মূলত 'অতিসম্ভোগের অবসাদ' (ঘোষ: ২০১৮: ৩৫১) বলে চিহ্নিত করা চলে। তাই রাজকীয় বিপুল বৈভব ও বৈষয়িক সুখের স্বার্থপর আতিশয্যে বুঁদ হয়ে থাকার পরেও সে তার কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি ও সহজ পরিতৃপ্তিটুকু অর্জন করতে পারেনি। আসলে শান্তি এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যা বাহ্যিক উপকরণসমূহের ওপর আংশিকভাবে নির্ভরশীল হলেও, সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল কখনোই নয়। নিরন্তর ভোগলালসা যে কখনোই আমাদের প্রকৃত সুখ বা শান্তি দিতে পারে না— পুঁজিবাদের প্রতিস্পর্ধী এই রবীন্দ্রদর্শনটুকু আলোচ্য কাহিনির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এখানে সুয়োরানির শেষতম উপলব্ধির গোপনতম উত্তাপটুকু, রূপকথাস্থিত 'সুয়োরানী'র প্রচলিত খল স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না; রূপকথার আদলকে ছাপিয়ে সে এক আধুনিকতর চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। এবং এই 'সুয়ো' আর 'দুয়ো' শব্দদুটির সঙ্গে যথাক্রমে সুখ আর দুঃখের যে ধ্বনিসাম্য (এবং ভাবসাম্য) রয়েছে, তা সুয়োরানির সামগ্রিক অতৃপ্তিতে ও সর্বোপরি অন্তিম স্বীকারোক্তিমূলক বয়ানে ("ঐ দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই", ৩৪৩) যেভাবে বিব্রত ও বিপর্যস্ত হয়, তাতে করে এই গহনকল্প বিনির্মাণের দার্শনিক তাৎপর্য পাঠকশ্রেণির কাছে উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়ে। এছাড়া আরও একটি বিষয় শৈলীগতভাবে

উল্লেখ্য: পাণ্ডুলিপির 'দুঃখের' বাঁশি যে গ্রন্থপাঠে 'বাঁশের' বাঁশিতে, আর 'সুখের' বা 'আরামের' বাঁশি যে গ্রন্থপাঠে 'সোনার' বাঁশিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাতে দ্যোতিতের প্রস্তুত থেকে দ্যোতকের অপ্রস্তুতে সরে আসায় বক্তব্যের নিহিত ব্যঞ্জনা আরও বিষণ্ণ গভীরতা লাভ করেছে— ভাবের ব্যাখ্যাধর্মিতা এক প্রচ্ছন্ন নিবিড়তায় সংহত হতে পেরেছে।

এসবের ব্যতিরেকেও রবীন্দ্রনাথের আপাত যে বস্তুগত কাহিনিকথন (বিশেষত তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'-এর গল্পসমূহের ভেতর), সেখানেও নানান রূপকব্যঞ্জনাধর্মী বয়ান ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় রয়েছে— যা সুপ্ত, যা নিঝুম প্রোথিত, পাঠকের বিনির্মাণপন্থী খননক্রিয়ায় স্বতন্ত্ররূপে অনুধাবনযোগ্য ও বিতর্কমূলক। আমরা তারই কিছু কিছু উপাত্ত বা উপকরণকে বেছে নিয়ে সাধ্যমতো বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের চেষ্টা করব, বাচনের নিহিত সম্ভাবনার দিকে ঝুঁকে থাকব দুরাশায়।

যেমন 'দুরাশা' গল্পটির কথাই ধরা যাক। নবাবদুহিতাকে অপমান-সমেত প্রত্যাখ্যান করার পর যুদ্ধাহত কেশরলাল যখন বহু কষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়ে পৌঁছাল, তখন আমরা দেখি— "সেখানে একটি খেয়ানৌকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না।" এবং তাতে উঠে 'বাঁধন' খুলে দিতেই নৌকা 'মধ্যস্রোতে' গিয়ে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল (ঠাকুর: ১৪০৫: ৩০০)। যমুনার ঘাটে এমন একটি নৌকার উপস্থিতি, যা ওই বিশেষ মুহূর্তে কোনোরকম পারাপার-ব্যবস্থারও অন্তর্ভুক্ত নয়— এখানে প্লট বা কাহিনিগ্রথনের কোনো বস্তুগত দাবিদাওয়ার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হতেও পারে, কিন্তু তার ভাবগত তাৎপর্য গল্পের গভীরে অন্বেষণ করতে চাইলে, এই ঘটনাটিকে এক রহস্যমদির স্বপ্নদৃশ্য বা 'রূপকের বাস্তবতা' বলেও মনে হওয়া সম্ভব। ভাবসাদৃশ্যে ওই আশ্চর্য নিরালা নৌকাটি যেন কেশরলালের স্বাতন্ত্র্য, একাকীত্ব, নির্লিপ্ততা ও দূরত্ববোধের দ্যোতক (ঐ) হয়ে দেখা দেয়। এর পরে আমরা দেখি, 'নিঃশব্দগম্ভীর' সমূহ বিশ্বপ্রকৃতি যখন লজ্জিতা অপমানিতা নবাবদুহিতার মৃত্যুবাসনাকে সমর্থন জোগায়, তখন 'বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত' সেই 'অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা'-ই তার জীবনের গহন প্রেরণা হয়ে ভেসে চলে। জ্যোৎস্নারজনীর স্থিতধী বিপুল গরিমার বিপরীতে 'সৌম্যসুন্দর শান্তশীতল' মৃত্যুকে প্রতিহত করছে

গতিশীল একটিমাত্র 'জীর্ণ' নৌকা— পাশাপাশি তা 'অদৃশ্য'ও বটে, কারণ তা নিজের বস্তুগত উপস্থিতিকে অতিক্রম করে যাচ্ছে, কারণ তার চলাচল মুখ্যত নবাবদুহিতার চেতনা জুড়ে, কেশরীলালের প্রশান্ত অবিচলিত নিঃসঙ্গ জীবনসাধনার চিহ্নায়ক হিসেবে; তারই বলে বলীয়ান হয়ে একটি 'জীর্ণ' নৌকাও নিবিড় শক্তিতে অটুট হয়ে ওঠে। যেন দু-পাশের 'কাশবন', 'মরুবালুকা', 'বন্ধুর বিদীর্ণ তট' কিংবা 'ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ড'— যাবতীয় কিছুকে তা পেরিয়ে যেতে থাকে কেশরীলালের নিরুদ্‌বেগ নির্লিপ্ততার রূপক হয়ে (ঐ)। তাই কেশরীলালের প্রবল বীরত্বের কথা কখনোই নায়িকাহৃদয়ে 'মুদ্রিত' হয়নি, বরং তার বদলে 'নিস্তব্ধ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী' কেশরলালের ছবিই তার স্মৃতিতে আঁকা হয়ে থেকেছে (৩০২); বীর হিসেবে নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ এক 'নির্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ' হিসেবেই কেশরীলাল সেই নিবেদিতা নারীর পুজো লাভ করেছে দীর্ঘকাল।

এ ছাড়া গল্পটি থেকে আরও দুটি উদাহরণ দাখিল করা যায়, যদিও সেগুলিকে ততখানি উল্লেখযোগ্য বলে দাবি করছি না। একটি যথা— 'সামান্য বাষ্পের মেঘে' অন্তরাল হয়ে-যাওয়া বিশালকায় 'প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়' পরোক্ষে নবাবপুত্রীরই হৃতগৌরবের একপ্রকার রূপকাতিশয়োক্তি (সামগ্রিকভাবে অলংকারগুণে 'প্রতিবস্তুপমা' অথবা 'দৃষ্টান্ত'; 'দৃষ্টান্ত'ই সম্ভবত) হয়ে ওঠে যেন। অন্যটি— গল্পের শেষাংশে নায়িকার জবানিতে "শেষ কথা অতি অল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়, সে কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কী ব্যাখ্যা করিব" (ঐ)। সুতরাং 'অতি স্বল্প' এই 'শেষ কথা'-র মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রদীপ-নির্বাপণের সারমর্ম। কিন্তু কীসের প্রদীপ? তার প্রেমের প্রদীপ? প্রত্যাশার প্রদীপ? নাকি তার আশ্রয়মূলক পরমার্থবোধের প্রজ্বলিত শিখা? অথবা সম্মিলিতভাবে এই সবকিছুরই রূপক হিসেবে প্রযুক্ত হচ্ছে এই প্রথাগত উপমান (কিংবা অলংকারগুণে জটিলতর 'দৃষ্টান্ত')। এখানে এই তুলনাটি নিছকই একটি প্রবাদ, কেবলই একটি বিশেষ বাকভঙ্গি— গল্পের ভাববস্তুর সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; পক্ষান্তরে, যেভাবে সম্পর্কযুক্ত কেশরলালের সেই বিশেষ নৌকা (অথবা এমনকি, কুয়াশাচ্ছন্ন হিমালয়ের পরিবেশটুকুও)।

নতুবা, যেভাবে সম্পর্কযুক্ত 'জীবিত ও মৃত' গল্পের সেই প্রদীপ-নেভার দৃশ্যটুকু। কাদম্বিনীকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত অস্বস্তি অথবা রহস্যময়তা কিংবা অস্ফুট সংশয়ের রূপরেখা একসময় বিস্ফোরণের চূড়ান্ত বিন্দুতে গিয়ে ঠেকে যায়, যখন শ্রীপতি কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়ির এলাকায় তার বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে অনিবার্য তথ্যবিভ্রান্তির মুখোমুখি হয়। তারপর জীবিত কাদম্বিনীর প্রেতযোনিত্ব সম্পর্কে তাদের দ্বিধাকম্পিত ধারণা একটি আমূল দৃঢ়বিশ্বাসে রূপান্তরিত হওয়ার সন্ধিক্ষণে তাদের "ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস্ করিয়া নিবিয়া গেল" ও তার ফলস্বরূপ "বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল" (পূর্বোক্ত : ৮৯)। উপরোক্ত বর্ণনাটুকু এখানেও উদ্দীপন বিভাব হিসেবেই প্রধানত প্রযুক্ত হয়েছে। তবু আমরা নিছক স্বভাবদোষে এই উপস্থাপনার রূপক-সারবস্তু অবধি অনুধাবন করতে উৎসাহী। গল্পসূত্রে আমরা জানি, কাদম্বিনীর অদ্ভুত আচরণ বা কথাবার্তায় শ্রীপতি ও যোগমায়া মৃদুমন্দ বিব্রত বা সন্দিগ্ধ বোধ করলেও, তার প্রেতযোনিত্ব সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার উঁকি দেয়নি, ইতোপূর্বে তাকে তারা মানবী হিসেবেই দেখেছে। কিন্তু কাদম্বরীর মৃত্যুর খবর শুনে আসার পর— 'বাহিরের' তথা আমদানিকৃত সেই ভ্রান্তপাঠ বা অজ্ঞানতাই (অর্থাৎ অন্ধকার) তাদের চেতনা অথবা চিন্তাভাবনার পরিসরটিকে (অর্থাৎ ঘরটিকে) ভরে তুলল, আমরা এভাবেও ভাবতে পারি। আর এই অন্ধকার তথা অজ্ঞানতার প্রতিতুলনায় যে প্রদীপ ছিল প্রজ্বলিত, তা যেন এক্ষেত্রে গৃহস্থের যথাবিহিত জ্ঞান কিংবা সত্যোপলব্ধিরই সূচক; আর ঘরে-ঢুকে-আসা 'বাদলার বাতাস', যার অভিঘাতে সেই প্রদীপটুকু 'ফস্' করে নিভে গেল, তা স্পষ্টতই সেই দুর্যোগের বা দুঃসংবাদের আকস্মিকতাকে দ্যোতিত করে।

সেইসাথে যেমন 'পোস্টমাস্টার' গল্পেও, রতন আর পোস্টমাস্টারের আসন্ন বিচ্ছেদের মাঝামাঝি উদ্‌বেগ আর নীরবতার প্রেক্ষাপটে 'মিট্‌মিট্' করে প্রদীপ জ্বলতে দেখেছি; যদিও এই প্রদীপ-প্রজ্বলনের নির্দিষ্ট কোনো তাৎপর্য যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। এছাড়া গল্পের শুরুর দিকেও রতনের অপেক্ষার প্রেক্ষাপটে আমরা একটি 'ক্ষীণশিখা' প্রদীপের দেখা পাই— যা তপোব্রত ঘোষের মতে 'রতনের অন্তর্লোকেরই

সাংকেতিক রূপকল্প' (৫৫)। কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যাটুকু মেনে নেওয়ার বিষয়ে খানিক দ্বিধান্বিত। ঠিক যে, রতনও সেই মুহূর্তে (হয়তো ক্ষীণ আশা নিয়েই) পোস্টমাস্টারের ডাকের জন্য অপেক্ষা করে থাকত; তা সত্ত্বেও, যেহেতু 'ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া' পোস্টমাস্টারই রতনকে ডাকত (ঠাকুর: ১৪০৫: ১৬), সেই হিসেবে ওই ক্ষীণশিখা প্রদীপটিকে আরও বেশি করে পোস্টমাস্টারের অন্তর্লোকের সাংকেতিক রূপকল্প বলেই আমাদের মনে হয়। কলকাতার ছেলে হয়ে ওইরূপ গ্রাম্য পরিবেশে প্রবাসযাপনের দরুন পোস্টমাস্টারের যে মনোবেদনা, যে বিষণ্ণতা কিংবা অবসাদের ভাব— সেটিই, অর্থাৎ এককথায় তার হৃদয়ের সেই উৎসাহ বা উদ্দীপনার ক্ষীণদীপ্তিই ওই প্রদীপশিখার রূপকে দ্যোতিত হচ্ছে। বরং পরবর্তীতে পোস্টমাস্টারের বাড়ি চলে যাওয়ার খবরে, আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনার প্রেক্ষিতে, 'ক্ষীণ আশা' ইত্যাদির মায়াটানে, প্রাগুক্ত সেই 'মিট্ মিট্' করে জ্বলা প্রদীপ একার্থে রতনের অন্তর্লোকের (কিংবা হয়তো উভয়েরই, বা এমনকি উভয়ের মধ্যবর্তী ভাবপরিমণ্ডলেরও) রূপক হয়ে-ওঠার সম্ভাবনাযুক্ত, বলা যায়।

এ-ছাড়া 'পোস্টমাস্টার' গল্পটির শেষাংশে যে নদী ও নৌকার প্রসঙ্গটুকু রয়েছে, তাও আমাদের ভাবনাকে প্ররোচিত করে। সমালোচক তপোব্রত ঘোষের ব্যাখ্যায় 'নদীকূলের শ্মশান' মৃত্যুর 'সিদ্ধ রূপকল্প' হওয়ার পাশাপাশি 'খরতর বেগে' বয়ে-যাওয়া বর্ষার নদীস্রোত আসলে রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যুর 'সৃষ্ট রূপকল্প' (৫৮)। এই ব্যাখ্যাটুকু মেনে নিয়েও, আমরা আরেকটু ভিন্নভাবে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। আমরা এখানে নদীকে মৃত্যুর পরিবর্তে জীবনেরই দ্যোতক হিসেবে দেখতে ইচ্ছুক। জীবনদায়িনী হিসেবে নদী একার্থে জীবনের নির্দেশক তো বটেই (যদিও এক্ষেত্রে বর্ষার নদীর 'খরতর' ক্ষতিকারক বেগবানতা এই ব্যঞ্জনাকে বিব্রত করে), অপিচ আমাদের যুক্তিতে নদীর বয়ে-চলা জলস্রোত আসলে বহমান জীবন তথা জীবনপ্রবাহেরই রূপক, অন্তত এই প্রেক্ষিতটুকুর নিরিখে। এমনকি, তপোব্রতবাবু এই গল্পের 'পুনরাবৃত্ত মাছের ইমেজ' নিয়ে যে অভিনব টিপ্পনীটুকু (interpretation) যোগ করেছেন (৫৮), তার নিরিখেও, নদীর জলপ্রবাহকে জীবনপ্রবাহেরই রূপক বলা যায়। শুরুতে যেহেতু 'ডাঙায়-তোলা-জলের-মাছ' প্রতিকূল গ্রামীণ পরিবেশে কলকাতানিবাসী যুবকের দুরবস্থাকেই দ্যোতিত করছে, তাই জলের উল্লেখে আসলে জলের বহমানতার বিষয়টিও

প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যে-বহমানতা আসলে পোস্টমাস্টারের চোখে নগরজীবনের বহমানতারই রূপক, যার প্রতিতুলনায় গ্রামজীবন যেন স্থির ডাঙা কিংবা বড়োজোর একটি আবদ্ধ জলাশয় ("একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল"— পৃ. ১৬)। এ-ছাড়া 'নদীপ্রবাহে ভাসমান' কথাটির মধ্যেও যে মাছের রূপক (সমাসোক্তি) অনুক্ত রয়েছে (ঘোষ: ২০১৮: ৫৮), তাও পোস্টমাস্টারের জীবনের স্রোতে ফিরে যাওয়াকেই ব্যঞ্জিত করে (যে-জীবনস্রোত সেই শান্ত শীতল গ্রামটুকুর তুলনায় ঢেরগুণে 'খরতর', অর্থাৎ যার প্রাণোচ্ছলতা প্রখররূপে সক্রিয় ও নির্মম), তার মৃত্যুস্রোতে হারিয়ে-যাওয়াকে নয় (অবশ্য রতনের অবস্থানবৃত্ত থেকে দেখলে পোস্টমাস্টারের এইরকমভাবে 'রৈখিক' ভেসে-যাওয়াকে মৃত্যুর সমতুল মনে করা যেতে পারে)। অর্থাৎ এককথায় জলের মাছ যেন শেষমেশ জলেই ফিরে গেল। পাশাপাশি, পোস্টমাস্টারের ব্যক্তিসত্তা আবার নৌকার রূপকেও উপস্থাপিত হয়েছে, পালে বাতাস পাওয়ার মধ্য দিয়ে পথিকহৃদয়ে চলার উৎসাহ তথা গতিপ্রাণতা সঞ্চারিত হওয়ার কথাই ব্যক্ত, যা ওই বর্ষানদীর খরতর বেগের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হবে। এই মর্মে আমরা 'নদীকূলের শ্মশান' চিত্রকল্পটিকেও বুঝে নিতে চাইব। আমাদের সংস্কৃতিতে 'শ্মশান' মৃত্যুর খুব স্পষ্ট ও প্রচলিত একটি চিহ্ন। শ্মশানকে সাধারণভাবে আমরা মৃত্যুর নির্দেশকই (metonymy) বলব, কারণ তা লোকাচারসূত্রে মৃত্যুর অনুষঙ্গ বহন করে। সুতরাং নদীর পাশে শ্মশান— আমাদের মতে, উচ্ছল বহমান জীবনের পাশে মৃত্যুর একটি স্থিত বিষাদবেদনাময় ছেদ (metaphor-এর পাশে metonymy)। তবে সেই 'মৃত্যু' যদি হয় রতন ও পোস্টমাস্টারের অন্তিম বিচ্ছেদ তথা সম্পর্কের পরিসমাপ্তির সূচক, সেক্ষেত্রে 'শ্মশান' চিহ্নটি metonymy-র সীমা অতিক্রম করে metaphor হয়ে-ওঠার দিকে তুমুল এগিয়ে যায়।

'মহামায়া' গল্পটিও শুরু হচ্ছে নদীর ধারে— একটি ভাঙা মন্দিরে। এইরকম একটি প্রেক্ষাপটে গল্পের যে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ হয়, দেখা যায় তাদের সম্পর্কের সংকট-পরিস্থিতিই গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য। তাই গল্পের শুরুতেই লেখক যে দৃশ্যপট নির্বাচন করেছেন, তাকে গভীরভাবে গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর সাপেক্ষে যথেষ্ট মানানসই-ই বলা চলে। কার্যত রবীন্দ্রনাথের লিখনরীতির এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যায় যে, প্রকৃতিকে উদ্দীপন-বিভাব হিসেবে তিনি বরাবরই আখ্যানের ভাববস্তুর

সঙ্গে জুড়ে নিতে চান; আর সেই সূত্রে, বর্ণিত প্রাকৃতিক উপাদানগুলি বারবারই কাহিনির মূল বয়ানের পরিপূরক হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে নিরন্তর রূপক-সম্ভাবনাময়। যেমন মধ্যাহ্নের 'অলস আকস্মিক' যে কতকগুলি করুণধ্বনির কথা বলা হয়েছে (পূর্বোক্ত : ১২৭) সেগুলির সম্মিলিত একঘেয়েমি রাজীব ও মহামায়ার মধ্যস্থিত নীরবতাকে অথবা রাজীবের প্রেমিক-মনের অপেক্ষা ও উদ্‌বেগকে আরও যে প্রকট ও অস্বস্তিকর করে তোলে, এখানে উদ্দীপন-বিভাব হিসেবে উপাদানগুলির সেই ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু একইসাথে এরই মধ্যে কিছু কিছু চিত্রকল্পের গুরুত্ব আরও একটু পৃথকভাবে আবিষ্কার করা চলে। বাতাসের ধাক্কায় ধীরে ধীরে 'মৃদুমন্দ আর্তস্বর-সহকারে' খোলা-বন্ধ হতে-থাকা 'মন্দিরের অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট' কার্যকরী রূপক আকারে তাদের প্রণয়সম্পর্কের শিথিল ভগ্নরূপ দুর্দশাকেই দ্যোতিত করে। অপিচ 'ভাঙা ঘাটের সোপান'ও তা-ই। আর হঠাৎ জেগে উঠে সেই সোপানের ওপর 'ছলাৎ ছলাৎ' করে ছন্দোবদ্ধ আঘাত করতে-থাকা 'নদীর জল', জীবনের প্রাণোচ্ছল মাধুর্যপূর্ণ আহ্বানের বার্তাই বুঝি প্রকাশ করতে চায়। তাই রাজীব যখন মন্দিরের ভিত্তির গায়ে ঠেস দিয়ে 'একপ্রকার শান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মতো' নদীর দিকে চেয়ে থাকে (ঐ), সে আসলে ভগ্নপ্রায় প্রেমের অবসন্ন উদ্‌বেগময়তার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে মহামায়ার অনিচ্ছুকতার বাস্তব থেকে চোখ সরিয়ে জীবনস্বপ্নের প্রাণোচ্ছল মায়ামদির ছন্দোময়তার দিকে তার কল্পদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। অথবা অন্যভাবে দেখলে, উক্ত ভাঙা ঘাট বা মন্দিরের ভাঙা কবাট মহামায়ার কুলীন পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু বংশমর্যাদার চিহ্নায়ক, আর বাতাস কিংবা নদীর জল রাজীবের এই কোমল কাকুতিপূর্ণ প্রচেষ্টাকেই ব্যঞ্জিত করছে।

গল্পটির দ্বিতীয় দৃশ্যপট হিসেবে উঠে আসছে শ্মশানের ছবি, কিন্তু এইসংক্রান্ত অতিব্যাখ্যায় আমরা ঢুকব না। বরং মহামায়া সহমৃতা হতে যাওয়ার লগ্নে, লেখকের ইচ্ছায়, সন্ধের সময় যে 'মুষলধারের বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয় ঝড়' (১২৮) দেখা দিল— তা কিঞ্চিৎ আলোচনাযোগ্য। গল্পের ঘটনাক্রমের ওপর একপ্রকার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা ছাড়াও, এই ঝড়বৃষ্টির আরও যদি কোনো বিশেষ তাৎপর্য থেকে থাকে, তাও অনেকখানিই গল্পকথকের বয়ান থেকেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সেইক্ষণে আত্মহত্যা করতে উদ্যত রাজীবলোচন "যখন দেখিল বাহ্য প্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ

একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল।" (ঐ) অর্থাৎ সেই ঝড় গল্পের নায়কের মানস-পরিস্থিতিরই দোসর। কিন্তু এর সঙ্গে এই ঝড়ের আরও অনুল্লিখিত তাৎপর্যও যুক্ত হয়ে পড়ে। আমরা দেখি, এরপর নায়ক-নায়িকা যখন লোকালয় ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন তারা সেই ঝড়ের মধ্যে পড়ে। কথক যখন বলেন, "এমনি ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন— ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটা গুলির মতো গায়ে বিঁধিতে লাগিল" (১২৯), তখন 'ঝড়' আর কেবলমাত্র রাজীবলোচনের অন্তর্লোকের রূপক হয়ে থাকে না, প্রতিকূল বাহ্যপরিস্থিতিরও রূপক হয়ে ওঠে— যে প্রতিকূল বাহ্যপরিস্থিতি হয়তো তৈরি হয়েছে কার্যত তাদের সমাজনীতি-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণেই। উড়ন্ত কাঁকর যেন সমাজের শতসহস্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ আক্রমণের সমষ্টিকেই রূপকান্বিত করে। এ-ছাড়া মাথার ওপর গাছ ভেঙে পড়ার ভয়ে তারা যে প্রচলিত পথটুকু পরিত্যাগ করে, সেই মাথার ওপর গাছ ভেঙে পড়ার রূপকও যেন-বা সমাজের তরফ থেকে নেমে-আসা সম্ভাব্য কোনো বড়োসড়ো মারাত্মক আঘাতের কথাই বলতে চায়। আর তাই পথ ছেড়ে যে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে তারা চলতে থাকে, সেই খোলা মাঠও তাদের সমাজজীবনের সহায়সম্বলহীনতাকেই সূচিত করে। সর্বোপরি 'বায়ুর বেগ' যেভাবে তাদেরকে পিছনদিক থেকে আঘাত করে, আর সামগ্রিকভাবে ঝড়ের প্রকোপ যে তাদেরকে লোকালয় থেকে 'ছিন্ন' করে প্রলয়ের দিয়ে নিয়ে যায় (ঐ), তার মধ্য দিয়ে আসলে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চাপে লোকালয় থেকে তাদের বিতাড়িত হওয়ার ছবিই ফুটে ওঠে।

এরপর আমরা দেখি নায়ক-নায়িকার সম্পর্কের সংকটকে আরও বেশি ঘনীভূত করে তোলে একটি ঘোমাটার আচ্ছাদন। সেই সন্ধ্যা থেকেই এই ঘোমটা মহামায়ার মুখকে রাজীবের থেকে গোপন রাখে একটি রহস্যময় শর্তের কঠোরতায়; এবং এই ঘোমটার আবির্ভাবের হেতু গল্পের যুক্তিতে— চিতার আগুনে মহামায়ার মুখ পুড়ে যাওয়া (এমনকি এই মুখ পুড়ে যাওয়াও অনেকসময় ব্যঙ্গার্থে কারো বদনাম হওয়া কিংবা বিশেষ করে কোনো নারীর ক্ষেত্রে চরিত্র কলুষিত হওয়াও বোঝায়; মহামায়ার ক্ষেত্রেও যদি আমরা সেইরকম কিছু অর্থে বিষয়টি বুঝে নিতে চাই, তাহলে তার চরিত্র কলুষিত হওয়ার কী কারণ আমরা অনুমান করব? সহমরণে বিঘ্ন অর্থাৎ মৃত পতির সহগামিনী

হতে না-পারা? নাকি একজন কুলীন বিধবা হয়ে অকুলীন পূর্বপ্রেমিক তথা পরপুরুষের কাছে গমন করা?)। যদিও গল্পপাঠে আমরা বুঝি, এই 'ঘোমটা' কেবল মহামায়ার মুখের আবরণ আকারেই নয়, তার ব্যক্তিত্বের আবরণ হিসেবেও আগাগোড়া উপস্থিত ছিল, যা ভেদ করে রাজীব কখনো প্রকৃতই তার কাছ অবধি পৌঁছাতে পারেনি।

এরপর যখন একদিন বর্ষাকালে 'শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে' প্রথম মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ দেখা দিল, তখন রাজীব দেখল, "অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মতো" ঝকঝক করছে (১৩০)। মেঘ কেটে যাওয়ার মধ্যে সম্পর্কের মধ্যকার সেই রহস্যময় ব্যবধান ঘুচে যাওয়ার আশাই হয়তো-বা ব্যঞ্জিত, আর ঝকঝকে শান্ত সরোবর সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনাকেই যেন সূচিত করে, অন্তত রাজীবের মনোবাসনার রূপকভাষ্য অনুযায়ী। সেই হিসেবে আবার সেই 'মার্জিত রূপার পাতের মতো' ঝকঝকে সরোবর রাজীবের প্রেমিকহৃদয়ের উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষারও দ্যোতক। এই দ্বিবিধ পরস্পরসংলগ্ন ব্যাখ্যার পরেও আরও একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত, যা কিনা গল্পের মধ্যেই মজুত রয়েছে— "আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর ও সুগম্ভীর দেখাইতেছে।" (ঐ) এইভাবে স্মরণোপমার মধ্য দিয়ে আলোচ্য সেই জ্যোৎস্নারাত্রি রাজীবের মনে মহামায়ার সেই পুরাতন রূপটিকেই জাগিয়ে তোলে (পাশাপাশি সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে, বনের 'গন্ধোচ্ছ্বাস' ও রাত্রির 'ঝিল্লিধ্বনি' আবার রাজীবের মনের অবস্থাকেও উপমিত করে)। সুতরাং সব মিলিয়ে, বর্ণিত সেই বিশেষ রাত্রির নিহিত রূপকধর্মিতাই রাজীবের মনে মহামায়ার প্রতি আকর্ষণকে খুঁচিয়ে তুলে, তার জীবনের গল্পকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। গল্পটি শেষ হয় আরেকটি মোক্ষম তুলনার মধ্য দিয়ে: ক্ষমাহীন চিতার আগুন যেমন মহামায়ার বাম গালে দগ্ধচিহ্ন রেখে গেছে, মহামায়ার নীরব ক্ষমাহীন ক্রোধের আগুন তেমন রাজীবের গোটা ইহজীবনে দগ্ধচিহ্ন রেখে গেল। অর্থাৎ প্রথমটির দ্যোতনাই দ্বিতীয়টিতে আরোপিত— এইভাবে মহামায়ার জীবনের ট্রাজেডি যেন রাজীবের জীবনের ট্রাজেডিরই সাঙ্গ-রূপক হয়ে বেঁচে থাকে, অথবা উল্টোদিক থেকে বললে, রাজীবের জীবনের ট্রাজেডি যেন

মহামায়ার জীবনের ট্রাজেডিরই ব্যঙ্গ্যার্থ হয়ে রয়ে যায়। বিচ্ছেদের মধ্যে এইটুকুই যা মিলন।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পেও আমরা পাচ্ছি নৌকা ও নদীস্রোতের প্রসঙ্গ। গ্রামে গিরিবালার বিয়ের দিন শশীভূষণের নৌকাও যখন কলকাতার দিকে যাচ্ছিল, তখন আমরা দেখি, "প্রতিকূল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেইজন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।" (২০১) এখানেও নৌকা যদি নায়কের ব্যক্তিজীবনের গতিজাড্যকেই দ্যোতিত করে, স্রোতের আনুকূল্য তাহলে তার গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার সামাজিক বাধাবিপত্তিহীনতার ব্যঞ্জনা বহন করছে (যেহেতু তার যাওয়ার পক্ষেই নায়েবের বলপ্রয়োগ বা ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল এবং সে নিজেও একজন স্বাধীন শিক্ষিত যুবক), পক্ষান্তরে বেগবান প্রতিকূল বাতাস হয়তো গিরিবালার জন্য তার হৃদয়ের তথা গভীর মনের প্রবল পিছুটান হয়েই প্রকাশ পাচ্ছে (গল্পের পূর্বপরিচ্ছেদে তারই উল্লেখ প্রাপ্ত)। এরপর আখ্যানের বস্তুগত পাঠেও আমরা দেখি এই প্রতিকূল বাতাসের কুপ্রভাব পরোক্ষে একটি দুর্ঘটনাকে ডেকে আনে (যার মধ্যে উঠতি আদর্শনিষ্ঠ দুঃসাহসী উকিল হিসেবে শশীভূষণও জড়িয়ে পড়ে), আর তার লম্বাটে ফলশ্রুতি অনুযায়ী যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায় শশীভূষণকে আবার গ্রামে ফিরে আসতে হয়। তাতে করে বিদায়কালীন গিরিবালার একঝলক দর্শনও সে লাভ করে ফেলে। বুঝি-বা এভাবেই বয়ানের ব্যঞ্জনাগত বীজাণু ও বস্তুময়তা একইসাথে ওতপ্রোত হয়ে পড়ে। আরও দেখা যায়, ওকালতির ক্ষেত্রে তার প্রতিবাদী চেতনা দ্বিতীয়বার ধাক্কা খেয়েছিল যেহেতু, এবং গিরিবালার বিচ্ছেদবেদনা তার জীবনকে আবেগগতভাবে করে তুলেছিল আরও বেশি উদ্‌ভ্রান্ত আর নির্জন, ফলাফলে তার উদ্দেশ্যহীন পরবর্তী কলকাতাযাত্রার সময় আমরা দেখি তার নৌকা চলতে থাকে 'সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের' মধ্য দিয়ে (প্রধান যুক্তি পূর্ণবর্ষায় বাংলাদেশের প্রকৃতি, বিকল্প যুক্তি শশীভূষণের ভাবী জীবনপ্রবাহের বিবর্তিত কুটিল বক্রতা— আমরা দেখি, তখনই আরও একবার তার প্রতিবাদী চেতনা উদ্ভটভাবে সংকটের মুখোমুখি পড়ে)।

এ-ছাড়া অল্পস্বল্প কিছু আলংকারিক অনুষঙ্গ রয়েছে; যেমন— শশীভূষণের ওপর অভিমান করে[১] একবার গিরিবালা যখন পথপ্রান্তে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, তখন

তার আগের বাক্যে আকাশে মেঘ করার কথা বলা হয়েছে (২০০), তাই এক্ষেত্রেও বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে নায়িকার মনের অবস্থাকে মিলিয়ে দিতে চাইছেন কথক, বর্ষাকালে মেঘ করার আপাততুচ্ছতা ও বালিকার কান্নার আপাততুচ্ছতা এক হয়ে 'metaphor' (দৃষ্টান্ত অলংকার) গঠন করছে; আকাশের মেঘ হয়ে উঠছে গিরিবালার মনের বাষ্পজমাট বেদনাপুঞ্জের রূপক। সর্বোপরি শেষ দৃশ্যে, গিরিবালা ও শশীভূষণের অশ্রুব্যাকুল নীরবতার প্রেক্ষাপটে (২০৮) শশীভূষণের মনের অনুচ্চারিত বয়ান কীর্তনগানের পুনরাবৃত্ত উচ্চারণের সূত্রে ('এসো এসো হে') মিলে যাওয়ার মধ্যেই গল্পটির সমাপ্তি।

'সমাপ্তি' গল্পটির সূচনাও একপ্রকার নদীর চিত্রকল্প আর সেই নদীকে উপমান হিসেবে ব্যবহার করে নায়কের মনের অবস্থাকে ('মানস-নদী') উপমিত ও ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে (ঠাকুর: ১৪০৫: ১৬৪)। কিন্তু আমাদের নজর এখানে বিশেষ একটি চিহ্নের ওপর, যার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা কারো কারো কাছে যথেষ্ট বিতর্কিতও মনে হতে পারে। সে হল অপূর্বের সঙ্গে মৃণ্ময়ীর সাক্ষাতের প্রথম ক্ষণটুকু, যখন অপূর্ব তীরের কাদায় পা পিছলে পড়ে গেল, আর মহাজনী নৌকা থেকে নামিয়ে-রাখা নতুন ইটের স্তূপের ওপর বসে মৃণ্ময়ী উচ্চগ্রামে হেসে উঠল। আমরা এই তারতম্যটুকুর প্রতি মনোযোগ দিতে চাই। আমরা সকলেই মোটামুটি জানি যে, পা পিছলে পড়া রূপকার্থে চরিত্রের দার্ঢ্যগুণ থেকে চ্যুত হওয়া বা প্রেমের ক্ষেত্রে কারো প্রতি যৌন-দুর্বলতা জাগরিত হওয়াকে বোঝায়; বস্তুত নৈতিক পতন অর্থে 'পদস্খলন' (গল্পেও ব্যবহৃত, তবে আক্ষরিক অর্থে) কথাটি অতিব্যবহারে জীর্ণ হতে হতে নিজের রূপকত্ব প্রায় হারিয়ে ফেলতে বসেছে ('dead metaphor')। আমরা জেনেছি, মৃণ্ময়ীর মুখের প্রতি মৃদু একটি মুগ্ধতা অপূর্বের মনে পূর্ব থেকেই ছিল। সেহেতু অপূর্বের পক্ষে মৃণ্ময়ীর প্রতি আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনাটুকু, পূর্বোল্লিখিত সেই নদীটির (একইসাথে যা কিনা আবার অপূর্বের পরিপূর্ণ যৌবনদীপ্ত হৃদয়বাসনারও উপমান) তীরের পিচ্ছিলতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। যদিও পতনের পর মৃণ্ময়ীকে না দেখে, পতনের অব্যবহিত পূর্বে তাকে দেখলে এই রূপকার্থ আরও বেশি নিরঙ্কুশ হত; তবু তার সম্ভাবনাময় ইশারাটুকুও এখানে কম কথা নয়। প্রতিতুলনায় ওই মুহূর্তে মৃণ্ময়ীর আসনটি ('ইষ্টকশিখর') যদি আমরা দেখি, তাহলে তার

অবস্থানগত পার্থক্য আমাদের কাছে প্রকট হয়। তাই কথক যতই বলুন যে ওই "ইঁটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে" (১৬৫), আমরা কিন্তু মৃণ্ময়ীর ওই 'শুষ্ক কঠিন আসনের' তাৎপর্য অনুধাবনে যারপরনাই উৎসাহী। আমাদের বক্তব্য, গল্পের অন্তর্নিহিত যুক্তিতে উভয়ের এই অবস্থানগত উপস্থাপনার সঙ্গে তাদের আবেগবিহ্বলতার মাত্রাগত কিছু সাদৃশ্যযোগ রয়েছে। অপূর্বের পাদভূমি যেখানে পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত (সোজা কথায়, মৃণ্ময়ীর প্রেমে পড়ে অপূর্বের ব্যক্তিমর্যাদা কলুষিত হয়েছিল, "এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ"— পৃ. ১৬৮), মৃণ্ময়ীর 'আসন' সেখানে অটল ও আভিজাত্যপূর্ণ ('মহাজনী' নৌকা থেকে নামানো 'রাশীকৃত' ইট দিয়ে নির্মিত)। তার মনের মধ্যে স্থান লাভ করতে অপূর্বের লেগেছে সুদীর্ঘ সময়। রুপোর কাঠি ('হাস্য') ও সোনার কাঠির ('অশ্রুজল') পুনর্পঠিত প্রত্নরূপকে অপূর্বের সেই প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার সারমর্ম ব্যক্ত।

'নিশীথে' গল্পটি ব্যঞ্জনার মাত্রাগুণে গভীরতার মাপকাঠিতে আমাদের চিহ্নসংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য তপোব্রতবাবু এই গল্পের নিবিড়তর পাঠের মধ্য দিয়ে যাবতীয় চিত্রকল্পের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, তার সাপেক্ষে গল্পটির চিহ্ন নিয়ে নতুন করে কিছু পর্যালোচনা করাই যদিও ধৃষ্টতা, তবু আমরা নিজেদের মতো করে কিছু কিছু প্রসঙ্গের পাঠ নেওয়ার এখানে চেষ্টা করব। গল্পটির মধ্যে কথকসত্তার পর্যায়ভেদ রয়েছে, ধাঁচ যেহেতু গল্পের মধ্যে গল্প, তাই কথকও আসলে দুজন— একজন প্রত্যক্ষ কথক, আরেকজন পরোক্ষ। প্রথম কথক একজন মনের ডাক্তার (psychiatrist) যার কাছে অর্ধেক রাত্রে দ্বিতীয় তথা পরোক্ষ কথক অসুস্থ (patient) দক্ষিণাচরণবাবুর আগমন ঘটে। রোগীর অস্থির অনুযোগের প্রত্যুত্তরে ডাক্তার যখন মদ্যপানের পাল্টা অনুযোগ এনে তাঁকে খানিক খুঁচিয়ে তোলেন, তিনি তখন নিজের জীবনের 'উপদ্রব' সম্পর্কে 'আদ্যোপ্রান্ত বিবরণ' ও নিজের মানসিক উচাটনের 'আসল কারণ' বিষয়ে আভাস দিতে উদ্যত হন। তখন কথক ডাক্তার বলেন, "কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল।" (পূর্বোক্ত : ২২৩) 'ক্ষুদ্র টিনের ডিবা' এখানে রোগীর অন্তঃকরণকেই চিহ্নিত করে, আর 'ম্লানভাবে' জ্বলা কেরোসিন তাঁর জীবনসত্যের নিগূঢ় বয়ানের কথা বলে।

মদ্যপানের খোঁচা দিয়ে ডাক্তার সেটিকে উস্কে তোলার ফলে 'একটুখানি আলো' জেগে ওঠে অর্থাৎ নির্জ্ঞানের সেই নিগূঢ়তা অল্পস্বল্প উদ্‌ঘাটিত হয়, আর 'অনেকখানি ধোঁয়া' বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে অনুক্ত সম্ভাবনার আরও নানারকম কুটিল আভাসও ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। এরপরেও, হাওয়াবদলের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে এলাহাবাদে যাওয়ার কাহিনিপ্রসঙ্গে এসে দক্ষিণাচরণবাবু যখন বিরতি নিয়ে 'সন্দিগ্ধভাবে' ডাক্তারের দিকে চেয়ে কিছু ভাবতে লাগলেন, তখন "কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিটমিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্ ভন্ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।" (২২৫) কেরোসিনের ওই প্রজ্বলন রোগীর গহনলোকের সেই ভাবালোক হিসেবেই আবারও ব্যক্ত, সেইসাথে 'নিস্তব্ধ ঘরে' (নির্জ্ঞানের সেই নিস্তব্ধ পরিসরে?) মশার ভনভন শব্দ নানাবিধ অস্ফুট অস্বস্তিকর সম্ভাবনার গুঞ্জন হিসেবে স্পষ্টতা লাভ করতে শুরু করে। কারণ এলাহাবাদে যাওয়ার পর থেকে কাহিনির অব্যক্ত কুটিলতা প্রকৃতই ফুটে উঠতে শুরু করে, আর সেই 'বায়ুপরিবর্তন' যেন শ্লেষার্থে দক্ষিণাচরণের জীবনেরই বায়ুপরিবর্তন। এরপর গল্পের প্রেক্ষাপটে হারান ডাক্তার ও হারান ডাক্তারের কন্যা মনোরমা (নামটিও সুনির্বাচিত)— উভয়ের প্রবেশ। এছাড়া দক্ষিণাচরণের বক্তব্যের মধ্যেও একবার কেরোসিনের আলোর উল্লেখ পাই। সেখানেও কেরোসিনের আলো তাঁর অন্তরলোকের প্রচ্ছন্ন বাসনার প্রজ্বলিত শিখা হিসেবে পাঠযোগ্য। স্ত্রীর অসুখের তীব্রতর বেদনার ক্ষণে শয্যাপ্রান্তে যখন তিনি চুপ করে বসে ছিলেন, তখন "চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল" (২২৭), অর্থাৎ পাছে অসুস্থ স্ত্রীর হৃদয়ে আক্ষেপ অনুশোচনা কিংবা অভিমান জাগরিত হয়, তাই সেই প্রেমের প্রজ্বলিত বাসনাকে তাঁর চোখ থেকে আড়াল রাখা হয় (এমনকি দরজার পাশে তা রাখার মধ্যে নতুন কোনো অতিথির জন্য একটি প্রচ্ছন্ন অপেক্ষাও হয়তো-বা পুঞ্জীভূত)। ঠিক সেইসময়ই দেখা যায়, 'মনোরমা' এসে সেই 'অন্ধকার' 'নিস্তব্ধ' ঘরের 'প্রবেশদ্বারে' দাঁড়ান আর "বিপরীত দিক থেকে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল।" (ঐ) যেন তাঁর নির্জ্ঞানের প্রান্তে সংরক্ষিত বাসনার আলো নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে মনোরমাকেই খুঁজে নিল। কিন্তু পক্ষান্তরে তাঁর স্ত্রীর কাছে ভিননারীর সেই বিপজ্জনক আবির্ভাব হয়ে উঠল বিভীষিকাময় (উল্লেখ্য যে, কেরোসিন আলোর এই প্রস্তাবিত রূপকত্ব কিন্তু কথকের স্ত্রীর দৃষ্টিকোণ

থেকে ফলপ্রসূ নয়)। সর্বোপরি গল্পের শেষাংশেও আরেকবার কেরোসিনের শিখার উল্লেখ পাই, সেখানে শিখাটি দপদপ করতে করতে নিবে যায় (২৩১)। ডাক্তারের স্পর্শে রোগী খানিক ধাতস্থ হয়ে আসায় এমনটি হয়। গোপন কথা অনেকখানি প্রকাশিত হয়ে পড়ায় (যদিও তার খাঁজে-ভাঁজে চাপা থাকে অপ্রকাশিত কথার সম্ভার) এমনটি হয়। বাইরের আলো তার প্রতিস্থাপক হয়ে ওঠে। 'এত কথা' বলে ফেলার জন্য রোগী 'অত্যন্ত লজ্জিত' ও ডাক্তারের ওপর 'আন্তরিক ক্রুদ্ধ' হয়ে ওঠেন।

কেরোসিন-আলোর পাশাপাশি আরও বেশি করে জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ এই গল্পে বারবার ফিরে ফিরে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পেই, বিশেষত মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্পগুলিতে, রাত্রি ও জ্যোৎস্নার চিত্রকল্প পৃথকভাবে বা সম্মিলিতভাবে এক আশ্চর্য তাৎপর্য বহন করে। আমাদের গহন মনের নানারকম জটিল কুটিল সম্ভাবনার বহুমাত্রা উন্মোচনে রহস্যনিলীন পরিবেশের সৃজনে ভাষাকে হতে হয় যথাসম্ভব কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাগূঢ়। বস্তুত রাত্রি ও জ্যোৎস্নার নিঝুম মায়াবী প্ররোচনাময় সঞ্চার আমাদের অচেনা অদম্য অন্তর্নিহিত প্রবণতাগুলিকেই খুঁচিয়ে তোলে। এই-সম্পর্কিত আরও গভীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে সমালোচক তপোব্রত ঘোষের বক্তব্যে, যেখানে তিনি 'moon-goddess' হেকেটির পৌরাণিক মিথ ও বিনির্মাণের সূত্র টেনে এই গল্পটির ও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার অনুষঙ্গে আলোচ্য মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন (১৩৪-১৩৫)। উদ্দীপন-বিভাব হিসেবে জ্যোৎস্না শুধু প্রেম ও স্বপ্নবাসনার অনুঘটকরূপেই নয়, বরং নির্দেশকের পর্যায়কে ছাড়িয়ে গিয়ে প্রেমবিহ্বলতার রূপকও হয়ে উঠেছে নানাপ্রসঙ্গে। যেমন— একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বাগানের বকুলতলায় দক্ষিণাচরণ যখন বসেছিলেন, তখন দুটি-একটি 'প্রস্ফুট' বকুলফুল ঝরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর শায়িত শীর্ণ মুখের ওপর 'শাখান্তরাল' থেকে যে জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল তা ছিল 'ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না' (২২৪); অর্থাৎ দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ তাঁদের প্রেমের মাধুর্যকে সাবলীল বা নিরঙ্কুশ হতে দেয়নি। তদুপরি বুদ্ধিমতী স্ত্রীর শুষ্ক শীতল যুক্তিবোধ যখন তাঁর হাসির মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়, দক্ষিণাচরণের আবেগপূর্ণ প্রতিশ্রুতি তার ধাক্কায় খণ্ড খণ্ড হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে (অবশ্য উক্ত হাসির মধ্যে লজ্জা ও সুখের পাশাপাশি 'অবিশ্বাস' ও 'পরিহাসের তীব্রতা' যে দক্ষিণাচরণ

আবিষ্কার করেন, সেটি তাঁর নিজের মনের অনুতাপজনিত আশঙ্কাও হতে পারে, তাই স্ত্রীর হাসিকে 'সুমিষ্ট' মনে হওয়ার সাথে সাথে 'সুতীক্ষ্ণ'ও মনে হয়েছে তাঁর— তুলনীয় মিছরির ছুরি)। পরবর্তীতে জ্যোৎস্না 'উজ্জ্বলতর' হয়ে উঠতে দেখা যায়, যেন-বা দক্ষিণাচরণের হৃদয়ে প্রেমাসক্তি আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে চায়, যতই তিনি প্রেমালাপের সাহস সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হন না কেন। আর সেই মুহূর্তে যেন তাঁর কাঙাল প্রত্যাশা কোকিলের ক্রমাগত কুহু কুহু ডাকের রূপকে হাজির হয়, সেইসূত্রে সংশ্লিষ্ট থাকে পিকবধূর বধিরতার বিষয়টিও ("এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে"— পৃ. ২২৫)। রবীন্দ্র-সমালোচক বলেন, "পিকবধূর কাছে সাড়া-না-পাওয়া পুরুষকোকিলটির আশাভঙ্গের অতৃপ্তি শ্লেষগর্ভ এই বক্রোক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে" (ঘোষ: ২০১৮: ১২৮)। বস্তুত এর পরেই যেন বায়ুপরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, আগেই বলেছি, তা যতটুকু না অসুস্থ স্ত্রীর জন্য, তার চেয়ে বরং গূঢ়ার্থে দক্ষিণাচরণেরই নিজের জন্য। হয়তো প্রচ্ছন্ন সেই 'অতৃপ্তি'-র সুড়ঙ্গ বেয়েই ক্রমে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে মনোরমার প্রবেশের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম শরতের সন্ধ্যায় সেই একই বাগানে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমরা দেখি জ্যোৎস্নার বদলে 'ছমছমে অন্ধকার' (চাপা শোক ও অনুশোচনার কারণে প্রেমবিহ্বলতা অন্তর্হিত বুঝি-বা), পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়ার শব্দও নেই (মুক্ত মনের উড়ালপ্রাপ্তির তিলমাত্র সম্ভাবনাও জাগরিত নয়), শুধুমাত্র 'ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ' বাতাসে সশব্দ কাঁপছিল— সম্মিলিত এই ঝাউগাছসমূহ আমাদের মতে উক্ত পুরুষ-কথকেরই নির্জ্ঞান মনের 'ঘনছায়াবৃত' রহস্যকঠিন অবয়ব, যা বাসনার বাতাসে কম্পমান, যে কম্পমানতা তাঁর নিজের কাছে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান না হয়েও যেন প্রতীয়মান ('সশব্দ')। তারপরেই মনোরমা বেদির ওপর বিশেষ ভঙ্গিতে শয়ন করলে, সেই শিথিল-অঞ্চল শায়িতা শ্রান্তকায় নারীমূর্তি কথকের সেই সুপ্ত বাসনাকে প্ররোচিত করে, আর হয়তো-বা তারই ফলস্বরূপ "অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল" (অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনের যে-চেহারাটুকু ছিল অন্ধকার বাতাসে কম্পমান, তাই যেন হঠাৎ করে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল)। এই প্রজ্বলনের হেতু হল 'কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ', অর্থাৎ জ্যোৎস্না (২২৯)— কিন্তু কেন সেই চাঁদ কৃষ্ণপক্ষের

(প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বাগানে বেড়ানোর সময় চাঁদ ছিল শুক্লপক্ষের), কেন তার হলুদ জীর্ণতা? কারণ গ্লানি ও হতাশা নায়কের এই কামনার দীপ্তিকে খণ্ডিত করেছে, নারীশরীরের প্রচ্ছন্ন প্রলোভন সত্ত্বেও মনোরমাকে ইতোমধ্যে তাঁর মনে হয়েছে অধরা ছায়া (হয়তো তাঁর নিজের দ্বিধা ও অপরাধবোধের কারণেই)। তপোব্রতবাবুর ব্যাখ্যায়—

> দুই বাহুর উপাধানে শায়িতা বলেই 'শিথিল-অঞ্চল' এই রমণীটির দেহরেখা পীনোন্নত উগ্রতায় পুরুষটির কাছে প্রলুব্ধকর হয়ে ওঠে; কিন্তু আবছায়া সেই 'মূর্তি'টিকে পাণ্ডুরবর্ণে 'অঙ্কিত' মূর্তিটিই যে ফ্যাকাশে হয়ে যায় তা নয়, মূর্তি তার মূর্ততাকেই খুইয়ে ফেলে চিত্রের সমতলত্বে অধঃপতিত হয়। (১৩৪)

কিন্তু ঝাউগাছের শিখরদেশ প্রজ্বলিত করে (পুরুষের কামনা জাগরিত হওয়ার দ্যোতনা) সেই সাদা কিংবা হলদেটে জ্যোৎস্না যখন 'সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর' পড়ল, তখন কথকের সংযমের বাঁধ একপ্রকার ভেঙে পড়ল। সুতরাং 'সাদায়-সাদায় সেই রমণী যেন আছে-নেই হয়ে' (ঘোষ, ১৩৫) একপ্রকার 'সৌন্দর্যের মরীচিকা' গঠন করছে; আমাদের মনে পড়বে, দক্ষিণাচরণও আগে একবার মনোরমাকে 'মরীচিকা' বলে উল্লেখ করেছেন, সেইসূত্রে নিজের 'তৃষ্ণা'র সাপেক্ষে সম্মুখবর্তী সেই নারীকে চিহ্নিত করেছেন চোখের সামনে 'ছলছল ঢলঢল' করতে-থাকা 'কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল' হিসেবে (২২৬)। কারণ তাঁর স্ত্রীর 'আরোগ্য-আশা-হীন' ব্যাধির কারণে তাঁর জীবন 'সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি' হয়ে উঠেছিল (এমনকি নিজের প্রথম-যৌবনের প্রেমোদ্দীপনাকেও তিনি 'সৌন্দর্যের মরীচিকা' হিসেবেই পুনর্পাঠ করতে শুরু করেছিলেন)। অতএব মরীচিকার মধ্যে যে ভ্রান্তি রয়েছে, সেই ভ্রান্তি যেন তাঁর চেতনাকেও গ্রাস করে নেয়, তাঁর প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধের সঙ্গেও মিশে যায়, তাই তিনি এমনকি একঝাঁক হাঁসের উড়ে-চলার শব্দকেও হাসি (হাহাকারও বটে) ভেবে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। হাঁসের পাখার শব্দ অতিপ্রাকৃত হাসিতে উপমিত হয় নায়কের গভীরতম ভ্রান্তিকে অবলম্বন করেই (ভ্রান্তিমান অলংকার)।

পরে আমরা দেখি দক্ষিণাচরণ ও মনোরমার দাম্পত্যে কৃষ্ণপক্ষ অতিবাহিত হয়ে শুক্লপক্ষ এল, যখন তাঁরা নৌকাভ্রমণে বের হল আর অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে 'সমস্ত ভয়' (?) চলে গেল। মনোরমার 'হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার' অনেকদিন পর ধীরে ধীরে

খুলতে-থাকার প্রতীয়মানতার সূত্রে লগ্ন হয়ে আছে এই নির্দিষ্ট শুক্লপক্ষের ব্যঞ্জনা। এইসূত্রে পদ্মানদীর যে চিত্রকল্প আমরা পাচ্ছি, তাও নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ (২২৯)। 'ভয়ংকরী' পদ্মানদীকে বর্ণনা করা হয় 'হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনী' হিসেবে— উপমা ও সমাসোক্তির মধ্য দিয়ে নদী একটি সজীব সত্তায় পরিণত হয়। 'রাক্ষসী' নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে-থাকা আমবাগান থেকে শুরু করে ঘুমের ঘোরে নদীর পাশ ফেরার চোটে ভেঙে-পড়া বিদীর্ণ তটভূমি, সবকিছুই অসহায় ধ্বংসলীন কিছুর আভাস আনে। আরেকটু গভীরভাবে দেখলে, পদ্মার উপমান হিসেবে হেমন্তের এই 'বিবরলীন' সাপের ছবিটুকু, উপমেয় হিসেবে শুধু পদ্মাকেই নয়, কথকের নির্জ্ঞান চেতনায় লীন রাক্ষুসে প্রবৃত্তি ও সরীসৃপ কামনার ক্ষুধাকেও চিহ্নিত করে— যার প্রকোপে তাঁর সংযমের বাঁধ ও জীবনের অবলম্বনগুলি সততই বিপজ্জনক দশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে চিহ্নটিকে আমরা নাম দিতে পারি একটি 'ত্রিভুজ রূপক' (triangle metaphor): নদীর চিহ্নায়ক হিসেবে আসছে সাপ, আর সেই অকৃতজ্ঞ সাপ নদীকে গৌণ করে ফুঁসলে আনছে অন্য একটি চিহ্নায়িতকে (নদী < সাপ > প্রবৃত্তি)। সেই লগ্নে বালির চর থেকে শুরু করে আকাশের সীমানা অবধি প্রসারিত 'অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না' যথারীতি দক্ষিণাচরণের মনের প্রেমবিহ্বলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরই সঙ্গে উল্লিখিত— এক জায়গায় বালুকারাশির মাঝখানে একটি জলাশয় গোছের সৃষ্টি হয়েছে, যা পদ্মারই বিক্ষিপ্ত অংশ— আর তার ওপর সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্ছিতভাবে পড়ে আছে। যেন তাঁর পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি বা রূপলুব্ধতারই একটি বিক্ষিপ্ত খণ্ডরূপ একটি নির্দিষ্ট পরিসরে সংহত হয়ে রয়েছে ('নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর' ওপর মূর্ছিত জ্যোৎস্নার রেখা)— তা কি আসলে মনোরমার প্রতি তাঁর ক্ষণিক আকর্ষণেরই একাগ্রতা? কারণ লালরঙের শাল খসে পড়ায় মনোরমারও মুখ সেই মুহূর্তে 'জ্যোৎস্নাবিকশিত'? অথচ এমন সময় 'সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে' চরবিহারী পাখির ডাক পূর্বোক্ত একইরকম শব্দের বিভ্রম জাগিয়ে তোলে। পদ্মার চরকে এখানে 'মরুভূমি' বলা হচ্ছে; স্মরণীয়, দক্ষিণাচরণ ইতোমধ্যে নিজের জীবনকেও একবার 'মরুভূমি' বলেছেন, আর মনোরমাকে বলেছিলেন 'মরীচিকা'; এখন মনোরমাকে

নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যে-জায়গায় এসে তিনি দাঁড়ালেন, তা কিন্তু 'মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জল' (২৩০)। এই বিবর্তন লক্ষণীয়।

দক্ষিণাচরণের অনুতপ্ত হৃদয়ের নির্যাস ছেঁকে নিয়ে দু-দফায় রাতপাখিরা যে ধ্বনির বিভ্রম তাঁর মধ্যে জাগিয়ে দিয়ে গেছে, তারই অভিঘাতে একধরনের পরাবাস্তব ভয় বা উদ্‌বেগ তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। এই ভয় তাঁকে যতই বিচলিত করুক, মশারির বেড়াজালটুকু কিন্তু মাঝখানে থেকেই যায় (২৩০)। মশারি জিনিসটি একটি বেষ্টিত পরিসরকে দ্যোতিত করে। রূপকার্থে কখনো তা অহংবোধের গণ্ডি বা সুরক্ষাজাল বা নিরাপত্তাবলয়কে বোঝায়, কখনো আবার ক্ষেত্রবিশেষে কোনোরকম অসহায়তার আবেষ্টনীকেও চিহ্নিত করে। পরবর্তীকালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও অন্যান্যদের লেখায় এই দ্বিবিধ ব্যঞ্জনাতেই মশারির ব্যবহার আমরা বহুলভাবে লক্ষ করব। এখানেও আমরা দেখি, 'comfort zone' হিসেবে অন্তত বার-তিনেক এই মশারির উল্লেখ রয়েছে গল্পে। কথকের মশারির কাছে, মশারির পাশে একটি 'অবরুদ্ধ' অস্বস্তিকর স্বর ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কথক দেশলাই জ্বেলে বাতি ধরালে, ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গিয়ে পূর্বোল্লিখিত সেই 'হাসি' কথকের মশারি কাঁপিয়ে, বোট দুলিয়ে, রাত্রির ভিতর দিয়ে বয়ে চলে যায়। মশারি কাঁপিয়ে যাওয়ার অর্থ কথকের নিরাপত্তাবোধের বলয়কে বা সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনীর নিশ্চিন্ততাকে বিপর্যস্ত বা বিচলিত করে তোলা। প্রসঙ্গত জীবনানন্দ দাশের 'হাওয়ার রাত' কবিতায় (৬৭) 'বিস্তীর্ণ হাওয়া' যেভাবে মশারিকে বিপর্যস্ত করেছিল বা মশারির অস্তিত্বকেই প্রায় মুছে ফেলেছিল ('মাথার উপরে মশারি নেই আমার'), তাতেও অনুরূপ তাৎপর্য প্রতীয়মান। রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্পেও এইরকম বার-চারেক মশারির উল্লেখ পাই। মৃতের কঙ্কাল একটি 'চেতন পদার্থ' হয়ে কথকের মশারির চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে ক্রমে মশারির কাছে, খুব কাছে এসে, মশারি-সংলগ্ন হয়ে বসে পড়ে (৫৫-৫৬)। সমালোচক তপোব্রত ঘোষ এখানে 'মশারি'-কে বলেছেন 'জীবন-মৃত্যুর মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম এক তন্তুজালের ব্যবধান' (১০১)। আমরা ব্যাখ্যাটি প্রায় মেনে নিয়েও বিষয়টিকে একটু অন্যভাবে দেখতে প্রয়াসী; আমাদের মতে মশারিটি এখানে কথকের অহংসচেতনতার সুরক্ষিত পরিসরের রূপক, আর কঙ্কালের কাহিনিটি[২] তাঁর অবরুদ্ধ মনের কুটিল কল্পনারই প্রাদুর্ভাব। প্রথমে

এই সীমারেখাটুকুর উল্লেখ থাকলেও, পরে তা বিস্মৃত; কারণ একইসাথে শ্রোতা ও পরোক্ষ সৃজক হিসেবে কথক নিজেই ক্রমশ একাকার হয়ে গেছেন, ক্রমশ ঘুচে গেছে স্বপ্ন আর বাস্তবের, বিজ্ঞান আর নির্জ্ঞানের ব্যবধান। তাই আমাদের ধারণায় মশারির ওই সূক্ষ্ম 'তন্তুজাল' আসলে কথকের conscious আর unconscious মনের মধ্যবর্তী একটি পর্দা, যা এক্ষেত্রে গৌণ হয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গে 'নষ্টনীড়' গল্পটির কথাও এসে পড়বে। সেখানে আমরা দেখি, অমল ও তার বৌঠান চারুর মধ্যে যে প্রেমসম্ভাবনার রসায়ন, অমলই তাকে একপ্রকার দলিত মথিত করে চলে যায়। তারপর থেকে অমলের বিরহে চারুলতার দিনগুলি দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, এবং তার ফলস্বরূপ দাম্পত্যও। প্রশ্ন উঠতে পারে: প্রেম কি একইভাবে অমলের হৃদয়েও জাগ্রত হয়েছিল? দেখতে গেলে, গল্পে উল্লিখিত অমলের 'শৌখিন' বিশেষণটুকুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার গভীর স্বার্থপরতা ও আত্মরতিপরায়ণ স্বভাবের ব্যঞ্জনা। চারুকে যেন সে কেবল তার শখপূরণের সহজলভ্য মাধ্যম হিসেবেই দেখেছে। তবু ট্রেনের কামরায় 'ছেলেমানুষের মতো' তার সেই বিদায়কালীন কান্না ভীষণরকম অর্থবহ। পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্নকে উপেক্ষা করা যায় না, তা হল দাদার প্রতি অমলের কর্তব্যবোধ ও সেইসংক্রান্ত অপরাধবোধ; অর্থাৎ সেও হয়তো লোকধর্মের তাগিদে প্রেমধর্মকে বিসর্জন দেওয়ার মতো মহৎ কার্যই করেছে। এইসূত্রে যে-বিষয়টির কথা আমরা বলতে চাই: অমল মশারির ওপর কারুকাজ রাখতে চেয়েছিল (৩৮৮), অর্থাৎ সে ওই 'কারাগার'-টিকে (তার নিজেরই ভাষায়) নস্যাৎ করতে চায়নি, তাকে কৃত্রিম অলংকারে ভূষিত করতে চেয়েছে। এটি তার মানসপ্রবৃত্তিকে সূচিত করে। একইভাবে প্রথার কারাগারকেও চ্যালেঞ্জ করা তথা চারুর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সে হয়তো সেই প্রেমের বেদনাকে এক শৌখিন সুখবিলাসের রূপ দিয়ে নিজের স্মৃতিতে স্থান দিয়ে রেখেছে, কে বলতে পারে।

যা-হোক, 'নিশীথে' গল্পটিতে ফিরে আসি। আমরা দেখি কথকের মশারির চারপাশে আবর্তিত সেই ছায়ামূর্তির সজীবতা এমনকি কথকের ঘড়িকেও সংক্রমিত করে (২৩০)। ঘড়িটিও একই 'অবরুদ্ধ' স্বরকে যেন বহন করতে চায়। ঘড়ি বলতে আমরা সময়ের পরিমাপযোগ্য শৃঙ্খলাকেই বুঝি, কথকের ঘড়ি এক্ষেত্রে কথকের

জীবনের ঘটনাক্রমকে বা তাঁর সময়ের বিন্যাসকে চিহ্নিত করে। সেই ঘড়ি এখানে ‘গোলাকার’, অর্থাৎ সময় এখানে পুনরাবৃত্তিময়। ঘড়ির সময়শৃঙ্খলা তো আবর্তনময়ই হবে, তাহলে আমরা তাকে বিশেষভাবে ‘গোলাকার’ বলছি কেন? কারণ তা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিকেই প্রাধান্য দেয়। একই কেন্দ্রকে অবলম্বন আবর্তিত ‘ঘণ্টার কাঁটা’ (কথকের জীবনের প্রতিটি ঘণ্টার কণ্টকতাই বুঝি) মশারির চারপাশে আবর্তিত ছায়ামূর্তির মতো যেন মনোরমার দিকেই প্রশ্নসূচক আঙুল তুলতে চায়। তা দক্ষিণাচরণের অনুতাপের গূঢ় বেদনাকে জাগিয়ে রাখে[৩]। তাই কথকের অপরাধবোধের কিছু ক্যাথারসিস হলেও, তা আবার ফিরে ফিরে আসে; তাই পরের দিন অর্ধরাত্রে ‘আবার’ ডাক্তারের দরজায় ঘা পড়ে। এই পুনরাবর্তনের সংকেত নিয়েই গল্পটি শেষ হয়।

‘আপদ’ গল্পে আমরা নীলকান্তের কণ্ঠে যে-গানটি পাই (“ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে/ এমন নৃশংস কেন হলি রে—/ বল্ কী জন্যে, এ অরণ্যে,/ রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে”— পৃ. ২৩৫), সেই গানের কথা ‘অতি যৎসামান্য’ হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই গানের প্রসঙ্গেই লেখক বলেন যে, এই রাজহংস ও রাজকন্যার কথা থেকে নীলকান্তের নিজের এক বিমূর্তপ্রায় ঊর্ধ্বায়ন ঘটত আর ‘যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন’ সেই কিরণময়ীর (নামটি লক্ষণীয়) ছবি প্রকৃতির অন্যান্য ছবির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ‘রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত’ হয়ে যেত (ঐ)। সেইসূত্রে সে ও কিরণময়ী হয়তো ভাবার্থের ফেরে যথাক্রমে রাজহংস ও রাজকন্যার প্রতিস্থাপক হয়ে উঠতে পারত, তবু তা হয়নি বলেই আমাদের অভিমত। সতীশের সঙ্গে রসিকতাসূত্রে রাজহংস-প্রসঙ্গে কিরণময়ীর মুখে দময়ন্তীর উল্লেখে (২৩৭) যদিও নল-দয়মন্তীর উপাখ্যানের পৌরাণিক অনুষঙ্গই স্পষ্ট হয়, আর রাজহংসকে রাজকন্যার আশ্রয়লালিত দূত বলেই মনে হয়, তবু এই গানের সঙ্গে সেই সম্বন্ধটুকুর কোথাও যেন একটি খাপছাড়া অসংযোগও রয়েছে। অবশ্য গানটিতে নল-দয়মন্তীর আখ্যানের যে অনুষঙ্গ রয়েছে তাতে রাজহংসের নৃশংসতা একধরনের irony, আর রাজকন্যার প্রাণসংশয়ের তাৎপর্যও মূলত প্রেমের প্রবল বিরহী আকুলতা। কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রে রাজহংস ও রাজকন্যার সম্পর্কের সম্ভাব্যতা নিছক দূতালির মধ্যেই আটকে নেই; আর ‘দ্বিজবংশে’

জন্মে রাজহংসের নৃশংসতা এক্ষেত্রে উপেক্ষা, ঔদাসীন্য ও আভিজাত্যবোধের নৃশংসতা হিসেবেও পাঠযোগ্য; আর তার সঙ্গে অন্বিত রাজকন্যার 'প্রাণসংশয়' বিকল্প পাঠে হয়ে উঠতে পারে প্রেমযাতনারই পরাকাষ্ঠা। এই দৃষ্টিভঙ্গির নির্যাসটুকু নীলকান্তের কৈশোর মনের সুপ্ত বাসনার আদলে ছেঁকে নিলে (যেহেতু সে এই গানের মানে পুরোপুরি বুঝত না, আর তা সত্ত্বেও যেহেতু তার 'তুচ্ছ' জীবন গানে 'তর্জমা' হত), যেন তার সোজাসুজি মানে দাঁড়ায় দ্বিজবংশী রাজহংসের প্রেমে পড়ে রাজকন্যার প্রাণসংশয়। উল্লেখ্য যে, সেও একজন 'ব্রাহ্মণবালক' আর সেও 'সাঁতার' দিয়েই কিরণময়ীদের বাগানে এসে উঠেছে। কিন্তু এখানে কাহিনির অন্তর্নিহিত শ্লেষ এই যে, এই চিহ্নের তাৎপর্য আসলে যেন উল্টোমুখেই উন্মোচিত হতে চায়; কিরণময়ীর প্রতি এক স্নেহকাঙাল অধিকারবোধের তাড়নায় তথা দুর্বলতায় নীলকান্তেরই 'প্রাণসংশয়' দেখা যায়, আর পক্ষান্তরে একটি বিশেষ পর্যায়ে কিরণময়ীর অবোধ উপেক্ষাই যেন 'নৃশংস' হয়ে ওঠে। যদিও গল্পের শেষে নীলকান্তের বিচ্ছেদ ও মনোবেদনার সংকট কিছু হলেও কিরণময়ীকে বেদনাবোধের সংকটে ফেলে, তবে তার মাত্রা নিঃসন্দেহে গায়ক নীলকান্তের আশানুরূপ নয়। প্রতিতুলনায় 'অতিথি' গল্পের 'ব্রাহ্মণবালক' তারাপদ যথার্থই রাজহংসের উপমেয় হয়ে উঠেছিল ("সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত"— ২৮২); এবং রাজকন্যার 'প্রাণসংশয়'ও সে একপ্রকার করতে সমর্থ হয়েছিল, গোটা গ্রামের (সেইসাথে রাজকন্যা তথা চারুরও) 'হৃদয়খানি' চুরি করে 'আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী' বিশ্বপ্রকৃতির কাছে চলে গিয়ে। তারাপদ'র নির্লিপ্তিই তাকে একপ্রকার 'নৃশংস' রাজহংসের শিরোপা দেয় ('কৌতূহলবশত' জলে ডুব দিলেও যার পাখা 'সিক্ত বা মলিন' হতে পারত না), অপরপক্ষে নীলকান্তের স্নেহভিক্ষু হৃদয়ের করুণ আসক্তিই তার রাজহংস-সত্তার গরিমাকে ক্ষুণ্ণ ও খণ্ডিত করে। উভয়ের পলায়নের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে, তারাপদ'র পলায়ন (চলে-যাওয়া) গৌরবদীপ্ত, নীলকান্তের পলায়ন (নিরুদ্দিষ্ট হওয়া) 'চোরের মতো'। কী 'চুরি' করেছিল নীলকান্ত?— একটি রাজহাঁস? সতীশ একটি 'শৌখিন দোয়াতদান' কিনেছিল, যার মূল আকর্ষণ দুটি ঝিনুকের নৌকার মাঝখানে একটি 'জর্মন রৌপ্যের হাঁস' (২৩৭)। এ-ভাবেই গল্পের ভাবার্থগত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে গল্পের বস্তুগত

কাহিনিসূত্র বারবার মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে দেখি। গল্পে সেই দোয়াত চুরির বস্তুগত যুক্তি নানারকম থাকতে পারে ('প্রতিহিংসাসাধনের জন্য' প্রভৃতি), কিন্তু ভাবসাদৃশ্যগত যুক্তি আমরা যদি প্রস্তাব করতে চাই, সেক্ষেত্রে দোয়াতের চেয়ে দোয়াতের হাঁস আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই নীলকান্ত শুভ্র রাজহংস বা রূপোর হাঁসটিকে অজ্ঞাতে নিজের রূপক বলে মনে করুক বা কিরণময়ীর রূপক বলেই মনে করুক, দু-ক্ষেত্রেই তার অধিকার বা নিয়ন্ত্রণভার বা মালিকানাস্বত্ব সে সতীশের কাছে ছাড়তে রাজি নয় (এমনকি সে তা নিজেও রাখতে রাজি ছিল না, আলোচ্য রূপকত্ব সে যেন 'গঙ্গার জলে' বিসর্জন দিতে চেয়েছিল গূঢ় অভিমানে, যেন সে ওই ব্যর্থ চিহ্নটিকেই বিনষ্ট করতে চেয়েছে; কিরণও সেই-চাওয়াকেই ফলপ্রসূ করেছে)।

নীলকান্তের বিষয়ে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য আমরা পাচ্ছি যে, সে "কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমনসংবাদ স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল" (২৩৩)। লক্ষণীয়, বাক্যটিতে কিন্তু এখানে প্রধান কর্তা হিসেবে কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের উল্লেখ নেই (গৌণ কর্তা হিসেবে কুকুরটি রয়েছে)। সুতরাং বাক্যটি থেকে আসলে নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে না, কে গ্রাম্য কুকুরটিকে আদর দিয়ে এতখানি স্পর্ধিত করে তুলল। এমনকি তার আগের বাক্যেও তা অনুক্ত। তারও আগের বাক্যে, অর্থাৎ দুটি বাক্য পিছিয়ে গিয়ে আমরা জানতে পারছি, কর্তা আসলে নীলকান্ত। এখানে স্যসুরের নির্বাচন-নাকচকরণ তত্ত্বের নিরিখে (অথবা কেউ কেউ দেরিদা-কথিত পার্থক্য ও স্থগন-সংক্রান্ত পাঠক্রিয়ার ভিত্তিতেও দেখতে পারেন) আমরা যদি অনুক্ত কর্তার শূন্যস্থানে নীলকান্তের বদলে কিরণময়ীকে বসিয়ে নিই (দ্র. ছক ১১, প্রথম অধ্যায়), তাহলে দেখব বাক্যটির সম্পূর্ণ বিকল্প একটি তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত হয়। মলিন গ্রাম্য কুকুর তখন একটি প্রাণিবিশেষ হয়ে না থেকে অপ্রীতিকরভাবে 'অনাহূত' নীলকান্তেরই রূপক হয়ে ওঠে, আর শরতের 'সুসজ্জিত' ঘরের 'নির্মল জাজিম' হয়ে ওঠে শরৎবাবুর পরিশীলিত পারিবারিক জীবনের পরিসর। আগের দুটি বাক্যে নীলকান্তের ক্রিয়াকলাপের সাপেক্ষে (গোপনে শরতের তামাক খাওয়া আর বৃষ্টির দিনে তার শখের সিল্কের ছাতা

মাথায় দিয়ে বের হওয়া) তৃতীয় বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। তদুপরি, আলোচ্য বাক্যটির এই স্বর কি কেবল সর্বজ্ঞ কথকের? মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করলে বুঝব, তাতে (বিশেষ করে 'কোথাকার' শব্দটিতে) মিশে আছে শরৎ ও তার মায়ের ফোকালাইজেশন, যেহেতু তারা ইতোমধ্যেই নীলকান্তকে 'আপদ' মনে করতে শুরু করেছিল। এ-ছাড়া গল্পের একেবারে শেষেও দেখি, শরৎ 'সপরিবারে' দেশে চলে গেলে (আর বাগান শূন্য হয়ে গেলে) শুধুমাত্র "নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল" (২৩৯)। যদিও এখানে কুকুরের পোষক হিসেবে নীলকান্তের নামোল্লেখ রয়েছে, তথাপি, পূর্ববর্তী উদাহরণের বিনির্মাণ থেকে প্রশ্রয় লাভ করে আমরা এখানেও যদি নীলকান্তের পরিবর্তে কিরণময়ীকে এনে বসাই, তাহলে এখানেও 'পোষা' গ্রাম্য কুকুরের অবিকল একই নিহিতার্থ প্রকাশ পায়। অতএব দেখতে গেলে, আমাদের মতে, দ্বিজবংশী রাজহংসের উপমেয় হয়ে উঠতে চেয়ে পরিবর্তে পোষা একটি গ্রাম্য কুকুরের উপমেয় হয়ে-ওঠাই এই গল্পে নীলকান্তের জীবনের প্রচ্ছন্নতম ট্রাজেডি।

কুকুর-রূপকের আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎ পাই 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পটিতে (পাঠে তা স্মরণোপমা আকারে বিধৃত)। পরিবারের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সম্পত্তির দলিলপত্র শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার হঠকারিতায় বনোয়ারি সেগুলিকে প্রায় খোয়াতেই বসেছিল। সম্পত্তির অধিকার ভাইপো হরিদাস সেগুলি পেয়ে তার হাতে তুলে দিলে, বনোয়ারি অনুতাপসিক্ত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, পরোক্ষে সে যে-ভাইপোর ক্ষতি করতে যাচ্ছিল সেই ভাইপোই তাকে আবার ক্ষতিসাধনের উপকরণ জুগিয়ে দিচ্ছে! এইপ্রসঙ্গে অনেকদিন আগের একটি পোষা কুকুরের কথা তার মনে পড়ে, যাকে বারবার চাবুক মারা সত্ত্বেও যে হারানো চাবুক খুঁজে পেয়ে মুখে করে এনে 'মনিবের' সামনে 'পরমানন্দে' লেজ নেড়েছিল (৫৪৬)। মার খেয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে শাসনের উপকরণ পুনরায় খুঁজে এনে পরমানন্দে লেজ নাড়ানোয় বলা বাহুল্য 'মনিবের' ক্ষমতাশালী অহং পরিতৃপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তো সম্পর্ক মনিব আর পোষ্যের, এখানে কাকা-ভাইপোর সম্পর্কের মধ্যেও সেই আনুগত্যের কাঠামো এমন আশ্চর্যভাবে মিলে গেল কী করে! আমরা দেখি, বনোয়ারি যথেষ্ট জনদরদী ও নিজের

পারিবারিক ক্ষমতাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তৎপর, এবং তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিকতারও সে যথেষ্ট ঊর্ধ্বে, সেই নিরিখে মোটের ওপর গল্পটিকে ভাবাদর্শগত সংঘাতের দ্বন্দ্ব (ideological conflict) বলেই মনে হবে। কিন্তু মোটের ওপর তা মাননীয় হলেও, বনোয়ারির মধ্যে সেই সামন্ততন্ত্রপ্রসূত পুরুষ-অহং যে প্রচ্ছন্নরূপে কিছু হলেও রয়ে গেছে, তা শুধু নায়েবের প্রতি তার বিদ্বেষ বা স্ত্রীর মূঢ়তার প্রতি তার অভিমানাহত অসন্তোষের মধ্যেই লক্ষিত নয়— ভাইপোর সরল বিশ্বস্ততার সদৃশতায় কুকুরের প্রভুভক্তির স্মৃতিচারণ বা তার রঙিন-রুমালে-আঁকা বাঘের ছবির মধ্য দিয়েও ব্যঞ্জিত হয়। বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাঘের-ছবি-আঁকা ওই রঙিন রুমালেই মোড়া ছিল হালদারবংশের দলিল (হালদারগোষ্ঠীর ক্ষমতার মূল ভিত্তি)। অর্থাৎ বাঘের ছবিই সেই সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতাকেন্দ্রিকতার বিজ্ঞাপন আকারে ব্যবহৃত। আর সেই রুমালটির প্রতি ভাইপো হরিদাসের 'বিশেষ লোভ' সেই পারিবারিক উত্তরাধিকারের শিশুমনে আলোচ্য সেই ক্ষমতাতান্ত্রিকতার বীজ হিসেবেই যেন অপেক্ষমান। রুমালটিকে বনোয়ারিও নিজের 'মূল্যবান সম্পত্তি' বলে উল্লেখ করেছে (ঐ), যদিও তা পরোক্ষে ভাইপোর দৃষ্টিকোণকে বিধৃত করেও বলা হতে পারে। অবশ্য কাগজের তাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ওই রুমালটিকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল কিনা আমরা জানি না। তবে হালদারবাড়ি পরিত্যাগ করার আগে ভাইপোকে সেটির মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তরিত করার মধ্য দিয়েই বনোয়ারির প্রকৃত মুক্তি সূচিত হয়।

'পণরক্ষা' গল্পটিকেও আমরা বিশেষ গুরুত্ব-সহকারে দেখতে চাইছি। গল্পটিতে বিষয়বস্তুর অন্যতম কেন্দ্রীয় একক হল তাঁতশিল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রসিকের দাদা বংশী গরিব তাঁতি হিসেবে ঢের সংগ্রামী, আর প্রতিতুলনায় রসিক একটু শৌখিন ভবঘুরে গোছের। এই রসিকের যাবতীয় শৌখিন চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কন্যাপণের অভাবে বংশীর বিয়েই করা হয়নি, নচেৎ তার সে সামর্থ্য ছিল; এখন কোনোমতে রসিকের বিয়ে দিয়ে সে বংশরক্ষা করতে চায়। এইপ্রসঙ্গে তার কঠোর শ্রম তথা জীবন-সংগ্রামের সূত্রে তাঁতশিল্পের সংকটের কথা বলতে গিয়ে লেখক স্পষ্ট কিছু রূপক ব্যবহার করেন। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে কথকের ভাষা আমরা প্রায়ই আলংকারিক হয়ে উঠতে দেখি। এখানে উদাহরণটি অলংকারগতভাবেই রূপক। সমুদ্রপার থেকে

‘কলদৈত্য’ এসে তাঁতের ওপর ‘অগ্নিবাণ’ হানল আর তাঁতির ঘরে ‘ক্ষুধাসুরকে’ বসিয়ে দিয়ে ‘বাষ্পফুৎকারে’ জয়শৃঙ্গ বাজাতে লাগল (৫১৯)— এই হল বৃত্তান্ত। পাশ্চাত্যবাহিত প্রযুক্তির অর্থনৈতিক আগ্রাসনের কথাই আলংকারিক ভাষায় ব্যক্ত। আমাদের বক্তব্য, এই জাতীয় রূপকগুলির সঙ্গে গল্পের সামগ্রিক বয়ানের বা কাহিনিসূত্রেরও কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই, কথাগুলি সাধারণভাবে বলা হলেও গল্পের ভাববস্তুতে বা ঘটনাসমূহে খুব কিছু ফারাক পড়ত না। অপরপক্ষে রাত জেগে (গ্রাম যখন ‘নিষুপ্ত’) বংশীর একাকী তাঁত বোনার খাটুনির প্রেক্ষাপটে জ্বলতে-থাকা ‘মিটমিটে প্রদীপ’ (অথবা ছিদ্রবহুল শীতবস্ত্রের ব্যঞ্জনাও) বংশীর দারিদ্র বা সহায়সম্বলগত অপ্রাচুর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে রসিকের জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত অন্যরকম: শীতের দুপুরে শালিক, ঘুঘু ও পতঙ্গের যে বর্ণনা আমরা পাচ্ছি (৫২২), সেসবের সঙ্গে রসিকের জীবনের কোথাও যেন এক প্রচ্ছন্ন মিল তার শৌখিন স্বাধীনচেতা স্বভাবের সূত্রে লগ্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই শৌখিন স্বাধীনচেতা মনোভাব তাকে করে তুলেছে সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দায়িত্বজ্ঞান-বিষয়ে অনাগ্রহী। তাই সে ত্যাগস্বীকারের তাৎপর্য সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল থাকেনি। সাংগঠনিক স্থৈর্যের অভাবও তার মধ্যে লক্ষিত হয়: তাঁত বুনতে বসলে তার সেই অনীহা চোখে পড়ে, “পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে” (ঐ)। সে বোঝেনি, সুতো ও তাঁতশিল্পের রূপকে এ আসলে তার জীবনেরই শিক্ষা। ভবিষ্যতে এই শিক্ষাই সে পেয়েছে চড়া মূল্যের বিনিময়ে, জীবনের (অথবা সম্পর্কের) ছেঁড়া সুতোগুলিকে যখন আর মেরামত করে নেওয়ার কোনো উপায়ই তার হাতে ছিল না।

আমরা দেখি, রসিক যখন পুতুল (‘মাটির মূর্তি’) গড়ত আর মেয়েদের মধ্যে সেইসব পুতুলের অধিকারপ্রাপ্তি নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত, তখন সৌরভী একমনে চুপ করে বসে সেই ‘পুতুল-গড়া’ দেখত আর প্রয়োজনমতো রসিককে সাহায্যও করত। জীবনকেও যদি একটি ‘পুতুল-গড়া’ খেলার (অথবা স্বপ্নের ভাবমূর্তি গঠনের) পরিসর হিসেবে ধরা যায়, তাহলে সৌরভী ওরফে ‘সৈরি’ই হয়ে উঠতে পারত তার প্রকৃত সহধর্মিনী; সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বংশীর নির্বাচন যথার্থই ছিল বলা যায়। ‘আপন খেয়ালে নানা রঙের সূতা মিলাইয়া নানা চিত্রবিচিত্র করিয়া’ সেলাই-করা ‘কাঁথা’ যেন

রসিকের রঙিন খামখেয়ালী জীবনস্বপ্নেরই সূচক, যা সে সম্পূর্ণ করতে আর উৎসাহ বোধ করেনি। এক্ষেত্রেও সৌরভীই মুগ্ধ হয়ে তার মর্যাদা অনুধাবন করে, আর তা অসম্পূর্ণ থাকায় পীড়া অনুভব ক'রে সে-ই রসিককে সাধাসাধি করে সেটি সম্পূর্ণ করতে, শেষমেশ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তাকেই উপহার দেওয়ার জন্য রসিক রাত জেগে কাজটি শেষ করে। সুতরাং রসিকের খামখেয়ালী বিচিত্ররঙা অভিনব অথচ অসম্পূর্ণ জীবনস্বপ্নকে পূর্ণতা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেরণাদাত্রীও হয়ে উঠতে পারত একমাত্র সৌরভীই; কিন্তু দুর্ভাগ্যের ফেরে সে বাঁশঝাড়ের আড়ালেই রয়ে যায় আর রসিকও বাঁশঝাড়ের জটিলতায় জড়িয়ে গিয়ে আর তার কাছ অবধি পৌঁছাতে পারে না।

বাঁশঝাড়ের প্রসঙ্গে আমরা একটু পরে প্রবেশ করছি, আগে 'বাইসিক্‌ল্'-এর বিষয়টি একটু সেরে নেওয়া যাক। থানাগড়ের বাবুদের একটি ছেলে যখন বাইসাইকেল কিনে চড়া অভ্যাস করছিল, রসিক সেটি নিয়ে অল্প সময়েই আয়ত্ত করে এক বিশেষ ধরনের স্বাধীনতার আনন্দগৌরব অনুভব করে, আর লোভাতুর হয়ে নিজেও তা কেনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই বাইসাইকেল যেন জীবনের যান্ত্রিক তথা কৃত্রিম আরোপিত গতিশীলতার দ্যোতক হয়ে রসিকের চেতনাকে সম্মোহিত করে, ফলে জীবনের স্বাভাবিক গতিধর্মের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে যায়; দাদার সঙ্গে বিবাদহেতু 'নিজের টাকায় কেনা' বাইসাইকেলে চড়ে গ্রামে ফিরে আসার একপ্রকার অঙ্গীকার নিয়ে সে গ্রাম ত্যাগ করে। পরিকল্পিত এই 'নিজের টাকায় কেনা' বাইসাইকেল তার অহংতাড়নার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। সে জীবনে একটি কেবল নয়, দুটি বাইসাইকেল লাভ করেছে; দুটিই পরের দান। একটি বাইসাইকেলে সে কেতাদুরস্ত হয়ে গ্রামে ফেরে; অন্যটি তারই হাতে-বোনা 'চিত্রিত কাঁথায় মোড়া' হয়ে সৌরভীদের রোয়াকের দেয়ালে ঠেস-দেওয়া অবস্থায় অপেক্ষমান। একটির সঙ্গে জুড়ে আছে ধনীব্যক্তির কন্যার সঙ্গে তার বিয়ের রাজনীতিকুটিল অনুষঙ্গ (যাদের ঘরে চিরকালের নিকেলের ঘড়িকে 'অপমান' করে তাড়িয়ে সোনার ঘড়ি সুয়োরানির মতো জায়গা করে নিয়েছে, যেমন সমাজে সাবেক তাঁতের জায়গা দখল করে নিয়েছে এক কল-দৈত্য, এবং যাদের জীবনের সেই ধর্মটুকুই যেন রসিকের জীবনকেও সংক্রমিত করেছে); অন্যটির সঙ্গে মিশে আছে একটি গ্রাম্য মেয়ের প্রেমস্নিগ্ধ হৃদয়ের পরম যত্ন।

একটি তার নিজের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া (কলকাতা শহরে টাকার হাড়িকাঠে 'চিরকালের মতো' জীবন 'বলি' দিয়ে); অন্যটি তার দাদার জীবনের বিনিময়ে পাওয়া (তাঁতে 'আপনার জীবনটি বুনিয়া' তার দাদা তাকে দান করে গেল)। শেষাংশে তাই বাইসাইকেল শুধু যান্ত্রিক গতির সূচক হয়ে থাকে না; হয়ে ওঠে রসিকের জীবনচক্রের রূপক বা সত্তার প্রতিস্থাপক। সৌরভী সন্ধ্যাবেলায় 'অতি যত্নে' সাইকেলটি দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখে— এখানে যত্নটুকু আমাদের মতে নিছক বস্তুর প্রতিই নয়, রসিক একদিন আসবে আর এসে তা ব্যবহার করবে, সেই নীরব প্রত্যাশাও ওই বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। এই মর্মে তা রসিকেরই সত্তার সংযোজক হয়ে ওঠে, আর তা মোড়া থাকে পূর্বোক্ত সেই কাঁথা দিয়ে। যেন তারই প্রেরণায় পূর্ণায়িত রসিকের রঙিন জীবনস্বপ্ন দিয়ে সে পরম যত্নে মুড়ে রেখেছে রসিকেরই স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের প্রতিরূপ।

বলা বাহুল্য, রসিকের জীবন থেকে সেই রঙিন স্বপ্নময়তাটুকু হারিয়ে গেছে, তার বদলে তার দুঃস্বপ্নে বাঁশঝাড়ের বাস্তবতাই ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। বাঁশঝাড়ের দৃশ্য আমরা একবার প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছি, রসিক গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময়— "গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়-জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে" (৫২৬)। 'খড়-জ্বালানো ধোঁয়া' হৃদয়ের দহনজাত বিমূর্ত বিমিশ্র কোনো অনুভূতির কথাই যেন প্রকাশ করতে চায়, 'বায়ুহীন শীতরাত্রে' যা 'হিমভারাক্রান্ত' হয়ে (শীতল অবসাদ?) স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে 'আবদ্ধ' হয়ে রয়েছে (উল্লেখ্য, 'পোস্টমাস্টার' গল্পেও আমরা নায়কের বিমূর্ত অবসাদের আবহে গ্রামের গোয়ালঘর থেকে 'ধূম কুণ্ডলায়িত' হয়ে উঠতে দেখি)। আর 'বাঁশঝাড়' বুঝি-বা রসিকের চোখে অনতিক্রম্য জীবন-জটিলতারই একটি প্রাকৃতিক রূপায়ণ। তার দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে সেই দৃষ্টিভঙ্গিটুকুই দ্যোতিত হতে দেখি। তার বাসার কাছে বিয়ের বাজনার সূত্রে সে রাতে স্বপ্ন দেখে, 'লাল চেলি' পরিহিতা বধূ (সৌরভী) বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে; আর তার নিজের কাপড় কেবলই 'বাঁশের কঞ্চিতে' জড়িয়ে যাচ্ছে, 'টোপর' ডালে আটকে যাচ্ছে, সে কোনোমতেই 'পথ' বের করতে পারছে না (৫২৯)। রসিকের প্রেমজীবন তথা যৌনজীবনের অনতিক্রম্য ট্রাজেডিই এখানে আভাসিত হয়।

'ত্যাগ' গল্পটি শুরু হয় 'ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায়' এক দম্পতির প্রেমালাপ দিয়ে। কিন্তু সেই প্রেমালাপের মধ্যে কোথাও বুঝি কিছু রহস্য ঘনীভূত হয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। পুরুষটি চঞ্চলভাবে স্ত্রীর চুল খোঁপা থেকে 'বিশ্লিষ্ট' করে আঙুলে জড়াতে থাকে ও আরও অন্যান্যভাবে স্ত্রীকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। *উজ্জ্বলনীলমণি*-তে চুলের গোছা আঙুলে জড়ানোকে যৌনকামনার ইঙ্গিত হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেটি নায়িকা-মনের সংকেত (গোস্বামী, ৮৪), এখানে পুরুষটিই নারীর চুল নিয়ে অনুরূপ কাজ করছে— অর্থাৎ পুরুষটির মনেই আকাঙ্ক্ষা জাগরিত, রতিক্রীড়ায় আহ্বান তারই তরফ থেকে। কিন্তু নায়িকা কুসুম যেন কিছু অন্যমনস্ক, দৃষ্টি তার অসীম শূন্যে নিমগ্ন, বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়, গল্পকথক যখন বলেন— "সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এ পাশ হইতে একবার ও পাশ হইতে একটু-আধটু নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমন্তের কতকটা সেই ভাব" (৬৭)। বাতাসের উপমার মাধ্যমে লেখক হেমন্তের হৃদয়ানুভূতির ব্যাখ্যা দেন, কিন্তু সেই 'ফুলের গাছ' তথা মেয়েটি কেন 'সচেতন' না থেকে 'নিস্তব্ধ' হয়ে রয়েছে? তার পিছনে রয়েছে মেয়েটির জন্মপরিচয়ের রহস্য শ্বশুরের কাছে উন্মোচিত হওয়ার আসন্ন সংকট। পুকুরপাড়ে পুরাতন লিচুগাছের 'ঘন পল্লবের মধ্য' থেকে যে 'নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান' তাদের 'নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে' ঢুকে আসছিল, তার সদৃশতা যেন এই দম্পতির জীবনের সঙ্গেও লগ্ন হয়ে রয়েছে। একদিকে হেমন্তের 'অশ্রান্ত' প্রেমার্তি যেমন নিদ্রাহীন 'পাপিয়ার গান' হয়ে প্রকাশ পায়, অন্যদিকে কুসুমের হৃদয়াবেগও যেন নিদ্রাহীন 'পাপিয়ার গান' হয়েই লিচুগাছের 'ঘন পল্লবের' প্রচ্ছন্নতাসহ নিজের তাৎপর্য প্রকাশ করতে থাকে।

এ-ছাড়া হেমন্তের প্রেমালাপ যখন কুসুমের কাছে স্মরণীয় বলে মনে হয়েছে— সেইসূত্রে আমরা দেখি 'চমৎকার' রাতে দক্ষিণের বাতাসের মশারি কাঁপিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আর জ্যোৎস্নাকে তুলনা করা হয়েছে 'সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর' সঙ্গে (৬৮)। আমাদের পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির মতো এখানেও, হাওয়ায় মশারি কাঁপানোর অর্থ অহংসচেতনতার বা আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিসরকে বিপর্যস্ত করে তোলা— এখানে সেই কাজটি করছে দক্ষিণের বাতাস, অর্থাৎ নিজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রেমের

মাধুর্যপূর্ণ আহ্বানই যেন ব্যঞ্জিত হচ্ছে। আমরা দেখি, পরোক্ষভাবে হেমন্ত এতক্ষণ তার স্ত্রী কুসুমকে নিজের সংকোচের বেড়াজাল সরিয়ে বেরিয়ে আসতে বলছিল, কিন্তু কুসুমের জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর যেন হেমন্তেরই সামাজিক মর্যাদার বেড়াজাল ঢের বেশি মূর্ত হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, যে-বাতাস হেমন্তের মশারি কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, তা আর দক্ষিণের প্রেমসূচক বাতাস রইল না। এভাবেই হাওয়া ও মশারির তাৎপর্য প্রথমে একরকমভাবে স্থগিত হয়ে ছিল, পরে সেই তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক চেহারায় উপস্থাপিত হয়। প্রকৃতির প্রেক্ষাপট ও হেমন্তের প্রেম দুইই তাই পরবর্তীতে কুসুমের কাছে 'মিথ্যা' মনে হল (অবশ্য শেষমেশ প্রেমেরই জয় হয়েছে, হেমন্ত তার কুসুমকে ত্যাগ করেনি)। পাশাপাশি প্রেমবিহ্বলতার চিহ্নায়ক হিসেবে জ্যোৎস্নার কথা তো আমরা আগেই বলেছি।

'ঘাটের কথা' গল্পেও আমরা পাই কুসুমের কাহিনি (কুসুম সেখানে বিধবা)। আর পাই জ্যোৎস্নার কথাও। সন্ন্যাসীর সঙ্গে (যে-মানুষটি কুসুমের স্বামী কিনা তা নিয়ে গ্রামের মেয়েরা দ্বিধান্বিতা ছিল) কুসুমের প্রথম সাক্ষাতের লগ্নে আমরা দেখি 'পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না'— আর দেখি 'জোয়ারের জল' ছলছল করছে। জলের এই উচ্ছলতা ও জ্যোৎস্নার এই পরিপূর্ণতা শুধুমাত্র প্রেক্ষিতের নয়, কুসুমের পরিপূর্ণ হৃদয়ের যৌবনোচ্ছল প্রেমবিহ্বলতারও রূপক। বস্তুত এর পরেই তাকে 'রমণী' হিসেবে আবিষ্কার করবেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তখন 'মন্দিরের ভিতর' থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, নিচে ঘাটের সোপান থেকে পিছনে ফিরে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতে গিয়ে কুসুমের মাথার ওপর থেকে কাপড় খসে পড়ে (রমণীর মাথা থেকে কাপড় খসে পড়া যে তৎকালীন বাংলাদেশের সংস্কৃতির নিরিখে এক তাৎপর্যপূর্ণ উন্মোচন, তা আমরা জানি)। তখন কুসুমের মুখের ওপর 'জ্যোৎস্না' এসে পড়ে। কীরকম জ্যোৎস্না?— "ঊর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে" (৫)। 'কুসুম' কথার আভিধানিক অর্থও কিন্তু ফুলই। পরবর্তীতেও কুসুম যখন ভক্তিভরে সকালবেলা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করত ('পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত'), তখন তাকে দেখাত 'দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধৌত পূজার ফুলের মতো' (ঐ)। 'দেবতা' কথাটি নিঃসন্দেহে ব্যঞ্জনাগর্ভ, আর কুসুমের 'সুবিমল প্রফুল্লতা'ও যথেষ্ট ভাবনিবিড়।

কিন্তু জ্যোৎস্না এখানে নিরঙ্কুশ নয়, তার দ্বান্দ্বিকতায় ঘাপটি মেরে আছে অন্ধকার। আমরা দেখি, "কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না— কুসুমের পশ্চাতে আশে-পাশে ঝোপে-ঝাপে গাছে-পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে, অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া, মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে" (ঐ)। সামনে জ্যোৎস্নার এই অবারিত পরিসরের অর্থ হল, তার সামনে প্রেম ও হৃদয়বাসনার প্রসারিত ক্ষেত্র প্রস্তুত (যদিও তা গঙ্গার বুকে, অর্থাৎ জলে, অর্থাৎ শক্ত ভূমিতে নয়); কিন্তু তার পিছনে বা আশেপাশে লুকিয়ে রয়েছে দুর্ভাগ্য, বিপদ কিংবা নেতিবাচক সম্ভাবনার বীজ; তার সঙ্গে বাদুড়, পেঁচা আর শেয়ালের উল্লেখ সেই অন্ধকারের ব্যঞ্জনাকে আরও পুঞ্জীভূত করেছে। তাই শেষদৃশ্যেও দেখা যায়, কুসুমের আত্মহত্যার প্রেক্ষাপটে জ্যোৎস্নার পরিবর্তে 'ঘোর অন্ধকার' (চাঁদের অস্ত যাওয়ার মধ্যে যেন প্রেম-প্রত্যাশারই পরিসমাপ্তি)।

লক্ষণীয়, সম্মুখ আর পশ্চাতের এই দ্বান্দ্বিকতার বিষয়টি সন্ন্যাসীর জীবনেও শনাক্ত করা যায়। ঘাটে কুসুমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর কুসুম চলে গেলে সন্ন্যাসী 'অনেকক্ষণ পর্যন্ত' ঘাটের সোপানে বসেছিলেন, তারপর পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে যাওয়ার দরুন সন্ন্যাসীর 'পশ্চাতের ছায়া' যখন 'সম্মুখে' এসে পড়ল, তখন তিনি মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। উল্লিখিত এই 'পশ্চাতের ছায়া' তাঁর সত্তার নির্জ্ঞান তথা গহন মনেরই লুকানো আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক, যা সম্মুখে এসে পড়ে অর্থাৎ তাঁর নিজের সামনেই যেন উন্মোচিত হয়ে পড়ে— তপোব্রতবাবুও একে 'মগ্নচেতন প্রচ্ছন্ন বাসনার আত্মপ্রকাশ' হিসেবেই দেখেছেন আর সন্ন্যাসীর মন্দিরে প্রবেশ করাকে বলেছেন 'নিরাপদ দুর্গে পলায়ন' (৪২)। পরে কুসুম যখন তার হৃদয়ের গূঢ় স্বপ্নের কথা সন্ন্যাসীকে জানায়, তখন সন্ন্যাসী 'সবলে' ডান পা দিয়ে ঘাটের পাথর চেপে দাঁড়িয়ে ছিলেন (এই কথা আমরা ঘাটের অনুভব থেকে জানতে পারি)। সবলে পা দিয়ে পাথর চেপে থাকা আসলে ব্যস্তানুপাতিক কার্যকারণসূত্রে (causal index) হৃদয়ের দুর্বলতাই বোঝায়। কথক যেহেতু ঘাট[৪], তাই নিপুণভাবে এখানে ঘাটের স্পর্শানুভবের ভিত্তিতে, এই তথ্যটিকে প্রকাশ করা হয়েছে (৬)। কিন্তু এই মর্মে আরও একটি প্রসঙ্গের দিকে আমরা আঙুল তুলতে চাই— ঘাট জানিয়েছে, সন্ন্যাসী তাকে যেসব কথা বলে দিতেন, কুসুম ঘাটের

সোপানে বসে 'তাহাই ভাবিত' (৫)। ঘাটের পক্ষে কারো শারীরিক অভিব্যক্তি বোঝা যতখানি সম্ভব, কারো ভাবনা বোঝা কি আদৌ সম্ভব? সুতরাং এখানে ঘাটের ভাবনা আপাত একটি সম্ভাবনা, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা (fact) নয়; কুসুম হয়তো বসে বসে ধর্মকথার বদলে অন্য কিছু ভাবত (বক্তব্যের বদলে বক্তার কথাই বুঝি-বা)।

'মণিহারা' গল্পেও প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট হিসেবে জ্যোৎস্নার অসামান্য ব্যবহার আমরা লক্ষ করি। গল্পটি শুরুই হচ্ছে 'জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে'। জলের কাছাকাছি 'জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকা' ও তার 'অশ্বত্থমূল-বিদারিত ঘাট' (৩৩৪) ফণীভূষণের হৃত ঐশ্বর্য ও বিনষ্টপ্রায় জীবনেতিহাসের সূচক হয়ে অবস্থান করে। তার স্ত্রী তার দেওয়া গয়না নিয়ে ফেরার, সে নিজেও বেদনা-বিধ্বস্ত। ফণীভূষণের দুটি সংস্করণ আমরা পাই, একটি স্কুলমাস্টারের মনগড়া গুজবনির্ভর কাহিনির মধ্যে, অপরটি সেই কাহিনির বাইরের চরিত্র। এবার এই দুটি সংস্করণের মধ্যে বাস্তবিকই কোনো গভীরতর যোগ রয়েছে কিনা তা সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের তথা চিরুনি-তল্লাশির বিষয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমালোচক তপোব্রত ঘোষ সেইসব কূটপ্রশ্নের ওপর আলোকপাত করেছেন (২০১৮ : ২২৯-২৬৫)।

আমরা নতুন করে সেইসব অনুষঙ্গের বিস্তারিত জটিলতায় না ঢুকে সরাসরি চলে যাব গল্পের শেষভাগের রসোত্তীর্ণ বর্ণনার স্বাদ পেতে। মণিমালিকা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর যখন তার একেবারেই কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন ফণীভূষণ ক্রমশ শোকবিহ্বল হতে শুরু করল। ঘরের নানান 'জড়সামগ্রীর' মধ্যে মণিমালিকার রেখে-যাওয়া বহু চিহ্ন, ইতিহাস ও 'সজীব' হৃদয়ের 'স্নেহস্বাক্ষর' অনুভব করে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মণিমালিকাকে মৃতা হিসেবে ধরে নিয়েও সে মণিমালিকার প্রত্যাবর্তন কামনা করে, 'মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে' ('নীরন্ধ্র অন্ধকার' প্রেক্ষাপটে) মণিমালিকার একবার অন্তত দেখা পাওয়ার আশায় অধীর হয়ে ওঠে। সেইরাতেই ফণীভূষণের স্বপ্নে একটি রহস্যময় ঠকঠক ঝমঝম শব্দ ঘাটের সোপান বেয়ে উঠে দেউড়ির দরজায় ঘা দিতে থাকে। স্বপ্নমনস্তত্ত্বের বিষয়টি এখানে প্রচ্ছন্ন নয়, 'স্বপ্ন' বলেই উল্লিখিত, কিন্তু বর্ণনার মাধুর্যে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় স্বপ্ন ও বাস্তবের বিধ্বস্ত বেড়াজাল মুছে গেছে বলেই পাঠকের মনে হবে।

প্রথম রাতে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায়, দ্বিতীয় রাতে আবারও ফণীভূষণ স্বপ্নের জন্য প্রতীক্ষারত; এবং যেহেতু বস্তুজগৎ আর স্বপ্নপৃথিবী তার চেতনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে পরিশেষে স্থানবদল অবধি করে বসে আছে, তাই সে দরজা ও দারোয়ানকেই মণিমালিকার আসার পথে গুরুতর বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে দরজা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় আর দারোয়ান জোর করে ছুটিমাফিক পাঠিয়ে দেয় যাত্রা শুনতে। 'আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ' (ও চারপাশে কোনো এক 'অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা') তার অপেক্ষার উদ্‌বেগ ও ব্যাকুলতাকে সূচিত করে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেও তার অস্থিরতার কারণে স্বপ্নসাধনায় শীঘ্রপতন লক্ষ করা যায়। অবশেষে তৃতীয় দিনে সে তার কাঙ্ক্ষিত মণিমালিকার যে-রূপটির দেখা পায়, তা ছিল তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আপাতভাবে অপ্রত্যাশিত বলে মনে হলেও, একটু গভীরতর অনুভবের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, মণিমালিকার যে-রূপটি আসলে ফণীভূষণের গহন হৃদয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে, তা-ই স্বপ্নমনস্তত্ত্বের গূঢ়ার্থ বহন করে তার আচ্ছন্ন চোখে এসে ধরা দেয়। একটি কঙ্কাল আদ্যোপান্ত গয়নায় সজ্জিত হয়ে তার ঘাটের সোপান ও প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে থাকে। এই অদ্ভুত রূপকল্পটিকে একধরনের অতিরঞ্জনই (hyperbole) বলা চলে, অথবা প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষাও মিশে আছে অনুক্ত বয়ানে। অর্থাৎ সে যেন কোনো মানুষ নয়। ফণীভূষণের মনে দীর্ঘদিন ধরে ক্রমশ জমাট-বাঁধা মণিমালিকার অমানবিকতার ছবিই যেন স্বপ্নমনস্তত্ত্বের যুক্তিতে এইরকম বাড়াবাড়ির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে[৫]। যেন রক্তমাংসের মায়ায়-বোনা মানবীশরীর তার নয়, হাড়ের শুষ্ক কাঠিন্যই তার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে, যা তার হৃদয়ের কাঠিন্যকে প্রতিস্থাপিত করেই প্রকাশিত হয়। আরও একটি অভিনব বিষয় আমরা লক্ষ করি যে, তার 'অস্থিময়' মুখে শুধুমাত্র চোখ-দুটিই ছিল অদ্ভুতভাবে সজীব, যা থেকে তাকে মণিমালা বলে শনাক্ত করা যায়। পক্ষান্তরে তাকে দেখে ফণীভূষণের চোখ মৃত মানুষের চোখের মতো 'নির্নিমেষ' হয়ে রইল। জীবিত ও মৃতের চোখের এই আশ্চর্য অদলবদল সত্যিই শ্লেষধর্মী। মণিমালিকার 'শুভদৃষ্টি'র স্মৃতি ফণীভূষণের হৃদয়ে যেন সজীব হয়ে বেঁচে

থাকে, আর মণিমালিকাকে কেন্দ্র করে ফণীভূষণের জীবনদৃষ্টি যেন একটানা একবিন্দুতেই স্থগিত হয়ে থাকায় নির্জীবতার সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

কঙ্কালের ফেরার যে-পথ অনুসরণ করে ফণীভূষণও যখন জলের দিকে এগোতে থাকে, সেই পথে আমরা দেখি 'জনশূন্য দীপহীন দেউড়ি'; তা একদিকে যেমন নায়কের জীবনের শোক ও শূন্যতার পরিসরকে চিহ্নিত করতে চায়, আবার তা যেন নায়কের চেতনালোকে নির্বাপিত জ্ঞানের আলোর কথাও বলে। কঙ্কালরূপী মণিমালার চলার পথে খোয়াগুলি যখন 'অস্থিপাতে' কড়কড় করতে থাকে, তা ব্যঙ্গার্থে মণিমালার চরিত্রের সেই নিষ্প্রাণ কাঠিন্যের কর্কশতাকেই জানান দেয়। এরপরের চিত্রকল্পটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ— ফণীভূষণের চোখ দিয়ে আমরা দেখি সেখানে 'ক্ষীণ জ্যোৎস্না' যেন 'ঘন ডালপালার মধ্যে' আটকা পড়ে গিয়ে আর কোথাও 'নিষ্কৃতির পথ' পাচ্ছে না (৩৪৩); উল্লিখিত এই 'ক্ষীণ' জ্যোৎস্না যেন এখানে ফণীভূষণেরই প্রেমাকুল হৃদয়ের ক্ষীণ আশার রূপক, যা 'ঘন ডালপালার মধ্যে' (স্মরণীয় 'পণরক্ষা' গল্পের বাঁশঝাড়) অর্থাৎ যেন গহন মনের নির্জ্ঞান জটিলতার মধ্যে আটকা পড়ে গিয়ে 'নিষ্কৃতির' তথা মুক্তির পথ পাচ্ছে না। এ-ছাড়া জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়েও যে নায়ক তার মৃত প্রেমের প্রেতাত্মার পিছু নিয়ে চলতে থাকে, সেখানে জোনাকির যৌথ আলোর জ্বলা-নেভা কম্পমানতা— তারই কম্পমান হৃদয়বাসনা ও হৃদয়বেদনার কুহককে, কিংবা আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বমদির দোলাচলকে উপস্থাপিত করে। তারপর যখন শেষমেশ তারা ঘাটের দিকে নামতে থাকল (অবনমন?), তখন দেখা গেল "পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা" (ঐ) ঝিকঝিক করছে। 'পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত' জলধারা এখানে বাস্তবিকই মৃত্যুর 'সৃষ্ট রূপকল্প' ('পোস্টমাস্টার' গল্পসূত্রে সমালোচক তপোব্রত ঘোষের কথা অনুযায়ী), আর তার ওপর 'জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা' সেই প্রেমবিহ্বলতারই সম্মোহন: সাক্ষাৎ মৃত্যুর উপরিতলে প্রেমের বিহ্বল আহ্বানের প্রলেপ। তাই যেন ফণীভূষণের আশু পরিণতির আঁচ পেয়ে গাছগুলি 'স্তব্ধ' ও 'খণ্ড চাঁদ' (কেন এই খণ্ডরূপ?) চেয়ে আছে 'শান্ত অবাকভাবে'। গাছ ও চাঁদের এই মানবিকীকরণের মধ্য দিয়ে (সমাসোক্তি) একদিকে যেমন রূপকধর্মিতাও বজায় থাকছে, আবার গাছের স্তব্ধতা ও চাঁদের শান্ত বিস্ময়ের হেতু-অনুমানে জটিলতর এক প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্বও

আমরা শনাক্ত করতে পারি। যেন metaphor-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে metonymy, কাকে আমরা বলব কাব্যভাষা? গল্পটিতে একটি খুব চেনা metaphor 'মণিহারা ফণী'-কেই যেন দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহার করা হয়েছে (যদিও ফণী আর 'ফণিভূষণ' বাচ্যার্থে এক নয়, মণি আর মণিমালিকাও সম্ভবত এক নয়, তবে লক্ষণার্থে ওতপ্রোত সন্দেহ নেই)।

এরপর 'গুপ্তধন' গল্পটির কথা যদি বলি, গল্পের নামকরণের মধ্যেই গল্পের কেন্দ্রীয় রূপকত্ব বিধৃত রয়েছে। অবশ্য এমন প্রায়শই ঘটে— রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অনেক গল্পেও, বা অন্যান্য লেখকের নানা গল্পেও, নামকরণের ভেতর কাহিনির মূল ভাববস্তুকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত কোনো ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞাপিত করা একটি সাধারণ শৈল্পিক প্রবণতা। কিন্তু 'গুপ্তধন' গল্পটিকে আমরা একটু বিশেষভাবে চিহ্নিত করছি, কারণ এই গল্পের ভরকেন্দ্রই হল গুপ্তধনের রূপকত্ব। তা সত্ত্বেও আমাদের মাথায় রাখতে হবে, 'গুপ্তধন' গল্পটি কিন্তু 'তোতাকাহিনী'র মতো কোনো রূপকগল্প বা allegory নয়। গল্পে গুপ্তধনের অনুসন্ধান ও প্রাণপাত প্রচলিত অর্থেই 'গুপ্তধন' হিসেবে প্রযুক্ত। এমনকি রত্নখনির যে বর্ণনা রয়েছে, তাতেও অতিরঞ্জন (hyperbole) রয়েছে, কিন্তু প্রাথমিকভাবে রূপকত্ব (metaphor) নেই বলেই আমাদের মত। এখানে আসলে বাস্তবেরই যেন এক কল্পবিনির্মিত দৃষ্টান্তমূলকতা (deconstructive demonstration) রয়েছে, 'যদি এমন ঘটে, তার ফলাফল কী দাঁড়াবে' জাতীয় কোনো কূটজিজ্ঞাসা যেন। কিন্তু গল্প যত ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগোতে থেকেছে, ততই ধীরে ধীরে রত্নখনি বা স্বর্ণগুহার ব্যতিরেক হিসেবে আটপৌরে জনজীবন আর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্বপ্রকৃতিই উঠে আসতে শুরু করে। অর্থাৎ প্রকৃতির দানই (আলো, হাওয়া, জল কিংবা স্নেহ মায়া প্রভৃতি) যে মানবজীবনের প্রকৃত সম্পদ, তা-ই যেন এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে। আর সেই সম্পদ 'গুপ্ত'— কারণ তার সত্যমূল্য আবিষ্কারে মানুষজন ব্যর্থ। সোনার যদি বিনিময়মূল্য বিন্দুমাত্র না থাকে, সোনাও যেমন পাথরের চাঁই প্রভৃতির সমমর্যাদায় পতিত হয়, প্রকৃতির সেই প্রকৃষ্ট দানগুলিও তেমন যোগ্যমূল্যের অভাবে সাদামাটা মনে হতে থাকে— সেই গভীর যুক্তিবাদই এখানে রহস্যগহন ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। এইভাবেই গল্পটির ভাবার্থগত বিকাশপথে গুপ্তধনের বিবর্তিত তাৎপর্য

বিশ্বপ্রকৃতির সহজ দানের রূপক হয়ে জেগে ওঠে। পক্ষান্তরে মানুষের তীব্র স্বর্ণকামনা তথা উদগ্র বিষয়লালসা যে-বিপজ্জনক পথে মানুষকে নিয়ে যায়, 'গুপ্তধন' অর্জনের সেই যাত্রাপথের বর্ণনার মধ্যে কোথাও কোথাও নিগূঢ় রূপকধর্মিতা আমাদের সতর্ক করে তুলতে চায় যেন। ক্রমান্বয়ে পথের সংকীর্ণতা ও পিচ্ছিলতা যেন তুচ্ছ মনের হীন কুটিলতা ও উপায়ের বিপজ্জনক সম্ভাবনাগুলির কথাই জানাতে চায়, 'গোলাকার' ঘরের ('গোলোকধাঁধা') 'ভাঙা ভিত্তি' থেকে খসে-পড়া পাথরেও রয়েছে মারাত্মক নানা অধঃপতনের ইঙ্গিত। সর্বোপরি 'গভীর কূপ' বা 'ইঁদারা' হয়ে ওঠে লোভের অতলগামী গহ্বরের তথা মৃত্যুর রূপক ('সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পের 'মহাগহ্বর' যেরূপ)— তাতে ওঁৎ পেতে রয়েছে কূপমণ্ডুকতার ব্যঞ্জনা। গুপ্তধনের নকশাপত্র টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে (অর্থাৎ তার মোহময় আহ্বানকে তীব্রভাবে নাকচ করে) সেই 'কূপের মধ্যে' ছুঁড়ে ফেলার মধ্য দিয়েই চরিত্রটি এখানে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে ওঠে।

'মধ্যবর্তিনী' গল্পে প্রতিবেশীদের খিড়কির বাগানের যে বর্ণনা রয়েছে (১৩৯), সেখানে আমরা দেখি 'গোটাকতক ক্রোটন' (যা একসময় এক সময় কেউ 'শখ' করে লাগালেও পরবর্তীতে আর সেদিকে সেভাবে 'দৃক্‌পাত' করেনি), 'শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা' কিংবা 'বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল' ও একটি প্রাচীর ভেঙে জড়ো-হওয়া 'কতকগুলো ইঁট' কিংবা 'দগ্ধাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই' সম্মিলিতভাবে কোনো অবহেলা, অযত্ন, ক্ষয় ও বিনষ্টিকে ব্যঞ্জিত করতে চাইছে। কিন্তু হরসুন্দরী সেদিকে চেয়েই 'আনন্দরস পান' করে; সে তখনো জানতেই পারেনি যে, সেই বাগান তার অদূর ভবিষ্যতেরই ক্রূর রূপক হয়ে অগ্রিম তার চোখে এসে ধরা দিচ্ছে। পরেই দেখা যায়, নিজে সন্তানধারণে অক্ষম বলে, স্বামীর সে দ্বিতীয় বিয়ে দেয়; খুশি মনে ত্যাগস্বীকার করে ভালোবাসার অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায় সে। কিন্তু নতুন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্রম-অনুরক্তি, হরসুন্দরীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন যৌবনবেদনাকে খুঁচিয়ে তোলে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বৃষ্টির বর্ণনায় (১৪৪) 'ঘনঘোর মেঘ' তার হৃদয়ের জমাট বেদনাবাষ্পের রূপক হয়ে দেখা দেয়, সেইসাথে অন্য এক আসন্ন সংকটেরও সূচক হয়ে ওঠে (ক্রমপ্রকাশ্য)। 'অন্ধকার'ও (এমন যে, কাজ করা 'অসাধ্য') তার মনের নিরাশাকে মূর্ত করে, আবার অন্য আরেক ক্রমপুঞ্জীভূত তমোগুণকেও চিহ্নিত করে (ক্রমপ্রকাশ্য)।

আর পাশের নালা দিয়ে বয়ে-চলা 'ঘোলা জলস্রোত' একদিকে হরসুন্দরীর অভিমানধৌত চিন্তাস্রোতের অ-নির্মলতা বোঝায়, অন্যদিকে জীবনের আরও কোনো কলুষিত প্রবাহের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে— সেই স্বার্থপর ঈর্ষাকলুষিত তমোভাব আসলে শৈলবালার, যা তার স্বামীকেও কুটিলতার দিকে তাড়িত করে। কারণ সেইক্ষণেই হরসুন্দরীর কাছ থেকে স্বামীটি থুরি 'পোষ্য পুরুষটি' বিশেষ ছুঁতোয় গয়না চাইতে আসে। শেষকালে শৈলবালার মৃত্যুর পর তার বিষয়ে যদিও স্বামীটি উপলব্ধি করেছে যে, 'মাধবীলতার মতো' সেই 'কোমল জীবনপাশ' যে ছিঁড়ে গেল, আসলে তা ছিল তার 'উদ্‌বন্ধনরজ্জু' (১৪৭), তবু একটি 'মৃত বালিকা' (যেন) উভয়ের মাঝখানে শুয়ে থাকে। অর্থাৎ মৃত বালিকার স্মৃতি ও তার চেয়েও বড়ো তার অভিঘাত, তা-ই তাদের পুনর্মিলনের সম্ভাবনার অনতিক্রম্য ছেদক বা বিভাজিকা হয়ে শুয়ে থাকে।

এ-ছাড়া 'ব্যবধান' গল্পে একটি নালা (ও পাতিলেবুর গাছ) দুই বাড়ির মধ্যবর্তী সীমারেখা হিসেবে শুধু নয়, কূটনৈতিক কার্যকারণসূত্রে দুই পরিবারের ও সেইসূত্রে দুই ভ্রাতৃবন্ধুর সম্পর্কের মধ্যবর্তী বিচ্ছেদরেখা হিসেবেও বিবর্তিত হয়। হিমাংশুদের বাড়ির জানলা একে একে বন্ধ হওয়ার সেই সৌহার্দ্যের পরিসর রুদ্ধ হওয়াই বোঝায়, আর 'দরজার ফাঁক দিয়া যে দীপালোকরেখা' (২৯) বনমালীর চোখে ধরা দিচ্ছিল তা নিঃসন্দেহে তার হৃদয়ের ক্ষীণ আশার সূচক। পুনর্মিলনের সম্ভাবনা ক্রমে ক্রমে অবরুদ্ধ হওয়া ও প্রত্যাশা ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হওয়া— এখানে 'দ্বার' একে একে রুদ্ধ হওয়া ও 'আলো' একে একে নিভে যাওয়ার (৩০) চিহ্নায়কে উপস্থাপিত। এ-ছাড়া 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে 'কদম্বফুলের গাড়ি' শিশুর অতিতুচ্ছ জীবনপথের সঙ্গে কী যেন এক বেদনানিবিড় ব্যঞ্জনায় অন্বিত হয়ে যায়। কিংবা 'ছুটি' গল্পে খালাসিদের জল-পরিমাপক বুলি ও তলহীনতার ইঙ্গিত যখন ফটিকের জ্বরের প্রলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন সেই ইশারাকে অবলম্বন করে অকূল অতল সমুদ্র এখানে মৃত্যুরই রূপক হয়ে ওঠে।

সবশেষে 'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পটি দিয়েই আমরা আমাদের আলোচনা গুটিয়ে আনার চেষ্টা করব। গল্পে আমরা বালকদের দুষ্টুমির সূত্রে দেখি, দাদুর গামছা নাতির পাগড়ি হয়ে শোভা পাচ্ছে (৪৪)। দাদুর সাদামাটা ব্যবহারিক বংশপরিচিতিই কি

মালিকানাস্বত্ব বদলে নাতির কাছে গিয়ে বংশমর্যাদার সম্মানসূচক শিরোপা হয়ে উঠছে? অর্থাৎ নাতির ছদ্মনাম তথা ছদ্মপরিচয়ের আড়াল সত্ত্বেও উত্তরাধিকারের সম্ভাবনাটুকু এইভাবেই হয়তো ব্যক্ত হয়েছিল— যজ্ঞনাথ সেই সংকেতটুকু অনুধাবন করতে পারেনি। তার গায়ের কাছে 'বন্ধনমুক্ত গিরগিটি' ছেড়ে দিয়ে তাকে বিচলিত করে তোলার মধ্যে গিরগিটির রূপকত্ব নিহিত রয়েছে, গিরগিটির গায়ের রঙ বদলানোর গুণপনা মানবচরিত্রের স্বার্থপর সুবিধাবাদী পরিবর্তনশীলতার রূপক হিসেবে লোকমুখে যথেষ্টই প্রচলিত (সেই হিসেবে গহন মনের জটিল চেহারা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' গল্পে এই চিহ্নের কুটিল প্রয়োগ আমরা পরে লক্ষ করব)। এখানেও কি যজ্ঞনাথের গহন স্বভাবেরই কোনো ইঙ্গিত সর্বজ্ঞ কথক দিতে চান? এ-ছাড়া তাকে 'চামচিকে' বলার মধ্যে অসাধারণ এক প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে আমরা মনে করছি। ছেলেরা কেন তাকে এই রূপকে ভূষিত করত, আখ্যানে তার অনুমিত কারণ 'শরীরগত সাদৃশ্য' ('রক্তহীন শীর্ণ চর্মের' ওপর ভিত্তি করে)। কিন্তু এই সন্দর্শনে অনুক্ত রয়েছে স্বভাবগত সাদৃশ্যের কথাটি। চামচিকে বা বাদুড়কে রক্তচোষক প্রাণী হিসেবে দেখা হয়, আর রক্ত রূপকার্থে জীবনেরই নির্যাস, সেইসূত্রে যে-মানুষ ধনসম্পত্তি কুক্ষিগত রাখার তাড়নায় (অথবা অন্য কোনো স্বার্থে) নিঃসাড়ে অন্য মানুষের জীবনের নির্যাস অবধি শোষণ নিতে পারে, তাকেই চামচিকের সমতুল হিসেবে গণ্য করা হয়। যজ্ঞনাথের ক্ষেত্রেও আমরা তারই প্রতিফলন লক্ষ করি। সে যে-মন্দিরে অসাধু উদ্দেশ্যে নিতাইকে নিয়ে যায়, তাই সে মন্দির 'ভাঙা' ও 'দেবতাহীন'। তাই তার অন্তিম পরিণতিও হয়ে ওঠে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। 'মহামায়া' গল্পের শেষে আমরা দেখেছিলাম, মহামায়ার জীবনের বস্তুগত ট্রাজেডি রাজীবের জীবনের ভাবগত ট্রাজেডির রূপক হয়ে উঠেছে, তেমনই 'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পেও নাতি নিতাইয়ের জীবনের বস্তুগত ট্রাজেডি দাদু যজ্ঞনাথের জীবনের ভাবগত ট্রাজেডির রূপক হয়ে উঠেছে। যজ্ঞনাথ মই তুলে নেওয়ায় বালক নিতাই যেমন মই না পেয়ে রুদ্ধ গহ্বর থেকে বেরোনোর উপায় না পেয়ে মাটিতে মৃত্যুর কোলে পতিত হয়েছিল, যজ্ঞনাথও তেমনি 'বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর' থেকে ওঠার জন্য 'মই' খুঁজে না পেয়ে বিছানায় মৃত্যুর কোলে পতিত হল (৪৭)। নিতাইয়ের অপ্রাপ্ত মই ছিল বস্তু, আর যজ্ঞনাথের অপ্রাপ্ত মই বহন করছে অবস্তুর

ব্যঞ্জনা। নিতাইয়ের হন্তারক গহ্বর ছিল বস্তুলোকের, আর যজ্ঞনাথের হন্তারক গহ্বরটি এখানে মানসলোকের, তা আসলে তার ধনসম্পত্তির মোহ বা বিষয়লালসা ও বিষয়মমতার রূপক ('মহাগহ্বর' যেন মোহেরই দীর্ঘায়তন গহ্বর)। আর সেই মোহের গহ্বর থেকে তার উদ্ধার পাওয়ার উপায়মাত্রেই মই— এখানে তা হতে পারত তার গভীরতর স্নেহ, আর তা যাকে কেন্দ্র করে স্ফূরিত হতে পারত, সে ছিল তার নাতি। নিজের নাতির প্রতি সরল মমতাই তাকে তার সম্পত্তিমমত্বের গহ্বর থেকে মুক্তি দিতে পারত। সুতরাং তার মৃত নাতিই তার জীবন থেকে ঈশ্বরের তুলে-নেওয়া মই। এইভাবেই বস্তু ও ব্যঞ্জনার সমঝোতামূলক সহাবস্থান আমরা রবীন্দ্রনাথের গল্পে লক্ষ করি।

সুতরাং সব মিলিয়ে এই অবধি আলোচিত নানারকমের ব্যঞ্জনাপূর্ণ নমুনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে যে-কয়েকটি ধরন আমরা আবিষ্কার করতে পারছি, সেগুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি চালচলনে বর্গায়িত করতে পারি—

১. রূপক যেখানে প্রকট ও প্রবচনধর্মী: কখনো কখনো খুব প্রথাগত ছাঁচে লেখক কোনো-না-কোনো প্রাচীন, প্রচলিত বা বহুকথিত চিহ্ন-সূচকের প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন কোনো বিশেষ বক্তব্যকে পেশ করতে গিয়ে। যদিও সেখানে অতিশয়োক্তির আড়ালটুকু থাকছে, কিন্তু আখ্যানের পরিপুষ্ট রূপকধর্মিতা পাঠকের অগোচর থাকছে না কোনোভাবেই; কারণ পাঠকের বহুযুগব্যাপী ব্যঞ্জনাবোধের সঙ্গে তা সংযুক্ত ও সাযুজ্যপূর্ণ। যেমন 'একটা আষাঢ়ে গল্প'-তে অঙ্কিত দ্বৈপায়ন তাসের রাজ্য বা তাসরমণী, *লিপিকা*-র 'তোতাকাহিনী'-তে বর্ণিত তোতাপাখিটি, কিংবা 'কর্তার ভূত' গল্পে 'ভূতুড়ে জেলখানা', অথবা সমাজরূপ পেষণযন্ত্র বা উৎপাদনযন্ত্র হিসেবে উল্লিখিত ঘানি, *গল্পসল্প*-এর 'বড়ো খবর' শীর্ষক পরিচ্ছেদে পাল ও দাঁড়ের দ্বন্দ্ব, নৌকা, এমনকি নৌকার মাঝি অবধি, *সে*-তে শিবুনাথ শেয়ালের আখ্যান কিংবা দুইপ্রকার বাঘের বৃত্তান্ত— সবকিছুই এই পরিসরটিতে প্রকাশ করা চলে।

২. রূপক যেখানে সটীক ব্যাখ্যাধর্মী: বহু ক্ষেত্রে হয়তো-বা সমকালীন পাঠকবৃত্তের বোধগম্যতার সীমারেখা-সংক্রান্ত সংশয়-দ্বিধার কারণেই, আমরা দেখি,

লেখক তাঁর প্রযুক্ত রূপকের ব্যাখ্যাটিপ্পনী যোগ করতে উদ্যত হয়েছেন। পূর্বোক্ত কাঠঠোকরা ও কাদাখোঁচার রূপকটি যেমন, আদতে প্রবচনধর্মী লৌকিক, তবু সেখানে গল্পকথক তাঁর উদ্দেশ্যমূলকতা পরিহার করতে পারেননি। এমনকি শিবুনাথ শেয়ালের মতো একটি নিটোল রূপকের ক্ষেত্রেও সেটি যে 'আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি' তা তিনি পাঠককে *সে*-র মুখ দিয়ে সচেতন করিয়ে দিতে ভোলেননি। তবে এগুলি ন্যূনতম নমুনা যদিও, আরও নানা গুরুতর উপাত্তের দেখা আমরা পেয়ে যাই রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে। রূপকাতিশয়োক্তি সরলীকৃত হয়ে পড়েছে দেখি উত্তোলিত উপমায়। যেমন, 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে 'শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘট' যে বৈদ্যনাথের জীবনদৃষ্টির তাৎক্ষণিক শূন্যতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক ভগ্নদশারই উপমান, তা লেখকের (author) নির্দেশমাফিক আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না; অথবা 'সমাপ্তি' গল্পের সূচনায় বর্ণিত আকাশ ও নদীর প্রফুল্লতা যে আসলে অপূর্বকৃষ্ণের মানস-পরিস্থিতিরই দ্যোতক, তাও লেখকের তৎপরতায় পরক্ষণেই আমরা উপলব্ধি করতে সফল হই।

৩. প্রচ্ছন্ন রূপক: উপরোক্ত দুই গোত্রের রূপকধর্মিতা ব্যতিরেকেও রবীন্দ্রনাথের আপাত বস্তুগত বর্ণনাগুলির মধ্যেও দেখা যায় অজস্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপকধর্মিতা আংশিক ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় রয়েছে— যেগুলিকে সক্রিয় পাঠক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শনাক্ত করতে হয়, এবং কখনো কখনো এমনকি তা বিতর্কমূলকও হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে এই ধাঁচটিকেই আমরা বলতে চাইছি প্রচ্ছন্ন রূপক[৬]। অর্থাৎ আপাত একটি আভিধানিক আলাপনে, প্রতিনিধিত্বমূলক পরিসরের ভিতর, লুক্কায়িত কোনো রূপকভাষ্যের প্রবালদ্বীপ। বস্তুত রবীন্দ্রমানসের সাহিত্যরুচিগত যে বিশেষ দ্বান্দ্বিকতার কথা আমরা বলছিলাম, তার নিবিড় সুফল আকারে, পূর্বোক্ত দুই প্রবণতার এপপ্রকার সংঘাত-সমঝোতার ফসলরূপেই একপ্রকার, আমরা এই ঝোঁকটিকে অনুভব করছি, যা ভাবীকালের কথাসাহিত্যেও অন্যতম অনিবার্য নিয়ন্তা হিসেবে লীলাচরণ করছে। যেমন, 'দুরাশা' গল্পে যমুনার নির্জন খেয়াঘাটে কেশরলালের নিরালা জীর্ণ নৌকা অথবা 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে 'সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের' মধ্য দিয়ে চলা শশীভূষণের নৌকা, 'মহামায়া' গল্পে

মন্দিরের 'অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট' কিংবা ভাঙা ঘাটের সোপানে নদীর জলের ছন্দোময় আঘাতের ধ্বনি, প্রতিকূল ঝড় কিংবা উড়ন্ত কাঁকর, 'নষ্টনীড়' গল্পে অমলের মশারির ওপর কারুকাজ রাখার বাসনা, 'জীবিত ও মৃত' গল্পের প্রদীপ-নেভা অন্ধকার, অথবা আরও একটু বিতর্কিতভাবে 'সমাপ্তি' গল্পে মহাজনী ইঁটের পাঁজা বনাম কাদার পিচ্ছিলতা ও 'পণরক্ষা' গল্পের বাঁশঝাড়ের বর্ণনা প্রভৃতি এই গোত্রের দৃষ্টান্ত। এছাড়া এমনকি *সে* গ্রন্থে মনুমেন্ট লেহনকে কেন্দ্র করে বিবাদ-বিসম্বাদের যে পরিবেশ, তা আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট হলেও, তাকেও আমরা প্রচ্ছন্ন রূপক হিসেবেই চিহ্নিত করতে চাইছি।

৪. প্রত্নপ্রতীকের পুনর্গঠন: যেখানে একটি কোনো পরিচিত প্রতীকভাবনা, যেটিকে ভেঙেচুরে নতুন পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হচ্ছে, বিশেষরকম বিকল্পায়নের মধ্য দিয়ে তাকে নতুনতর তাৎপর্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন, *লিপিকা*-র 'সুয়োরানীর সাধ', 'রাজপুত্তুর', 'ভুল স্বর্গ', 'পরীর পরিচয়' প্রভৃতি গল্পে এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

৫. প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব: প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব বলতে আমরা বলতে চাইছি সেই বিশেষ যুক্তিবিভ্রমের কথা— যেখানে কোনো বিশেষ ফলাফলের পূর্বপ্রান্তে প্রযুক্ত (অথবা নিম্নতলে নিযুক্ত) প্রধান বা প্রকৃত কারণটিকে শনাক্ত করতে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে, বা তাকে বলপূর্বক উপেক্ষা করে, অন্য কোনো ছদ্ম বা গৌণ কারণকে উপস্থাপন করা হয়। যেমন এই বিষয়ে গেছো বাবার উপাখ্যানটির কথা আমরা আগেই বলেছি। এ-ছাড়া যেমন 'মণিহারা' গল্পে, ইস্কুলমাস্টারের কথার ফাঁকে শেয়াল ডেকে ওঠার ছদ্ম কারণ নির্দেশ করা হয় এই বলে যে, ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনেই যেন তারা হেসে উঠেছে (৩৩৭)। কথকের উদ্দেশ্য এখানে কৌতুকরস সৃষ্টি করা, সেইসাথে সেই 'ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি'র গুরুত্বকে অস্বীকার করাও বটে। 'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পে যজ্ঞনাথকে 'চামচিকে' বলার উদাহরণটিও স্মরণযোগ্য। কখনো এই প্রক্রিয়াটি শ্লেষ বা irony গোছের উপাত্তগুলির গভীরতলেও নিযুক্ত থাকে। যেমন, 'নিশীথে' গল্পে মালিশের ওষুধ 'শয্যাপার্শ্ববর্তী'

টেবিলে রেখে রোগীকে তা খেতে বারবার নিষেধ করা আসলে বক্তার বিপরীত অভিপ্রায়কে ব্যঞ্জিত করে।

৬. বিমিশ্র বা অবর্গীকৃত ব্যঞ্জনা: এবং যথারীতি এসবের বাইরেও আরও কিছু উদাহরণ রয়ে যাচ্ছে, যেগুলিকে হয়তো উপরের কোনো গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত সেভাবে করা যাচ্ছে না, কিছু বিমূর্ততার বাস রয়ে যাচ্ছে, গোলাকার কোনো অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে না, অথবা একাধিক পরিকাঠামো উদ্ভটভাবে মিলেমিশে যাচ্ছে, সেগুলিকে কিঞ্চিৎ খাপছাড়াভাবে উত্থাপনের চেষ্টা করা চলে, যদিচ কোনো নিটোল মীমাংসায় পৌঁছানো দুষ্কর।

এইসূত্রে আমরা জগদীশ গুপ্তের কথাও খানিক উল্লেখ করতে চাই। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর শুরুর যুগের অন্যতম একজন লেখক জগদীশ গুপ্ত। এখানে তাঁর লেখার অবতারণা করার অন্যতম কারণ হল, রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে তাঁর ভাষাভঙ্গির এক তুলনামূলক দূরত্বের বিষয়কে বুঝতে চাওয়া। রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্যিক ও রূপকবহুল ভাষাব্যবহারে তিনি আগ্রহী নন, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তাঁর অনাড়ম্বর বাক্যই অনেক বেশি অব্যর্থ প্রকাশ হয়ে দেখা দেয়। যেমন 'পয়োমুখম্' গল্পের মণির মৃত্যুদৃশ্যটি— "সিঁথিভরা সিঁদুর লইয়া, লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া, আলতায় পা রঞ্জিত করিয়া খেলার পুতুল একরত্তি মণি কাঠের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলো।" (৬৬) এখানে 'খেলার পুতুল' কথাটিতে নিবিড় বেদনা এক অপরিসীম গভীরতায় সংহত হয়ে রয়েছে। আবার 'দিবসের শেষে' গল্পে দেখি, পাঁচুকে কুমিরে নেওয়ার অনিবার্য নিয়তি শেষমেশ সত্যি হয়েই দেখা দেয়। এটিকে একটি নিয়তিবাদী গল্প হয়তো অনেকেই বলবেন, কিন্তু আমরা একটু এটিকে অন্যভাবে ভাবতে প্রয়াসী। আমাদের মতে এই কুমির সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার অনিবার্য আগ্রাসনেরই রূপক। পাঁচু নামে ছোটো ছেলেটি আসলে ভাবী প্রজন্মের প্রতিনিধি। ভাবী প্রজন্ম, মানুষের উত্তরাধিকারই যেন ক্ষমতার অনিবার্য গ্রাসে তলিয়ে যাবে, এই নিষ্ঠুর বার্তাই এখানে ঘোষিত হচ্ছে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিপ্রতীপতায় তাঁর ভাষা এখানে যুক্তিনিষ্ঠ, প্রখর ও তাত্ত্বিক। 'চন্দ্র-সূর্য-যতোদিন' গল্পেও শাণিত ও সূচাগ্র ভাষায় ক্ষণপ্রভার সংকটকে

তুলে ধরা হয়েছে, আর গল্পের তার নগ্নতা যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে সমাজের মননে। উন্মাদ অবস্থায় যাবতীয় পোশাক ত্যাগ করার অর্থ যাবতীয় পরিচিতিকেই অস্বীকার করা, এইভাবে সেই নারীর সত্তা পুরুষতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. লক্ষণীয়, শশীভূষণকে বারবার 'ক্ষীণদৃষ্টি' যুবক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (১৯১, ২০৭), এমনকি তাকে 'অন্ধ পুরুষ' বলেও উল্লেখ করা হয় (১৯১, ১৯৯)। আমাদের সন্দেহ জাগে— দৃষ্টির এই যে ক্ষীণতা কিংবা অন্ধত্ব, তা কি কেবল নায়কের চর্মচক্ষুর, নাকি মর্মচক্ষুরও বটে? বিশেষত গিরিবালার বিষয়ে তার যে মৃদু ঔদাসীন্য নানাসময়ে পরিলক্ষিত হয়েছিল (অন্তত গিরিবালার অভিমানের নিরিখে), তার সাপেক্ষে এরকম মনে হতেই পারে। এবং শশীভূষণের সম্বন্ধে এইধরনের বিশেষণও প্রায় সর্বত্রই গিরিবালার প্রসঙ্গসূত্রেই ব্যবহৃত হতে দেখি, বিশেষত গিরিবালার সঙ্গে তার সম্পর্কের রসায়নের ক্ষেত্রগুলিতে। গল্পের নামকরণটিও এমনকি তাদের এই খেলা-খুনসুটির রসায়নের রূপক হিসেবেই। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে বারবার এই রূপকের পুনরাবৃত্তি করেও লেখক ক্ষান্ত হননি, পরিচ্ছেদের প্রায় শেষাংশে রূপকটির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে (১৯১-১৯৩)। যা সেই সময়েরই পাঠক-লেখক যোগাযোগের অন্যতম একটি মোটিফ।

২. এখানে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো, এই গল্পের নারীচরিত্রটি নিজের বিয়েকে তুলনা করেছে মাছকে বঁড়শিতে গেঁথে 'স্নিগ্ধগভীর জন্মজলাশয়' থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার দৃশ্যের সঙ্গে, আর স্বামীকে তার মনে হয়েছিল 'সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব'— এই সূত্রে আমাদের মনে পড়বে *কঙ্কাবতী* উপন্যাসেও মাছ ও কঙ্কাবতীর প্রতিপক্ষ হিসেবে বঁড়শিধারী জেলেরা কীভাবে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে অন্বিত হয়ে গিয়েছিল।

৩. কিন্তু দক্ষিণাচরণের এই অনুতাপের উৎস কী? তপোব্রতবাবু যে সেই প্রসঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন (পূর্বোক্ত), তা আমরা আগেই বলেছি। আত্মহত্যার বিষয়ে পরোক্ষ প্ররোচনার ক্ষেত্রে যে হারান ডাক্তারেরই হাত রয়েছে তা আমরা গল্প থেকে টের পাই, কিন্তু তার সঙ্গে দক্ষিণাচরণের ঔদাসীন্য ও অন্যাসক্তি জুড়ে গিয়েই যেন তা অসুস্থ নারীটিকে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের দিকে ক্রমশ ঠেলে দিয়েছে। এমনকি তা যে আত্মহত্যা, ভুল করে বিষাক্ত ভিন্ন ওষুধ খেয়ে নেওয়ার কারণে অপমৃত্যু নয়, তাও গল্পে সরাসরি ব্যক্ত নয়। বরং তা অসুস্থতাজনিত ভুল হিসবেই গল্পে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, তা আসলে ছদ্ম কারণ (যেটি কার্যত দক্ষিণাচরণের বয়ানে উপস্থাপিত)। ব্যথার ওষুধের আর বিষাক্ত মালিশের ওষুধের শিশি 'শয্যাপার্শ্ববর্তী' টেবিলে রেখে মালিশের বিষাক্ত ওষুধ খেতে বারবার 'নিষেধ' করাটুকু এখানে বিপরীত শ্লেষ বা irony আকারে বিষ খাওয়ার প্ররোচনাই লুকিয়ে রাখছে। এই বিপরীত শ্লেষ বা irony এসব ক্ষেত্রে প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্বেরই একটি চূড়ান্ত পর্যায়। আসলে মনস্তত্ত্বপ্রধান বা গোয়েন্দামূলক বা যে-কোনো সুলিখিত রহস্যকাহিনির শরীর গঠিত ও পঠিত হয় অধিকাংশত এই প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যকারণতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই, সামগ্রিকভাবে যা হেতুবাচক নির্দেশকেরই একটি সংস্করণ। এ-ছাড়া বিশেষত মনস্তত্ত্বপ্রধান কাহিনির ক্ষেত্রে পরাবাস্তবতা (আমরা বলি: স্বপ্নবাস্তব) একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক হয়ে দেখা দেয়। পরবর্তীতে আখ্যানের পরাবাস্তবতাকেও আমরা হেতুবাচক নির্দেশকের একটি প্রকৃষ্টতম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছি। অর্থাৎ অদ্ভুত যা কিছু ঘটছে, যেন স্বপ্ন বা বিভ্রমের মধ্যেই ঘটছে, এবং তার গভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুক্ত ও নিহিত রয়েছে চরিত্রের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের গহনে। 'নিশীথে', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা' প্রভৃতি গল্পের সঙ্গে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিকেও আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে প্রয়াসী (গল্পটির আলোচনা পৃথক পরিসরের হকদার, তা-ছাড়া এক্ষেত্রেও তপোব্রতবাবুর বইতে গল্পটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থাকায় আমরা আপাতত সেই পুনরাবৃত্তির মধ্যে গেলাম না)। এমনকি দেখতে গেলে 'গুপ্তধন' গল্পটিকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠের প্রস্তাব পেশ করা চলে। গল্পের ঘটনাসমূহ যেন মৃত্যুঞ্জয়ের

স্বপ্নের মধ্যেই ক্রমশ রূপ লাভ করেছে, সেদিক দিয়ে দেখলে হয়তো তার জীবনের আর্থসামাজিক অপ্রাপ্তি তথা হাহাকারই ব্যঞ্জিত হয়ে উঠবে; আর সেক্ষেত্রে তার আপাত মহৎ সত্যোপলব্ধি, 'আঙুর ফল টক' জাতীয় মনস্তত্ত্বের মধ্যে বিপর্যস্তও হয়ে পড়তে পারে।

৪. রবীন্দ্রগল্পের রূপকধর্মিতার কথা উঠলে 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' গল্পদুটির কথা অনেকে বলতে চান। এ-কথা ঠিক যে ঘাট যেহেতু কথক, আর সেহেতু সে মানুষের ভাষাতেই কথা বলে, প্রায় মানুষের মতো করেই জীবনকে দেখে, তাই এখানে যেন নির্জীব ঘাটের মানবিকীকরণের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে একটি বৃহদাকার সমাসোক্তিই গঠন করা হয়েছে। আর অভেদকল্পনামূলক অর্থালংকার হিসেবে সমাসোক্তি যেহেতু metaphor-এরই গোত্রাধীন, তাই ঘাটের উপস্থাপনে রূপকত্বও রয়েছে বলা যায়। কিন্তু তা কীসের রূপক? মানুষের। কেমন মানুষ? ব্যক্তিমানুষ কি এতখানি দীর্ঘজীবী? নইলে অনেক মানুষের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার সমষ্টি? কিন্তু সত্তা তো এখানে একক ও বৈচিত্রহীন? সুতরাং উপমেয়ের চেহারায় যে অস্পষ্টতা রয়েছে (blurriness) রয়েছে, তাতে রূপকধর্মিতাও যেন খানিক সংশয়ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। অবশ্য বিমূর্ত হলেই যে তাকে রূপক বলা যাবে না, তাও নয়। এখানে বিশেষত যা দেখা যায়, তা হল কথনরীতির অভিনবত্ব। কথক এখানে উত্তম পুরুষ হলেও যে প্রথাগত মানুষ-কথক নয়, আবার তার সর্বজ্ঞ কথক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সর্বজ্ঞ কথক যিনি, স্থান-কাল-পাত্র এই তিনের নিরিখেই তাঁর এক ঐশ্বরিক সর্বত্রগামিতা রয়েছে। আমার মানুষী উত্তম পুরুষ কথক যে, পূর্বোক্ত তিনের নিরিখেই তার গম্যতা যথেষ্ট সীমিত। এখানে ঘাট যে কথক, কালগত বিচারে তারও প্রায় সর্বজ্ঞ কথকের মতোই দীর্ঘগামিতা লক্ষণীয়, আবার স্থান ও (যেন তারই ফলে) পাত্রের নিরিখে তার অভিজ্ঞতার পরিসর মানুষের চেয়েও সীমাবদ্ধ। আর রাজপথের ক্ষেত্রে কালের পাশাপাশি স্থানগত বিচারে দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে গম্যতা অনেক বেশি হলেও প্রস্থের দিক দিয়ে গম্যতা অনেকই কম। তবে এদের দীর্ঘজীবিতাকে যদি অতিরঞ্জন (hyperbole) হিসেবে ধরে নিই, সেক্ষেত্রে ভূয়োদর্শী কোনো প্রবৃদ্ধ বা প্রবৃদ্ধা মানুষের রূপক এদেরকে বলাই যায়।

৫. পাশাপাশি আরেকটি বিষয় যথেষ্ট শ্লেষাত্মক (ironical): 'কঙ্কাল' গল্পের কঙ্কাল জীবন্ত নারীত্বে উদ্‌ভাসিত হয়েছিল, পক্ষান্তরে 'মণিহারা' গল্পের এই জীবন্ত নারীটি (তার স্বামীর মগ্নচেতনায়) যেন কঙ্কালের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে।

৬. বলে রাখা উচিত যে, এখানে প্রচ্ছন্নতা কেবল রূপকত্বের নয়, আখ্যানের বহুমাত্রিক বয়ানেরও। অর্থাৎ 'প্রচ্ছন্ন রূপক' বলতে আমরা 'implied metaphor' বোঝালেও, 'implied metaphor' মাত্রেই তা 'প্রচ্ছন্ন রূপক' নয়। আসলে পরিচিত ও 'প্রবচনধর্মী' যেসব 'metaphor' রূপকাতিশয়োক্তি বা সমাসোক্তি আকারে রয়েছে, সেগুলিও 'implied metaphor' হিসেবেই ধার্য, কিন্তু সেগুলির রূপকধর্মিতা ঢের বেশি প্রকট ও একমুখী; আড়ালটুকু সেখানে শিফন পর্দার মতোই নগণ্যপ্রায়। পক্ষান্তরে আমরা যেগুলিকে 'প্রচ্ছন্ন রূপক' বলছি পোশাক তাদের দেহে পুরু চাদরের মতোই গম্ভীর।

৩.৩. ভাবীকালের গল্পকাঠামোয় প্রচ্ছন্ন রূপকের সম্ভাবনাময় সম্ভার

প্রচ্ছন্ন রূপকের ও প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব প্রভৃতি জটিল বাঙ্ময় নির্দেশকের আরও বিচিত্র কুটিল প্রয়োগ-সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত দাখিল করতে গিয়ে আমাদের যারপরনাই বিব্রত ও বিভ্রান্ত হতে হয়েছে। 'কল্লোল-যুগ' বা আনুষঙ্গিক বা তৎপরবর্তী কথাসাহিত্যপুঞ্জের বিপুল তরঙ্গমালা থেকে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তুলে ধরার কাজ বাস্তবিকই মনে হয়েছে দুরূহ। সেক্ষেত্রে মূলত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখের কিছু কিছু গল্পকে আমরা খাপছাড়াভাবে বেছে নিয়েছি—আখ্যানের গহনতলে নিহিত নানান জটিল মুখঢাকা রূপক-নির্দেশকের বাচ্যাতিরিক্ত তাৎপর্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর জন্য; এবং এই গোত্রেরই আরও বিশেষতর উৎকর্ষ অনুধাবনের জন্য, সময়ের নিরিখে আরও কয়েক দশক ভাবীকালের দিকে ও ভূগোল-রাষ্ট্রের নিরিখে আরও কয়েক যোজন পূর্বপ্রান্তে সরে গিয়ে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাস ঘেঁটে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি অদৃশ্য অনুক্ত আপাত-সরল রূপক-নির্দেশকের সম্ভাবনাময় সম্ভার। বলা বাহুল্য, উপাত্ত হিসেবে আরও নানানবিধ পাঠকৃতির গহনে আমরা হয়তো-বা অবগাহন করতেও পারতাম, কিন্তু তাতে করে আমাদের সামগ্রিক সিদ্ধান্তের খুব-খানিক রদবদল হত বলে বা আমাদের পাঠপ্রত্যয়গত প্রধানতম প্রবণতার বিশেষ কিছু হেরফের হত বলে আমাদের মনে হয়নি।

দেশভাগের প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে লেখা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মধুবন্তী' গল্পটি দিয়েই আপাতত আলোচনায় প্রকাশ করা যাক। গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, "দু-ধারে কলোনি, মাঝখান দিয়ে বাঁধের মত বেরিয়ে গেছে রেলের লাইন।" (গঙ্গোপাধ্যায়: ১৩৯৪: ২১২) এইভাবে গল্পের প্রথম বাক্যটিই যেন খানিক আভাসের মধ্য দিয়ে দেশভাগের স্মৃতি ও ব্যঞ্জনা বয়ে নিয়ে আসে পাঠকমনে। নির্দেশক হিসেবে তো বটেই, এমনকি রূপক আকারেও 'রেললাইন' হয়ে ওঠে 'মূর্ত' এক 'পার্টিশান', তার দুইপাশে দুই কলোনি যেন দুটি আলাদা পৃথিবী।

দেশবিভাগ মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান এনেছিল, তার অতিপরিচিত একমাত্রিক সমীকরণ এখানে নেই; নেই হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ঘনায়মান বা

ঘনীভূত বিরোধের সরল রূপরেখা; বা একবাংলায় রয়ে-যাওয়া ও একবাংলায় চলে-যাওয়া বাঙালির বিচ্ছেদ, বিষাদ বা স্মৃতিচারণের বিলাসও নেই (অবশ্য একেবারেই যে নেই তাও নয়)। এখানে গল্পের চরিত্রেরা প্রায় সকলেই দেশভাগের তাড়নায় পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে-আসা হিন্দু। অথচ ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে-আসা মানুষগুলির মধ্যেই আশ্রয়প্রাপ্তির প্রশ্নে দেখি, ভাগ্যের বিচারে বা সামর্থ্যের বিচারে স্পষ্ট একটি বিভাজনরেখা তৈরি হয়ে যায়; মাঝখান দিয়ে ছুটে যায় পার্টিশন কিংবা রেললাইন, গড়ে ওঠে দুই পৃথিবী, দুই দেশ, দুই কলোনি।

দেশভাগের মতোই এখানেও বাঁধের পূর্ব ও পশ্চিম। 'পুব দিকের উঁচু ডাঙা জমি'-তে মানুষগুলি জীবনযাপনের নানান সুযোগসুবিধা ও শৌখিনতা নিয়ে বসবাস করছে। তাকে বলা হচ্ছে 'অভিজাত উপনগর' (পূর্বোক্ত)। গল্পের যিনি কথক, তিনি যদিও এই কলোনির কেউ নন, এই শৌখিনতার কেউ নন, তবু তিনিও কোথাও যেন বোধে ও চাহিদায় মোটামুটিভাবে একই আর্থ-সামাজিক স্তরের জীব, একই জীবনচর্যার অংশীদার। পরিচিত ভদ্রলোকের নবনির্মিত গৃহে নিমন্ত্রণ, দক্ষিণের 'গোল' (ভাবাদর্শগত বৃত্ত) বারান্দায় বসন্তবাতাস, টবে আনন্দিত ফুলগুলি, আর ভদ্রলোকের বিদূষী স্ত্রীর সেতারে মধুবন্তী রাগ তাঁকেও কেমন যেন আসক্ত করে তোলে, অদ্ভুত এক নেশা ধরিয়ে দেয়, এক শৌখিন স্মৃতিপ্রবাহে ভাসিয়ে দিতে চায়। হিজলগাছের তলায় জয়া নামের এক কিশোরীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে তাঁর। খাল পেরিয়ে হিজলগাছ, লণ্ঠনের আলো ও অন্ধকার, আর একটি আবেগঘন মুহূর্তের ছবি, সব মিলিয়ে এক রোম্যান্টিক বিষাদ তাঁর মনে জেগে ওঠে। তখনও তিনি ভাবতে পারেননি যে, দীর্ঘ বারো বছর চলে গেছে, আরও জীর্ণ শিথিল হয়েছে বুনন, এবং যে-জয়াকে একদিন তিনি লণ্ঠন হাতে খাল পার করে দিয়েছেন, আজ তাঁর ও জয়ার মধ্যিখানে সেই খাল হয়ে উঠেছে তাদের প্রেমের বা পরিচিতির মধ্যবর্তী একটি ব্যবধানরেখারই রূপক।

ঘটনাচক্রে জয়ার বাস রেললাইনের উল্টোদিকের কলোনিতেই। পুবের কলোনি থেকে কলকাতায় ফেরার সময় একটি বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে কথকের এ-কথা মনে পড়েছিল। জয়ার দাদা নীরদও কথকের বন্ধু, আর জয়ার বাবা যতীন মিত্র কথকের গ্রামসুবাদে কাকা। ওদের পরিবার ঠাঁই লাভ করেছিল

এই তালভাঙা কলোনিতেই, যা "আগে জবরদখল ছিল, কিছুদিন আগে পাট্টা করে নেওয়া হয়েছে" (২১৩)। কথক একটি গুমটি পেরিয়ে তালভাঙা কলোনিতে প্রবেশ করেই বুঝতে পারেন, পুবের কলোনি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক জীবন ও জগৎ সেখানে মানুষের। দূরে-কাছে 'মিটমিট'-করা আলো তাদের দারিদ্রের হেতুবাচক নির্দেশক হয়ে চোখে ধরা দেয়। যে-জীবনের দিকে এগোতে গিয়ে কথকের "জুতো ছাড়িয়ে ধুলো উঠেছে ধুতিতে" (ঐ), অর্থাৎ কথকের ভদ্রলোকি আত্মপরিচয়ের পারিপাট্যময় বাবুয়ানা যেন কলুষিত মলিন হয়ে উঠেছে এই পুনর্সংযোগ-প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। যেহেতু 'পায়ের তলা থেকে' ক্রমশ 'পিচের রাস্তা' সরে গিয়ে শুরু হয়েছে 'পায়ে-চলা-পথের' একটি 'সরীসৃপ রেখা'— মজবুত নির্ভরযোগ্য পাদভূমি বদলে গিয়ে 'সরীসৃপ' রেখার এই জেগে-ওঠা যেন জীবনের একটি বিপজ্জনক রূপেরই আভাস দ্যোতিত করতে চায়। এই তাৎপর্য আরও মূর্ত হয়ে ওঠে যখন কথককে এমনকি আমরা অন্ধকারে 'হোঁচট' খেতেও দেখি। বস্তুত পুবের কলোনি যেখানে সুখ-শৌখিনতায় পরিপূর্ণ, সেখানে অপরদিকে তাদের এই রুক্ষ জীবনে "ঝাউ বা কৃষ্ণচূড়া কোথাও নেই— কয়েকটা বাবলা গাছ সাঁ সাঁ করছে হাওয়ায়" (ঐ)। বাবলা গাছের রুক্ষ শুষ্ক কণ্টকতাই যেন এভাবে তালভাঙা কলোনির মানুষদের জীবনের রূপকভাষ্য হয়ে ছড়িয়ে থাকে[১]। কেরোসিনের টেমির আলোয় এই মানুষগুলিকে মনে হয় 'অদ্ভুত অবাস্তব'। যেন তারা এই পৃথিবীর কেউ নয়, যেন তাদের বাহ্যপরিচয় ঝাপসা হয়ে গেছে। বাঁশের একটি মাচায় বসে তারা 'ছোট ছোট কাচের গ্লাসে' যেন ঠিক চা নয়, জীবনের গড়ে-তোলা উত্তাপ পান করে নেয় ক্ষণিকের জন্য। এটুকু ছাড়া আর কোনো বৈচিত্র্য, মনোরঞ্জন নেই তাদের জীবনে। দেশভাগে তাদের অতীত খোয়া গেছে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, আর বর্তমানের আলো-আঁধারিতে মিশে গেছে গেছে তাদের নিতান্ত নিছক জীবনধারণ।

কথকের গ্রাম-সুবাদে যতীনকাকাও এই মানুষগুলির একজন; একটি পুরনো লণ্ঠন (তথাকথিত পুরাতন জীবনদৃষ্টি?) হাতে বেরিয়ে এলে যতীনকাকাকেও কোথাও যেন পানবিড়ির দোকানের মানুষগুলির মতোই আলো-আঁধারি মনে হয় দৃশ্যত। আর কথক যেন কেবল যতীনকাকা, নীরদ বা জয়ার সঙ্গেই নয়, অতীতের একটি খণ্ডাংশকেই ছুঁতে এসেছেন, যেন দুদণ্ড পাশে বসতে চান তাঁর হারানো সময়ের। কিন্তু

ধীরে ধীরে কথক অনুভব করেন, "কোথাও যেন একটা ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে— সুর মিলছে না" (২১৭)। তখন পরিস্থিতি তার কাছে রীতিমতো দমবন্ধ-করা মনে হয়। তাকে এমনকি রুমাল দিয়ে মুখ মুছতেও দেখা যায়। এটিকে পূর্বোল্লিখিত প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্বের একটি অসাধারণ উদাহরণ বলা চলে। রুমাল দিয়ে কপাল মোছা কার্যটির উল্লিখিত কারণ এখানে "হঠাৎ হাওয়াটা যেন বন্ধ হয়ে গেছে" (এমনকি হাওয়াও রূপক), কিন্তু অনুল্লিখিত প্রকৃত কারণ আসলে কথকের অপ্রতিভ হয়ে পড়া। আর দূরে বাঁধের ওপর দিয়ে একটা আলোর ট্রেন— একটি তীব্র নিষ্ঠুর বিভাজনরেখাই যেন ছুটে চলেছে নিয়তির দিকে। সেইসাথে 'শেয়ালের কোরাস' উঠলে আর সমস্বরে তার জবাব দিলে 'কলোনির কুকুরের দল', যেন রূপকের দ্যোতনায় গল্পের গহনে দেশভাগকালীন দাঙ্গার স্মৃতিই উচ্চকিত হয়ে ওঠে পাঠকের মনে। পানবিড়ির দোকানের লোকগুলি আগেই সাবধান করে দিয়েছিল— "বাড়ির সামনেই বাঁশের পোল্‌ডা কিন্তু ভাংগা।" (২১৪) আমরা দেখব এই ভাঙা বাঁশের সাঁকোর কথাই কিন্তু গল্পের মধ্যে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। কার্যত এই ভাঙা সাঁকো তার বস্তুগত অস্তিত্বকে বহন করেও, দুই ভিন্ন অবস্থান ও সংস্কৃতির মধ্যবর্তী খণ্ডিত বা বিপর্যস্ত সংযোগ-ব্যবস্থারও রূপক হয়ে ওঠে (আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের থেকে পরিভাষা ধার নিয়ে আমরা যাকে বলতে পারি 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু')। তাই যে-ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে, তা পারাপারের পথে যেন গভীর নিরাশা তথা গাঢ় অন্ধকার, "নীচু মাঠ যেন কালি দিয়ে মাখানো— তার ওপর আবার ভাঙা বাঁশের পুল" (ঐ)। পেরোতে গেলে দেখা যায়, "মচমচ করে শব্দ উঠছে ভাঙা বাঁশের।" (২১৬) এ-ছাড়া কথকের নিজের মুখেই তাঁর অক্ষমতার কথা আমরা জানতে পারি— "এখন আর এমন সাঁকোর ওপর দিয়ে আমার হাঁটবার অভ্যাস নেই।" (২১৫) তবু তিনি নিজের মতো করেই এক প্রচেষ্টা চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে জয়াও তাঁকে তাঁর প্রকৃত ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়— "ভাঙা পোল্‌ডা তো পার হইতে পারবেন না।" (২১৯) আর পরিশেষে কথককে নিজেকেও স্বীকার করে নিতে হয়— "ওই ভাঙা পুলটা পেরিয়ে যাবার সাহস আমি রাখি না।" (২২১) কারণ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যে বৈষম্য-ব্যবধান তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে, সেই বৈষম্য দূর না করলে সাঁকোও মেরামত করা কার্যত অসম্ভব।

তাই নিচে থেকে লণ্ঠনের আলোর বিচিত্র আলোছায়ায় তাই নিচে থেকে লণ্ঠনের আলোর বিচিত্র আলোছায়ায় জয়ার মুখ 'অনেক দূরের আর অনেকখানি অচেনা' বলে মনে হয় (এটিও প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্বের উদাহরণ)। একটি পুরাতন প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে যা মিথ্যে হয়ে গেছে, তবু সেতারে মধুবন্তী রাগের শৌখিনতায় স্মৃতির স্বপ্ন হয়ে-ওঠা নেই, এখানে বাস্তব অনেক বেশি নিষ্ঠুর, অনেক বেশি দগ্ধ। প্রতিশ্রুতি রাখতে না-পারার অভিজ্ঞান "এখানে লুকিয়ে আছে হোগলাবনের কালো কাদার নিচে— যেখানে খুন-হওয়া মানুষের হাড়ের টুকরো ছাড়া আর কিছুই হাতে ঠেকবে না।" (২১৯) আগমনপথের সেই রহস্যনিবিড় জলাজমি হোগলাবন এখানে গভীরতর তাৎপর্য নিয়ে ধরা দেয়। যেন একটি অতীতের শব, যেন কিছু মানুষের জীবনস্বপ্ন, প্রেম ও প্রতিশ্রুতির ভাঙা হাড়গোড় কালো কাদার নিচে, হোগলাবনের অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। মৃত সম্পর্কের কিংবা ভালোবাসার ভগ্নকাঠামো হিসেবে এই 'মড়ার হাড়' যেন কথকের প্রচেষ্টার ব্যর্থতাকেই আরও বেশি রূঢ় ও অভিশপ্ত করে তোলে। তবু কখনো ভুল করেও ভুল করেও যদি মনে হয়, এই মুহূর্তে কোমল নমনীয় হয়ে উঠেছে ব্যবধানের কাঠিন্য কিংবা জয়া, তখনই হঠাৎ 'কুকুরের ডাক' (সময়ের হিংস্রতা ও আকস্মিকতা) যেন 'মুহূর্তটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো' করে দেয়। আবার সব হারিয়ে যায়, অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে ফিরে চলে জয়া, কোনো বিদায়সম্ভাষণ ছাড়াই। তারপর অন্ধকার মাঠের দিকে তাকালে শুধু চোখে পড়ে, "অনেকগুলো আলো ছাড়া-ছাড়া ভাবে মিটমিট করছে এখানে ওখানে", তার মধ্যে জয়ার লণ্ঠনের আলোকে আলাদা করে শনাক্ত করা যায় না (২২১)। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মতোই,

"সাঁঝের বেলা ভাটার স্রোতে ওপার হতে একটানা
একটি দুটি যায় যে তরী ভেসে—
কেমন করে চিনব, ওরে, ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।" (১৪২১ : ১৪৩)

যে-তরী আমার ঘাটে ছিল, যে-মানুষ আমার ঘরে ছিল, ওপারের দিকে তাকিয়ে চিনতে না পারাই তো দেশভাগের ট্রাজেডি। এই চিনতে না-পারাকে অতিক্রম করা যায় না। তাই সাঁকোর মতো এক্ষেত্রেও, নিজের মধ্যবিত্তসুলভ পলায়নবাদিতার সঙ্গে সাযুজ্য

রেখে, কথককে স্বীকার করে নিতে হয়েছে— "হোগলা বনের তলায় মড়ার হাড়গুলো ওখানেই থাকুক।" (২২১) বরং সেই অন্ধকার মাঠ, ভাঙা পুল, হোগলা বনের তলায় স্মৃতির হাড়— এইসব পেরোতে যাওয়ার চেয়ে মধুবন্তী রাগের শৌখিন স্মৃতিবিলাস অনেক বেশি নিরাপদ।

'বীতংস' গল্পে যে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি আমরা পাচ্ছি, সেই সুন্দরলালের মধ্যে আমরা দেখি 'সন্ন্যাসের কোনো লক্ষণ নেই'। তার চাপকানের পকেটে পিতলের ডিবে, পিতলের ডিবেয় খিলিপান আর খিলিপানে "জর্দার চমৎকার গন্ধটা দস্তুরমতো লোভনীয়"; জর্দার উল্লেখে একধরনের মাদকতাই দ্যোতিত হয়, যা পরোক্ষভাবে তার চরিত্রকেই ব্যঞ্জিত করে। অর্থাৎ প্রকৃত সন্ন্যাসের মধ্যে যে নিষ্কলুষ নিরাসক্তি রয়েছে, সুন্দরলাল তার সম্পূর্ণ বিপরীতমেরুর বাসিন্দা। সেইসাথে আরও বিশেষভাবে, তার চলার সঙ্গে সঙ্গে যখন শোনা যায় "পকেটের টাকাগুলো ঝনঝন করে বেজে উঠছে" (১৩৬১ : ২১), তখন আর্থিক (অর্থনৈতিকও) দম্ভ ও সামর্থ্যই ঘোষিত হয়। সুন্দরলালকে সন্ন্যাসী না-মনে-করার পিছনে এত প্রকাশ্য হেতু থাকা সত্ত্বেও, গল্পে বলা হচ্ছে, "তবু সুন্দরলাল যে মোহান্ত, তাতে সন্দেহ করার হেতু কী!" (ঐ) এখানে আলোচ্য বয়ানটিতে মিশে রয়েছে ঝড়ু সাঁওতালের ফোকালাইজেশন আর বক্তব্যটুকুর মধ্যে 'তবু' কথাটি এখানে যথেষ্ট শ্লেষগর্ভ— তার মধ্য দিয়ে সুন্দরলালের ক্রূর কুটিল ক্ষমতার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সেই আভাস ধরেই আমরা দেখি, সুন্দরলালের "পায়ের তলায় মড় মড় করছে শুকনো শালের পাতা" আর তার ফলেই যেন-বা "ঝড়ু মোড়লের সারা গা ছমছম করে উঠল" আর তারপরেই যেন কথাপ্রসঙ্গে "সুন্দরলালের কণ্ঠে গর্বের আভাস লাগল" (ঐ)। 'মোড়ল' কথাটির মধ্যে নেতৃত্ব বা কেন্দ্রশক্তির অনুক্ত উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সেই নেতৃত্বেরও এমনকি 'সারা গা ছমছম' করে ওঠে। অর্থাৎ সুন্দরলালের ভয়ের আগ্রাসন সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রকেই যেন কব্জা করে ফেলে। এখানে শুকনো শালের পাতার মড়মড় শব্দ সেই গা-ছমছম তথা প্রচ্ছন্ন ভয়ের অনুঘটক তথা উদ্দীপন-বিভাব (অর্থাৎ পরোক্ষভাবে, হেতুবাচক নির্দেশক) হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু আলোচ্য বয়ানে রূপকত্বও কি নেই? এখানে বিশেষভাবে রূপকত্বের খোঁজ করতে গিয়েও উঠে আসে ক্রমান্বয়িক জিজ্ঞাসাজাল: যেমন শালের পাতা 'শুকনো' কেন? কেন তা 'পায়ের

তলায় মড় মড় করছে'? তা কি কোনোরকম দুর্বলতাকেই দ্যোতিত করতে চায়? কার দুর্বলতা? তা কি আসলে ঝড়ু মোড়লের সাহস ও আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠতার অভাবকেই নির্দেশ করছে না? সুতরাং এই পথে পাঠের নিবিড় তাৎপর্য আরও ব্যাকুল বৈচিত্র্যময় কিছু অনুভাষ্যকেও ধারণ করে থাকে। সাঁওতালদের ক্ষতি করার বা সম্মিলিতভাবে বড়ো কোনো ফাঁদে ফেলার গহন চক্রান্তের সংকেত যেন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই ছড়ানো-ছিটানো থাকে। দেখা যায় "মহুয়ার গন্ধে শালফুলের বিষাক্ত নিশ্বাস চাপা পড়ে গেল" (২৪)— মহুয়ার গন্ধ নেশা তথা আচ্ছন্নতার (অর্থাৎ বিভ্রম কিংবা বিহ্বলতা) কথা বলে, আর 'বিষাক্ত নিশ্বাস' কি শুধু (বা আসলেই) শালফুলের? নাকি তা আরও (আদতে) অন্য কিছুর বিষাক্ততাকে ব্যঞ্জিত করছে? আর উল্লিখিত চাঁদের আলোই বা কেন 'নির্মম'? কোন্ মায়াবী সম্মোহনের নির্মমতাকে তা জানান দিতে চায়? ইত্যাদি নানারকম নিবিড় জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন ভাবুক পাঠক; হয়তো সরাসরি সদুত্তরও সবসময় মেলে না।

মোটামুটি এই প্রসঙ্গেই একটি দৃশ্য আমাদের কাছে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল— "শুধু অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভুটানী খচ্চরটা। কী একটা অস্বস্তি অনুভব করে খট খট শব্দে সে মাটির ওপর পা ঠুকতে লাগল।" (২৪) আমাদের প্রশ্ন হল: 'অকারণ' কি আসলেই অকারণ? কার্যকারণে যে প্রসক্তি সম্বন্ধ রয়েছে, তার কি ব্যত্যয় হতে পারে এক্ষেত্রে? নাকি আসলে যে-কারণটুকু নিহিত রয়েছে তা উক্ত বিশেষ মুহূর্তে আপাতভাবে বোধগম্য হচ্ছে না বলে এই শ্লেষ-রহস্যপূর্ণ 'অকারণ' বিশেষণ? খচ্চরটির নিজের কাছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ মজুত আছে। নইলে সাঁওতালরা যেখানে বিহ্বল বা আচ্ছন্ন— সেখানে খচ্চরটির কীসের এমন অস্বস্তি? উত্তর নেই, কিন্তু 'অস্বস্তি'র উল্লেখে, 'খট খট শব্দে', গল্পের নিবিড় পাঠক যদি সতর্ক (অথবা স-তর্ক) হয়ে ওঠেন, তখন রহস্যময় এই অস্বস্তির তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে (শুধু পাঠকৃতির নিরিখেই নয়, জীবনের ভেতর বা সমাজবীক্ষার মধ্যেও) তাঁদের পক্ষে আরও গহন, আরও গভীর কোনো আশঙ্কার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব।

সুন্দরলালকে বলা হয়েছে 'পিশাচসিদ্ধ'। কিন্তু আমরা দেখি, পিশাচের নিঃশ্বাস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে ("যে নিশ্বাস যার গায়ে লাগে, গোড়াকাটা লতার মতো শুকোতে

শুকোতে একদিন শেষ আয়ুর বিন্দুটি অবধি তার মিলিয়ে যায় বাষ্প হয়ে"— পৃ. ২৫-২৬), তা আসলে পরোক্ষে সুন্দরলালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুন্দরলালের মতো দালালগোত্রীয় মানুষদের লোভ ও চাতুরীর নিঃশ্বাস যেন এভাবেই কারো জীবনকে সর্বস্বান্ত করে দিতে পারে। সুতরাং বর্ণনার মধ্য দিয়ে অনুক্তভাবে সুন্দরলাল 'পিশাচসিদ্ধ' থেকে নিজেই হয়ে উঠছে 'পিশাচ' (স্মরণীয়, পোষ্য থেকে পোষকের সত্তায় রূপকত্বের এরকম পিচ্ছিল প্রতিসরণ আমরা রবীন্দ্রনাথের 'আপদ' গল্পে কুকুর ও নীলকান্তের ক্ষেত্রেও দেখেছি)। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, সুন্দরলাল যদি রূপকত্বের প্রতিসরণের মধ্য দিয়ে 'পিশাচ' হয়ে ওঠে, তাহলে এই নতুন চিহ্নব্যবস্থায় 'পিশাচসিদ্ধ' কাকে বলব? কে সুন্দরলালকে চালনা করে? চা-বাগানের সাহেব? গল্পের শেষে সেই ষড়যন্ত্র যেন পাঠকের চোখের সামনে নিজের মুখোশ খুলে দাঁড়ায়।

এরপর পিশাচের আগ্রাসনের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখি— "এরপর সেই পিশাচটা তার মুখখানাকে নলের মত ছুঁচালো করে তার মাথার ভেতর থেকে চোঁ চোঁ করে রক্ত ও ঘিলু শুষে খাবে।" (২৬) মুখ ছুঁচালো করে সূক্ষ্ম উপায়ে মাথার যাবতীয় নির্যাস শুষে খাওয়ার মধ্য দিয়ে বিচারবুদ্ধিকে কৌশলে গ্রাস করে নেওয়ার (brainwashing) ক্ষমতাই কি ব্যঞ্জিত হচ্ছে? অর্থাৎ এইভাবে রূপকের সাহায্যে লেখক হয়তো সাংস্কৃতিক রাজনীতির আগ্রাসনের কথাই বলতে চান। তারপর সুন্দরলাল জানায় (হুঁশিয়ারি না হুমকি?)— "ডোমনের রক্ত খাওয়া শেষ হলে পিশাচটা আশেপাশে খুঁজে বেড়াবে তোকে। পেলে কিন্তু আর রক্ষা রাখবে না।" (ঐ) অর্থাৎ কেউই নিরাপদ নয়, যার প্রতি পিশাচ চালনা করা হচ্ছে সেও নয়, আর যে অপরের ক্ষতি করার জন্য পিশাচকে লেলিয়ে দিতে চাইছে সেও নয়। পিশাচের অদম্য রক্তপিপাসাই শেষ কথা। সুতরাং সাঁওতালরা কেউ কেউ ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে যতই পরস্পরের ক্ষতি করতে চাক, শেষ অবধি পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদের দালালদের গ্রাস থেকে কেউই রক্ষা পাবে না, পায় না। সাঁওতালরা শেষমেশ ভিটেমাটি ত্যাগ করে সাহেবের চা-বাগানে সস্তা শ্রমিক হিসেবেই নিযুক্ত হতে বাধ্য হল, আর সাঁওতালদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়া যুবতীটি সাহেবের ভোগ্যবস্তু হয়ে-ওঠার অনিবার্যতার দিকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকল। 'কৃষ্ণচূড়ার একরাশ রাঙা পাপড়ি' যেন সাঁওতালদের সতেজ প্রাণবন্ত জীবনের রূপক

(কৃষ্ণচূড়ার 'কৃষ্ণ' শব্দটির মধ্যেও যেন কৃষ্ণাঙ্গ তথা কালো চামড়ার মানুষদের কথাই কৌশলে জানানো হচ্ছে), আর তা 'ঝুর ঝুর করে' ঝরে পড়ার মধ্যে তাদের বিনষ্টি বা অধঃপতনের বার্তাই সূচিত।

বস্তুত সুন্দরলালকে 'সন্ন্যাসী' বা 'মোহান্ত' বলার পক্ষে তেমন কোনো যুক্তি কাহিনির মধ্যে নেই, কিন্তু সুন্দরলালকে আমরা যে 'পিশাচ' বলে মনে করেছি, আমাদের সেই ধারণার পক্ষে একটি ছদ্মবেশী যুক্তি আমরা গল্পের মধ্য থেকেই পেশ করতে পারি। আবহকে অতিপ্রাকৃত করে তোলার চেষ্টায় সুন্দরলাল যখন নিজের অলৌকিক ক্ষমতার (black magic) বিভ্রম জাগিয়ে তোলার আয়োজন করছিল, তখন সুন্দরলালের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়— "একটু আগেই পান খেয়েছিল, মুখের দু-পাশে খানিকটা লাল রঙের গ্যাঁজলা বেরিয়ে রয়েছে বীভৎসভাবে।" (২৯) এটিও প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্বের উদাহরণ (যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের 'গেছো বাবা' উপাখ্যানে বা অন্যান্য গল্পেও দেখেছি, এ-ছাড়া ইতোমধ্যে 'মধুবন্তী' গল্পটিতেও কয়েক জায়গায় আমরা অনুরূপ দৃষ্টান্ত পেয়েছি)। কিন্তু 'গেছো বাবা' উপাখ্যানের উদাহরণটির সঙ্গে এই বিশেষ উদাহরণটির একটু চেহারাগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে। সেখানে কার্যের প্রধান বা প্রকৃত কারণগুলি ছিল প্রচ্ছন্ন, আর গৌণ বা ছদ্ম কারণগুলি ছিল প্রচ্ছদ। অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হয়তো' গল্পে যেমন ফুলশয্যার রাতে মাধুরীর-ফেরত-দেওয়া পুঁটলিতে ফুলের গয়নার ফুলগুলি 'চটকানো' থাকার মূল কারণ থাকে গৌণ কারণের তলায় লুকানো। কিন্তু এখানে বিষয়টি একটু বিপ্রতীপ গোছের। এক্ষেত্রে প্রকৃত কারণ প্রচ্ছন্ন থাকে না; কিন্তু লেখকের পিঠোপিঠি পাঠকেরও প্রলম্বিত কিছু উদ্‌বেগ ও দুশ্চিন্তা যেন তাদের ভাবনাকে রক্তিমতার মূল কারণ (পানের পিক) থেকে সরিয়ে অন্য একটি অনুচ্চারিত অস্বস্তিকর সম্ভাব্য কারণের (রক্ত) দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 'দুঃশাসন' গল্পেও আমরা দেখি, শচীকান্তের "আদ্দির পাঞ্জাবির হাতায় খানিকটা পানের পিক লেগেছে, যেন রক্তের ছোপ।" (৫৯) অথবা 'নক্রচরিত' গল্পে "পান খেয়ে খেয়ে দারোগার মুখটা কি অস্বাভাবিক লাল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় লোকটা রক্ত খায় বুঝি।" (৪৬) তবে এগুলির মধ্যে 'বীতংস' উদাহরণটিই আমাদের প্রকৃষ্ট মনে হয়েছে, কারণ সেখানে রক্তের বিষয়টি পুরোপুরিই অনুক্ত।

'ইতিহাস' গল্পে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও সামগ্রিকভাবে উত্তাল বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রেক্ষাপটে গেরস্থালির বর্ণনায় একটি স্টোভের উল্লেখ পাই আমরা। বলা হয়, "স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ যেন বহুদূর থেকে আসা ঝড়ের গর্জন।" (১৮০) আর সেই সূত্রেই যেন অনুভূত হয় 'চারদিকের পৃথিবী ঘিরে একটা আসন্ন দুর্যোগ', মনে হয় পারিপার্শ্বিক যেন 'থম থম করছে'। এখানেও আমরা 'নিশীথে' গল্পের নদী-সাপ-প্রবৃত্তির ত্রিভুজের মতোই, চিহ্নায়কের ত্রিমুখী সম্পর্কের আভাস লক্ষ করতে পারি। 'স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ', 'বহুদূর থেকে আসা ঝড়ের গর্জন' ও 'চারদিকের পৃথিবী ঘিরে একটা আসন্ন দুর্যোগ'— এই তিনটি একক মিলিত হয়ে (স্টোভের শব্দ < ঝড়ের গর্জন > পারিপার্শ্বিক সমাজ-রাজনীতিতে আসন্ন দুর্যোগ) এখানেও একটি ত্রিভুজ রূপক (triangle metaphor) গঠন করছে। তাহলে 'প্রণতির চোখে মুখে' যে "স্টোভের নীলাভ আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে" (ঐ), তা কি আসলে জ্বলন্ত সময়ের আঁচ? তাই হয়তো দেখা যায়, "কেটলিটার দিকে বোবা চোখ মেলে একা বসে রইল প্রণতি" (ঐ); এই বোবা চোখ মেলে বসে-থাকার মধ্যে তার কি কোনোরকম অসহায়তাই প্রকাশ পাচ্ছে? কিন্তু কীসের জন্য এই অসহায়তার বোধ? সে বসে থাকে 'কেটলিটার দিকে' চেয়ে— এই কেটলিই বা কী ইঙ্গিত বহন করছে? ভিতরে ফুটন্ত জল? রূপকার্থে বিক্ষুব্ধ সময়ের ঘূর্ণাবর্ত? বাইরের পৃথিবীতে যে আসন্ন দুর্যোগ, যে রাজনৈতিক বিপদাভাস, তার মধ্যে আসলে প্রণতি পরিবারের মানুষগুলিও প্রায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে; যেন তাদের বিষয়েই কোনো অপ্রতিরোধ্য অনিবার্য আশঙ্কা প্রণতিকে পীড়িত করেছে। কেটলির জল সম্বন্ধে আমাদের অনুমান যে নিছক কষ্টকল্পনা নয়, তার সমর্থন আমরা স্বয়ং লেখকের থেকেই পেয়ে যাই। কিছুক্ষণ পরেই কথক তথা লেখক বলেন, "কেটলির জলটা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে— বাইরে এমনি করে ফুটছে উত্তেজিত ভারতবর্ষের প্রাণ।" (১৮১) অতএব কেটলির ফুটন্ত জল যে উত্তেজিত ভারতবর্ষের প্রাণেরই উপমান, তা এখানে গল্পকথক খোলসা করে জানিয়ে দিয়েছেন[২]। এরপর যেন তা বিপজ্জনক হয়ে-ওঠার আগেই, 'স্টোভের চাবিটা খুলে দিল প্রণতি' আর "একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাসের মতো টানা শব্দ করে স্টোভটা নিভে গেল" (ঐ)। অর্থাৎ চিহ্নায়ক (signifier) বা দ্যোতককে দমন করার প্রয়াস; কিন্তু দ্যোতিত (signified)

কি তাতে অবরুদ্ধ হবে? অবশ্য চিহ্নটুকু যেহেতু এখানে প্রণতির আশঙ্কার সূত্রে আবদ্ধ[৩], তাই হয়তো তার মনোজগতের ভারতবর্ষে তা আপাতত লঙ্ঘন করছে না বিপদসীমা। প্রসঙ্গত প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্পই রয়েছে 'স্টোভ' নামে। সেখানেও আমরা দেখি গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র বাসন্তীর বিস্ফোরক অবদমিত ক্ষোভ সূচিত হচ্ছে একই পদ্ধতিতে; যদিও তার টীকা-টিপ্পনীটুকু অনুচ্চারিতই থাকছে। এমনকি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পটি সম্পর্কে লেখেন, "এই স্টোভ বাসন্তীরই জীবনের প্রতীক— কখন এ বিদীর্ণ হয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটাবে তারই জন্য ভয়ে আর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে বাসন্তী" (১৩৯২ : ৩১৩)।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'পতঙ্গ' গল্পেও এরকম ইলেকট্রিক স্টোভ ও কেটলির প্রসঙ্গ একাধিকবার ঘুরে-ফিরে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। স্টোভের ওপর বসানো কেটলিতে গরম জল বা জলের শব্দ এখানে যেন একইসাথে নায়কের যৌন প্রক্ষোভ আর বাহ্য পরিস্থিতির প্রগাঢ় উদ্‌বেগ ও উত্তেজনাকেই রূপকান্বিত করে (এখানেও পূর্বকথিত রাবীন্দ্রিক দ্বিধার দ্বারা চালিত লেখক এই উপমানটির একপ্রকার ব্যাখ্যাও উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন)। গল্পের প্রায় প্রথমাংশেই গল্পের 'আমি' খোলসা করে জানিয়ে দেয়— "যেন আমার শরীরটা একটা গরম কেটলি। তখন রূপার স্টোভের ওপর চাপানো জল যেমন ফুটছিল আমার চামড়ার নিচের রক্তও সেভাবে শব্দ করে ফুটছিল।" (নন্দী: ১৯৮৯: ২৩৮) বস্তুত এর চেয়ে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা আর কীই-বা হতে পারে! তাই পরবর্তীতেও যখন জানানো হয় যে "স্টোভের ওপর বসানো কেটলির জল শব্দ করছে" (ঐ), তখন তার অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। রূপা যে তাকে গরম জলের কেটলি নিয়েই কলঘরের দিকে ডাকত, তা নিছক সাদামাটা দৈনন্দিন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকত না। শেষমেশ রূপার সঙ্গে যখন সে কলঘরে মিলিত হল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এও জানিয়ে দেওয়া হল যে "কোনায় রাখা কেটলির জল একসময় ঠাণ্ডা হয়ে গেল" (২৪১)। এটি একইসাথে রূপক ও নির্দেশক দুইই। প্রথম অধ্যায়ের শেষে ঘাটে ঘট ভেসে যাওয়ার বা সিনেমার অনুরূপ দৃশ্যের যে একটি উদাহরণ আমরা পেশ করেছিলাম, এটিও প্রায় সেই গোত্রেরই। কেটলির এই জল ব্যবহারে না লেগে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া যেমন তাদের পরস্পরের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে-

পড়ার হেতুবাচক নির্দেশক, আবার পৃথকভাবে দেখলে তা নায়কের যৌন উত্তেজনা প্রশমিত (ক্যাথারসিস) হয়ে যাওয়ার রূপকও বটে। পরেও তা আরও স্পষ্ট হয়, কথক যখন একচক্কর বাইরে থেকে ঘুরে হঠাৎ রূপার ঘরেই ফিরে এসে 'পরিষ্কার' শুনতে পায়, "গরম জলের কেটলি যেন আবার স্টোভে চাপানো হয়েছে, জল ফুটছে, ঢাকনাটা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে", আর রূপার গলার স্বরও পাওয়া যায়— "জল গরম হয়েছে, নিশীথ?" (২৪২) নিশীথ এখানে অধ্যাপকের যুবতী স্ত্রীর আরেক 'নিষিদ্ধ' প্রেমিক। কেটলির কম্পমান ঢাকনা ও ফুটন্ত জলের উল্লেখও তাই এখানে একইসাথে রূপক ও নির্দেশক দুইই। এ-ছাড়া গল্পটির অন্তিম মন্তব্যেও চিহ্নের এক বিশেষ মোচড় (punchline, dark comedy) লক্ষ করা যায়। রূপাকে খুন করে বেরিয়ে যাবার সময় সিঁড়িতে রূপার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কথক নিজের জামায় রক্তের দাগের একপ্রকার কারণ হিসেবেই জানায়— "বৌদি মুর্গী খাবে, একটা মুর্গী কেটে দিয়ে এলাম" (ঐ), যা বাস্তবিকভাবেই জামায় রক্তের দাগ লাগার আসল কারণ নয়। প্রসঙ্গত আমরা প্রায় সকলেই জানি যে, 'মুরগি বানানো' প্রবচনটি লৌকিকভাবে অনেকখানিই প্রচলিত, যা metaphor হিসেবে প্রবঞ্চনা বা প্রতারণার অনুষঙ্গ বহন করে। এখানে গল্পের নিরিখে প্রতারণার মর্মার্থটি বোধগম্যতার বাইরে নয়। বিশেষ করে সেই মুরগির খাদিকা যখন 'বৌদি' (এমনকি খাওয়া ক্রিয়াটিও এখানে ব্যঞ্জনাগর্ভ, যেন তা প্রেম-যৌনতার অনুষঙ্গে কারো হৃদয়কে গ্রাস করাই বোঝাচ্ছে), তখন কথক যেন নিজেই মুরগিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এখানে এটি একটি বিশেষ বিকৃত শ্লেষ, কারণ মুরগিই এখানে হত্যাকারী, আর মুরগির খাদিকাই আসলে খুন হয়েছে। তবে এই আপাত বৈপরীত্য এখানে বস্তুগত ও ভাবগত তাৎপর্যের দ্বন্দ্ব, যা এক কুটিল irony-র জন্ম দিচ্ছে।

যা-হোক, আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলির দিকে ফিরে যাক। রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর গল্পেও প্রকৃতিকে বা প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তা আমরা 'মধুবন্তী' বা 'বীতংস' গল্পে ইতোমধ্যেই দেখেছি, আবার 'বন-জ্যোৎস্না' গল্পেও আমরা এরকম উদাহরণ যথেষ্ট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যেগুলি স্পষ্টত রূপক হয়তো নয়, তবে রূপক-সম্ভাবনাময়

নিঃসন্দেহে। ‘হরিয়ালের মাদক সুর’, ‘হরিণের মিষ্টি আহ্বান’, অথবা ‘ঝাউয়ের বনে উদাস বিরহাতুর দীর্ঘশ্বাস’, কিংবা যখন টের পাওয়া যায় “বনমোরগ দম্পতি হয়তো মিলন-মায়ায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে কোথাও”, তখন তা পৃথক বা সম্মিলিতভাবে গল্পের ভাবপরিস্থিতিকেই ব্যঞ্জনামধুর করে তোলে, বিশেষত মহীতোষ ও শিউকুমারীর প্রেমসম্ভাবনার সাপেক্ষে। এ-ছাড়া মহীতোষ ও শিউকুমারীর শিকারসংক্রান্ত আলাপচারিতার দ্ব্যর্থবোধকতাও (১৩৪-১৩৫) যথেষ্ট উপভোগ্য। বনের পশুশিকার এখানে যৌনতার প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে ধরা দেয়। পাশাপাশি গল্পটিতে যে শালগাছের রূপকভাষ্য বিধৃত রয়েছে, তা যথেষ্ট অভিনব। দাবানলকে শিশু শালগাছের ‘জীবনীশক্তির প্রথম পরীক্ষা’ ও ‘প্রথম অগ্নি-অভিষেক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন তাদের সম্পর্কে বলা হয়— “তিন চার বছর দাবানল ওদের ডালপালা পুড়িয়ে নির্জীব করে দেবে, কিন্তু তার পরেই অগ্নিউপাসক ঋত্বিকের মতো নির্দাহন শক্তি লাভ করবে ওরা” (১৩২), তখন তা যেন মহীতোষের মতো স্বাধীনতা-সংগ্রামীর যথার্থ আদর্শ হয়ে দেখা দিতে চায়।

‘ভাঙা চশমা’ গল্পেও প্রায় এইভাবেই কথক দেখেন ‘ফুল-ঝরে-যাওয়া মুমূর্ষু কাশের বন’ (১৬৪), যা সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ও মানুষের জীবনের (সেইসাথে উল্লিখিত সেই ইস্কুলমাস্টারের ব্যর্থ জীবনসাধনারও) রূপক হয়ে জেগে থাকে; আর সেখানে যখন ‘তারস্বরে চীৎকার করে উঠল শেয়াল’ (১৬৬) তখন যেন মৃত্যুর ভাবানুষঙ্গই আরও বেশি করে তাতে মিশে গেল। তার পরিপ্রেক্ষিতে কথকের মশারির উল্লেখে, মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্ন পলায়নবাদিতা ও নিরাপত্তা-কামনার বিষয়টি মূর্ত হয়ে ওঠে। “মশারির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে বসেই আহারপর্বটা শেষ করে নিই” (১৬১)— বস্তুত ‘নিরাপদ আশ্রয়’ কথাটির মধ্যে যে ব্যাখ্যাধর্মিতা রয়েছে, তাতে অভিপ্রেত অর্থ পরিস্ফুট হওয়ার পথে খুব বেশি বিঘ্ন থাকে না। আর ‘ভাঙা চশমা’ নামটির দিকে যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলে দেখব ‘চশমা’ যেন জীবনদৃষ্টির দ্যোতনাই ধারণ করে আছে— তা কি তবে ব্যক্তির দর্শনভাবনার বিশেষ একেকটি ছাঁচ? তাই ‘ভাঙা চশমা’ কি কারো ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন? ইস্কুলমাস্টারের ভাঙা চশমা যখন জ্বলজ্বল

করে ওঠে, তা কি তাঁর স্বপ্নের তথা ভাবাদর্শের ভগ্ন অথচ উজ্জ্বল সংগ্রামী উপস্থিতির কথাই বলে?

'নক্রচরিত' গল্পে[৪] একটি পচা গন্ধের অনুষঙ্গ রয়েছে; গন্ধের ঐক্য বা সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনটি দৃশ্য বা তিনটি বিষয়কে বাঁধছেন লেখক— ১. মতিলালের বাড়িতে ('ভাঙা চাল, বাঁশ, খুঁটি, খসে-পড়া দাওয়া') 'ঘন হয়ে রয়েছে বাসি মড়ার গন্ধ' (৫০), ২. গোলাঘরে উপরিস্তরের চালের পচা 'বীভৎস গন্ধ' (৫১) এবং ৩. শিবপুরের হাট থেকে ফেরার পথে 'গলিত গরুর দেহ' (৫২)— এখানে গরু, কুকুর ও শকুন মিলে এক জটিল ত্রিভুজ তৈরি করছে, গরুর মৃতদেহের ওপর পাক দিচ্ছে শকুন, আর সেই শকুনকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে কুকুর— এখানে রূপকত্বের অনুসন্ধান একরকম করে করা যায় (শকুন শোষকশ্রেণি, গরু গলিত সমাজদেহ, কুকুর কপর্দকহীন নিম্নবর্গ প্রভৃতি), কিন্তু সে-জটিলতায় না গিয়ে আমরা এখানে চিহ্নের গভীর বিমিশ্রতা ও বিমূর্তায়নকেই স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক। আর উপরোক্ত তিনটি দৃশ্য তথা পচাগন্ধের অনুষঙ্গও একইভাবে ত্রিভুজের বিমূর্ত আদল গড়ে তুলছে; মৃত্যু, অবক্ষয় ও রূপকধর্মিতা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে কথকের কিংবা পাঠকের চেতনায়।

এর আগে পান-খাওয়ার প্রসঙ্গে যে রক্তপানের দ্যোতনায় এই গল্পেরই দারোগার মুখ 'অস্বাভাবিক' লাল ছিল, সেই রক্তপানের আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা আরও একরকমভাবে আমরা তাঁর গল্পে লক্ষ করি। 'হাড়' গল্পে রায়বাহাদুরের 'রক্তাধিক্য' (ব্লাডপ্রেসারের বিকল্পায়িত বাংলা তর্জমা) সম্পর্কে যে ইঙ্গিত বর্তমান (৩২), তাও একইরকম প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব হয়ে দেখা দেয়। আর এই রক্তাধিক্যের প্রতিতুলনায় যে রক্তাল্পতার কথা মনে আসে, তাও যথেষ্ট ভীতিপ্রদ; কাদের জীবন থেকে রক্ত শুষে নিয়ে রায়বাহাদুর নিজের শরীরে এতখানি রক্তের প্রাচুর্য পোষণ করেছেন? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সামনে চামেলি' গল্পের কথক বলেন, "আমাকে দেখলেই আপনারা চট করে বুঝতে পারবেন লোকটা রক্তশূন্যতায় ভুগছে।" (২৫৮) বলা বাহুল্য, এই 'রক্তশূন্যতা' শুধুই শারীরিক নয়, কথকের জীবনে রক্তশূন্যতার ব্যঞ্জনা অনেক গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এমন এক শ্লেষাত্মক শীতলতা নিয়ে একঘেয়ে স্বরে নিজের দুঃখদুর্দশা অথবা চেতনাপ্রবাহের বর্ণনা করছেন কথক, যে-কোনো সাদামাটা অবসন্ন

অবদমিত মানুষই পাঠক হিসেবে সেই ধূসর ধারাভাষ্যকে নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। 'হাড়' গল্পে ফিরে গিয়ে সেই রক্তশূন্যতার আরও মর্মান্তিক প্রমাণ আমরা চাক্ষুষ করতে পারি। দুর্ভিক্ষের যে দুঃসহ বর্ণনা সেখানে রয়েছে, তা সত্যিই যেন হাড়-হিম-করা। এমনকি চাকরির উমেদার হওয়া সত্ত্বেও, 'হাড়' গল্পের কথকও যেন সেই অনুক্ত রক্তাল্পতা নিয়েই বেঁচে রয়েছেন।

আমরা দেখি, রায়বাহাদুরের অধিকাংশ কাহিনিবৃত্তান্তেরই ভিন্ন এক বিনির্মিত অপব্যাখ্যা (deconstructed interpretation) তৈরি করছেন কথক, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির নিরিখে। যেমন— হাড়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনাসূত্রে যখন 'যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস' নিয়ে কথা তোলেন রায়বাহাদুর (৩৬), তখন কথকের স্বগতোক্তির মধ্যে সেই 'যাদুবিদ্যা' (black magic) এক বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে ধরা দেয়— "কার মন্ত্রবলে সেই বাংলা থেকে উঠে এল এই প্রেতের দল? মাঠভরা ফসল কার মন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, একটি কণাও পড়ে রইল না কোনোখানে?" (ঐ) এমনকি খাওয়ার পদ্ধতি নিয়েও তুলনামূলক দ্বান্দ্বিকতা লক্ষ করা যায়। রায়বাহাদুরের (ও রায়বাহাদুরের সান্নিধ্যে নিজের) খাওয়ার পদ্ধতিকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষদের খাওয়ার পদ্ধতির বিপরীতে রেখে দেখা হয়েছে। এ-ছাড়া তাহিতির আকাশের প্রতিস্থাপক হয়ে ওঠে কলকাতার আকাশ, কুমারী মেয়ের হাড়ের সঙ্গে অন্বিত হয় ডাস্টবিনের হাড়, রায়বাহাদুর যখন বলেন, "হাড় জোগাড় করেছি, কিন্তু মন্ত্রগুলো পাইনি" (৩৮), তখন তার কথার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় গল্পের শেষাংশে কথকের অনুভব— "হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকী" (৩৯); রায়বাহাদুর-কথিত 'মন্ত্র' কথকের বিনির্মাণে হয়ে ওঠে যেন কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবেরই মন্ত্র। এইভাবেই দেখা যাচ্ছে, হাড়ের অলৌকিক ক্ষমতা-সংক্রান্ত মিথগুলিকে ভেঙেচুরে বাংলার তথা কলকাতার দুর্ভিক্ষকালীন দুরবস্থার সঙ্গে বারবার মিলিয়ে নিতে চাইছেন নিরন্তর।

বস্তুত, বয়ানের এইরূপ বিকল্পায়নের সূত্রেই একাধিক গল্পে প্রত্নপ্রতীকের পুনর্গঠনের উদাহরণগুলিও উঠে আসে। 'দুঃশাসন' গল্পে গ্রামীণ নাট্যাভিনয়ের প্রসঙ্গে (বস্ত্রদুর্নীতি তথা কাপড়ের টানাটানির বাজারে) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের উপমা গল্পের মধ্যে

ফিরে ফিরে আবর্তিত হয়। "গৌরদাসের মনে হতে লাগল সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে।" (৫৮) অথবা হতদরিদ্রা মেয়েটির বিষয়ে ভাবতে গেলে মনে হয়— "যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।" (৫৯) এর মধ্য দিয়ে দুঃশাসনের প্রতিস্থাপক হয়ে উঠছে তৎকালীন বাংলার মুনাফালোভী মজুতদার কিংবা দালালগোষ্ঠী, আর দ্রৌপদীর বিকল্প হয়ে উঠছে বাংলার সামগ্রিক সমাজচিত্র। সেই লাঞ্ছনার অনুভব আরও প্রখর হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায়, "প্রখর সূর্যের আলোয় নিজেকে মেলে দিয়েছে নগ্ন অনাবৃত পৃথিবী"; আর ঝাউগাছের 'দীর্ঘশ্বাস' প্রভৃতি সেই বেদনাকেই ভারাক্রান্ত করে তোলে। কিন্তু বস্ত্রহরণই তো শেষ কথা নয়, তারও পরে 'প্রায়শ্চিত্ত'ও রয়েছে; প্রশ্ন তাই স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে— "যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?" (৬০) এরপরেই আমরা গৌরদাসের চোখ দিয়ে দেখি, যে শ্রমজীবী গোষ্ঠী মাঠে কাজ করতে চলেছে, তাদের "ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে", আর তাতে 'অকারণে— অত্যন্ত অকারণে' গৌরদাসের ভয় গভীর এক হেতুবাচক নির্দেশকের দ্যোতনা বয়ে আনে। ইতোমধ্যে আমরা 'বীতংস' গল্পটির প্রসঙ্গে 'অকারণ' কথাটির ironical প্রায়োগিকতা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানেও তাই গৌরদাসের ভয় বড্ড বেশি সকারণ বলেই কি 'অকারণ' কথাটির ওপর বাড়াবাড়ি রকমের জোর দেওয়ার চেষ্টা? সেক্ষেত্রে, কেন ভয় গৌরদাসের? সে কি নিজেকে মনে মনে ওই মানুষগুলির শ্রেণিশত্রু ঠাউরে বসেছে? সর্বশেষ উদ্‌বেগটিও আসলে গৌরদাসেরই— "অমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?" (ঐ) অর্থাৎ মানুষগুলির জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ার যদি তাদের বিদ্রোহেরও হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তা তো পরোক্ষে গৌরদাসের পক্ষেও বিপজ্জনক। এখানে শোষকশ্রেণির অংশীভূত হওয়ার দরুন গৌরদাসের সুপ্ত পাপবোধই কি তাকে এইরূপ উদ্‌বিগ্ন করে তুলছে?

'পুষ্করা' গল্পেও দেখা যায়, ডোমপাড়ার পাগলিই যেন হয়ে পড়ছে ঘটনাচক্রে শ্মশানকালীর ট্র্যাজিক প্রতিমূর্তি। এমনকি 'মারী ও মড়কের সমস্ত বিষ' চিরকাল

'নিঃশেষে' পান করে নেওয়ার জন্য নীলকণ্ঠের সঙ্গেও উপমিত হচ্ছে সমাজের নিচুতলার মানুষজন (১৪৮)। এ-ছাড়া, বলা বাহুল্য, প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটও একইরকম ভূমিকা নেয় গল্পের মধ্যে। তাই শ্মশানকালীর রহস্যময় প্রতিকল্প হিসেবে ডোমপাড়ার পাগলির আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দীপন-বিভাব হিসেবে দেখা যায়— "মরা নদীর জল আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল, ওপরের ন্যাড়া শিমুলগাছে ডুকরে উঠল শকুনের বাচ্চা।" (১৪৫) এইভাবেই প্রাকৃতিক আবহের আতঙ্কময় সজীবতা, সমাসোক্তির মধ্য দিয়ে মৃত্যু ও অবক্ষয়ের দ্যোতনাকেই আরও ঘনীভূত করে তোলে। পূর্বোক্ত 'দুঃশাসন' গল্পেও যখন দেখি, "জ্বলন্ত আকাশটার তলা দিয়ে উড়ে চলেছে 'সামকল' পাখির ঝাঁক— পিপাসায় কাতর হয়ে কোনো সুদূর বিল কিংবা জলার সন্ধানেই চলেছে হয়তো" (৫৩), তখন নিহিতার্থে তৎকালীন বাংলার আশ্রয়চ্যুত হতদরিদ্র মানুষগুলির যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের ছবিই মূর্ত হয়ে ওঠে।

'ইতিহাস' গল্পে আমরা পাচ্ছি একটি বিশেষ রূপকের উল্লেখ, "বীভৎস— দুর্গম জঙ্গলে বাঘ ভালুকের রাজত্ব" (১৮০)। 'টোপ' গল্পে বুনো জন্তুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে কথক জানান— "পকেটের ফাউন্টেন পেনটা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন অস্ত্রই সঙ্গে নেই।" (৬২) বুনো জন্তুকে ক্ষমতার হিংস্র করাল আগ্রাসনের রূপক হিসেবে ধরে নিলে, তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র হিসেবে কলম আসলে ক্ষমতার বিরুদ্ধে একজন লেখকের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের কথাই বলে। কিন্তু সেই লেখককেই আমরা শুরুতে দেখি রাজাবাহাদুরের স্তুতি করতে, আর শেষে দেখি জঙ্গলে রাজাবাহাদুরের মারাত্মক অপরাধের কথা বাইরের জগতের কাছে গোপন করে নীরবে আপসরফা করে নিতে। রাজাবাহাদুরের পাঠানো উপহার চটিজোড়া পায়ে দিয়ে হেঁটে তাঁর মনে হয় 'যেমনি নরম, তেমনি আরাম' (৭৪); কার্যত 'নরম' ও আরামদায়ক (comfortable)— এই দুটি বিশেষণ শুধুমাত্র চটির বিশেষণ নয়, বরং বেশি করে চটির সামগ্রিক প্রেক্ষিত তথা রাজাবাহাদুর (বুনো জন্তুদের চেয়েও বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা, ক্ষমতার নেশায় মত্ত— অ্যালকোহলের প্রসঙ্গ), ঘটনাপুঞ্জ ও সর্বোপরি কথকের নিজস্ব অবস্থান— সমস্ত কিছুর সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে। অর্থাৎ উত্তম পুরুষের ভণিতায় স্থিতাবস্থার আশ্রয়ে লালিত লেখকদের আপসকামিতাকেই এখানে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

'সৈনিক' গল্পে আমরা দেখি দুই প্রজন্মের ভিন্ন মানসিকতার রূপরেখা। বাহনের দ্বান্দ্বিকতা যেন দুই ভাবাদর্শের সংঘাত হয়ে দাঁড়ায়। নীল বাহাদুর (হাতি) ও বেবি অসটিন (মোটরগাড়ি) যথাক্রমে বন্য প্রকৃতি ও যন্ত্রসভ্যতার প্রতিনিধি হয়ে দেখা দেয়। ক্ষুধার্ত ব্যবহৃত নীল বাহাদুর মরে যেতে যেতে বঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তার শেষ প্রতিবাদ ও প্রত্যাঘাত বেবি অসটিনের ওপর উজাড় করে দিয়ে যায়। তা আসলে নির্দেশকের মধ্য দিয়ে গাড়ির মালিক ও মালিকের ভাবাদর্শগত অবস্থানের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ হয়ে ঝরে পড়ে। সেইসাথে এই ইঙ্গিতও থাকে যে, বন্য প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হলে বা রুষ্ট হলে যন্ত্রসভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সমুদ্র' গল্পে তোলপাড়কারী আন্দোলনমুখর সমুদ্র যেন কথকের চোখে হয়ে ওঠে বৃহতের বিপজ্জনক হাতছানি ও সম্মোহন, যার প্রতিতুলনায় তার স্ত্রীর 'ঝিনুক' কুড়ানোকে সে তুচ্ছতা তথা ক্ষুদ্র মানসিকতার সূচক হিসেবে অনুকম্পা করতে থাকে। তার মতে, "সমুদ্রের ধারে এসে একবার যার ঝিনুক শামুক কুড়ানোর নেশায় পেয়ে বসে, সারাক্ষণ বুঝি তাকে বালুর ওপর চোখ রেখে চলতে হয় ছুটতে হয়।" (ঐ) আরও স্পষ্টভাবে তার বক্তব্য প্রকাশ পায়—

> "সমুদ্র অনেক ছোট জিনিস ঠেলে ঠেলে তীরে তুলে দিচ্ছে। যাদের ছোট মন তারা ওসব নিয়ে মেতে থাকুক। হেনা, তোমার জন্য শামুকের খোলস, মাছের কাঁটা, জলের নীচে মরা গাছের শিকড়— কি জলের অন্ধকারে নিহত ভক্ষিত আর কোনো জীবের নখ দাঁত হাড়, যা সমুদ্রের কাছে অপবিত্র উচ্ছিষ্ট অনাবশ্যক। দু-হাতে সব কুড়িয়ে বোঝাই করে নিয়ে এস।" (ঐ)

শৌখিন বস্তুগত বিনোদন ও তুচ্ছ প্রয়োজনভিত্তিক সাংসারিকতাকেই ব্যঙ্গ করার প্রচেষ্টা। কিন্তু তার মাধ্যম হয়ে দাঁড়াচ্ছে স্ত্রীর আচরণ। যাবতীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি, বিদ্রূপ কেন তার স্ত্রী হেনাকে অবলম্বন করেই প্রকাশমান? কী করেছে হেনা? "ঘুম থেকে উঠেই সকলের আগে ও খোঁজ করে চিরুনির, চুলের কাঁটার।" (৫১) 'ঘুম' এমনিতেই সাধারণ চিহ্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নিস্ক্রিয়তার নির্দেশক, কিন্তু এই চিরুনি আর চুলের কাঁটার ভূমিকা কী হেনার জীবনে, কথকের জীবনে? হেনাকে আমরা দেখি, "আঁচল সামলে নিয়ে

চিরুনি দিয়ে ও চুল আঁচড়ায়।" (৫২) আঁচল সামলে নেওয়ার মধ্যে আত্মসংবরণ আছে, আত্মসচেতনতা আছে। ফলে তার জীবনচেতনাও থাকেও নিয়ন্ত্রিত, পোষ-মানা।

চুল আঁচড়ানো ক্রিয়াটি আসলে রূপকার্থে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসাকেই বোঝায়[৫]। কোনো চরিত্রের মধ্যে এই অভ্যাস পরোক্ষে মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার নিরিখে তার আপসকামিতাকেই নির্দেশ করতে চায়। আর চিরুনি হয়ে ওঠে সেই স্থিতাবস্থাপন্থী ভাবাদর্শের হাতিয়ার। পরবর্তীতে ইলিয়াসের লেখাতেও আমরা এই চিহ্নটির নিপুণ ব্যবহার লক্ষ করব। এখানেও আমরা দেখি, কথক তার নাগরিক চাকরি-জীবনের দৈনন্দিন একঘেয়েমিতে ক্লান্ত, বীতশ্রদ্ধ; তা সমুদ্রের সান্নিধ্য পেয়ে সেই পূর্বোক্ত গৎবাঁধা জীবনচর্যা সে ভুলে থাকতে চায়, সম্ভব হলে চিরকালের জন্য (মামা লোকটি তার অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে ক্রমশ)। তাতে কতখানি সে মরিয়া নিজের পূর্বোক্ত জীবন থেকে সরে আসতে, আর কতখানি সে ভিতরে ভিতরে তিক্তবিরক্ত সেই জীবনের একঘেয়ে গণ্ডিবদ্ধতা ও তুচ্ছতার প্রতি, বোঝা যায়। সমুদ্র যেন বলিষ্ঠ অনুঘটক হয়ে তার অন্তর্লীন বিদ্রোহকে উস্কে দেয়। ফলে সেই স্থিত পরিপাটি জীবনের স্মৃতিকে তার চোখে মূর্ত করে তোলে— এমন সবকিছু থেকে চোখ ফিরিয়ে সে সমুদ্রের রূপকত্বে বুঁদ হয়ে থাকতে চায়। তাই যেন স্ত্রী চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে 'টের পেয়ে' কথক আর 'ওদিকে' তাকায় না।

কিন্তু এটিই স্ত্রীর প্রতি তার মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির একক মাত্রা নয়; মনস্তাত্ত্বিক গল্পের ক্ষেত্রে যেমন আগেই বলেছি প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব প্রায়শই বিপরীতার্থক শ্লেষ হয়ে দেখা দেয়, এখানেও তেমন নায়কের যৌন অবদমন (অতৃপ্তি বা অক্ষমতার সূত্রে) তার দৃষ্টিকোণকে বক্রতা দেয়। স্ত্রীকে অপমান করার, অবনমিত করার, অবহেলা ও অনুকম্পা দেখানোর পুরুষতান্ত্রিক অহং এখানে বহুমাত্রিক জটিলতা নিয়ে ধরা দেয়। সমুদ্রের হাওয়ায় বিস্রস্ত ও বিপর্যস্ত পোশাকে ও চেহারায় হেনাকে দেখে কথকের মনে যে ক্ষোভ জেগেছিল তার মধ্যে উদগ্র কুটিল রিরংসাই প্রচ্ছন্ন ছিল। এই মনোভাব খানিক সেই 'মামা'র থেকেও পাওয়া। মামাই সমুদ্রের ভিন্ন এক রূপকত্ব তার সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছিল, তার দৃষ্টিকোণকে সংক্রমিত করতে পেরেছিল। সমুদ্র হয়ে ওঠে সজীব ক্ষুধার্ত একটি সত্তা, সাদা সফেন ঢেউগুলি হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর দাঁত।

সমুদ্রের এই রূপকল্পায়ন যেন কথকের প্রবল যৌন আক্রোশকেই চিনিয়ে দেয়। সমুদ্র যেন হেনার খুনসুটির শোধ তুলতে হেনাকে গ্রাস করে নিলেই অবুঝ নারীর উপযুক্ত শাস্তিবিধান হবে। আসলে 'মামা'র ও কথকের মানসিকতাই অপ্রাণিবাচক সমুদ্রে আরোপিত। আর এই গ্রাস করার রূপকার্থ আসলে যৌনসম্ভোগও হতে পারে (এমনকি বলা ভালো যৌন নির্যাতন), যা কথক তার স্ত্রীর ওপর ফলপ্রসূ করতে অক্ষম। তাই বলিষ্ঠ পুরুষ হিসেবে সমুদ্রই যেন তার প্রতিস্থাপক (proxy) হয়ে ওঠে। যদিও গল্পের শেষাংশে এই সংক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে কথক আবার (শামুক বা ঝিনুকের মতোই) নিজের খোলসের মধ্যে ফিরে আসে, সমুদ্রের তোলপাড়-করা সম্মোহন থেকে দূরে 'ঝিঁঝির ডাক ও নারিকেল পাতার মৃদু মর্মর' শুনতে শুনতে 'নিশ্চিন্ত' হয়ে সিগারেট ধরানোর মধ্যে তার প্রত্যাবর্তনের গূঢ়ার্থই বিধৃত।

এইরকমই প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বিপরীতার্থক শ্লেষ আকারে মনের জটিল অন্ধিসন্ধির উন্মোচনের নমুনা আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'গিরগিটি'র মধ্যেও আরও সূক্ষ্মভাবে ও আরও ব্যাপকভাবে পাই। শুধু তা-ই নয়, রূপকধর্মিতাও— বিশেষত যৌনতার রূপক গল্পটির শরীরে তিল-তিল সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। পৃথকভাবে প্রতিটি রূপকের ব্যাখ্যা দেওয়া একটু সময়সাপেক্ষ ও স্বতন্ত্র-পরিসর-সাপেক্ষও বটে, আমরা তাই প্রসঙ্গগুলি এখানে যথাসম্ভব সংক্ষেপে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। মায়ার আত্মরতিপূর্ণ স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কুয়োতলা তথা 'পাতকুয়ো' যেন মায়ার জীবনেরই সংকীর্ণ গোল গণ্ডিবদ্ধ পরিসরকে সূচিত করে। 'সব' কাজ পাতকুয়োর জলে মিটে যাওয়ায় মায়ার 'কত সুবিধে'! বহুব্যবহৃত 'কূপমণ্ডুক' কথাটিও এক অর্থে আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্গে অন্বিত। তাই কুয়োর জলে ঝুঁকে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেকে 'কুৎসিত' মনে হওয়ার তাৎপর্য কি তবে নিজের কূপমণ্ডুকতাকেই শনাক্ত করা? ঘরের আয়নায় যে আত্মদর্শন, তা একদিকে যেমন খণ্ডিত হয় কুয়োর জলের আয়নার আত্মদর্শনে, আবার অন্যদিকে তা অতিরঞ্জিত হয়ে পড়ে ভুবনের চোখের আয়নার আত্মদর্শনে। অবশ্য এই জলে ঝুঁকে নিজেকে কুৎসিত দেখার তাৎপর্য হিসেবে কেউ কেউ নার্সিসাসের মিথপ্রসঙ্গ এনেছেন যথার্থভাবেই; মায়াও যে একজন নিটোল নার্সিসাস, গল্পপাঠে তা নিয়ে সন্দেহ থাকার

কারণ নেই। এখানে মায়ার আত্মকেন্দ্রিকতা যেন তার যৌন অবদমনের মধ্যেই অতিমাত্রায় বিধৃত। নিজের স্তন ('জোড়া ফুলের স্বপ্ন') দেখে সে মুগ্ধ হয়। প্রকৃতির যাবতীয় ছবি মায়ার চোখের দৃষ্টিতেই জারিত হয়ে যেন যৌনতার অনুষঙ্গকেই প্রচ্ছন্ন রেখেছে। গাছ, গাছের প্রাণীকুল, ইটের ওপর শ্যাওলার আস্তরণ— সবকিছুই এক আদিম আচ্ছন্নতার ইঙ্গিত বহন করে। বুলবুলি পাখিদের নিমফল খাওয়ার মধ্যেও একই রূপকত্ব, মায়া 'সুন্দর থুতনি তুলে' সেই ফল খাওয়া দেখে— সেই থুতনি, যা অন্য একটি ফলেরই উপমেয় ('কচি পেয়ারা'— উপমাটি স্বামীদত্ত উপহার)। 'চকচকে চিকরিকাটা' নিমপাতার নাচানাচি, 'আগুনে রঙের' দুটি ফড়িঙের দিকে 'স্থিরচোখে তাকিয়ে' ডুমুরের ডালে ওঁৎ পেতে বসে-থাকা গিরগিটি, ঘাসের ফাঁকে চিকচিকে জলকাদা আর অগুনতি কিলকিলে মশার বাচ্চা, খোলা হাওয়া আর 'ঘাসের শীষের দোলানি', 'পাকা নিমফলের গন্ধ' ও 'বুলবুলির কিচিরমিচির'— সবকিছুই যেন সম্ভাব্য রূপক হয়ে মায়ার পাঠ-পরিগ্রহণের অপেক্ষায় সজীব। মায়ার স্নানদৃশ্যেও তারা সজাগ থেকে অংশগ্রহণ করে, দর্শক বা উদ্দীপকের ভূমিকায়। এমনকি মায়ার স্নানের প্রস্তুতির বর্ণনাও আশ্চর্য সদৃশতায় রতিক্রিয়ার প্রস্তুতির বিভ্রম টেনে আনে। "মায়া একটানে গায়ের ব্লাউজটা খুলে ফেলল। কাঁচুলি ও সায়ার বাঁধন আলগা করে দিতে সরসর করে সেগুলো আপনা থেকে খসে পড়ল। পা দিয়ে একপাশে ও-দুটো ঠেলে সরিয়ে রাখল ও।" (১১০) বর্ণনাটির আগের ও পরের যাবতীয় বাক্য সরিয়ে রেখে এই বাক্যত্রয়ীকে যদি প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে পেশ করা হয়, তাহলে এই দৃশ্যের তাৎপর্য বদলে যেতে আমূল সম্ভাবনা রয়েছে। মায়ার মনে হয়, প্রাণী ও অপ্রাণীবাচক প্রতিটি প্রাকৃতিক সত্তাই যেন তার স্নানদৃশ্যে চোখ দিয়ে তার রূপযৌবনের উত্তাপ ও মাধুর্য উপভোগ করে। সাবান-গোলা জল 'দুধের ধারা' হয়ে তার 'উষ্ণ কোমল' চামড়ার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়লে, আর তার 'কচি কলাপাতার বোঁটার মতো' শিরদাঁড়া ঘেঁষে একটি 'মশা' হুল ফুটিয়ে রক্ত খেয়ে গেলে, মায়ার শরীর যেন যৌনকামনার ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তবু মায়ার মন বিষণ্ণ হয়ে থাকে, যেন ভুবনকে দাঁড়াতে নিষেধ করার জন্য, গোটা প্রকৃতিই তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তবে কি আপাত-সরল মুগ্ধতার নামে অলীক যে রূপলুব্ধতা, অদৃশ্য যে সম্ভোগদৃষ্টি মায়া

ওইসব প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে কল্পনা করেছে, ভুবন কি একজন জীবন্ত পুরুষ হিসেবে সেই দৃষ্টির মালিকানাস্বত্ব হরণ করে নিয়েছে? কিন্তু তাকে তো বারবার ভাঙা পাঁচিল বা ছাতাপড়া ইটের স্তূপ বা ডুমুরের 'মরা' ডাল বা 'নিষ্প্রাণ' মাদারগাছের সঙ্গে তুলনা করেছে, 'পুরুষ' হিসেবে স্বীকারই করেনি। এখানেই বিপরীতার্থক শ্লেষ হিসেবে প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক গল্পে 'অকারণ' কথাটি যেমন ছিল ironical, এখানেও তেমন বারবার বলপূর্বকভাবে ভুবনের পুরুষত্বকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে মায়া আসলে ভুবনের পুরুষত্বকেই বেশি করে আলোচ্য করে তুলছে। যেন ভুবনকে 'পুরুষ' হিসেবে স্বীকার করে নিলে 'পরপুরুষের' মুগ্ধ দৃষ্টিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য সে সমাজের কাছে তো বটেই, এমনকি নিজের কাছেও অসতী বা কলুষিতা হয়ে উঠবে। তাই তার নিজের গহন সতর্কতার আড়ালটুকু, ভুবনের ছদ্মপরিচিতির আড়ালটুকু, মায়াকে রাখতেই হয়। কারণ স্বামীর প্রতি তার ক্রমবর্ধমান বিরক্তি ও ঔদাসীন্য (এমনিতেই যা মায়ার স্বভাবগত) এবং সন্তানহীনতার প্রচ্ছন্ন বেদনা ও ক্ষোভ— একধরনের যৌন-অতৃপ্তির অশুভ ইঙ্গিত বহন করে। প্রণবের স্বাভাবিক পুরুষতান্ত্রিকতাই হয়তো মায়ার সেই অতৃপ্তির বেদনাকে, আত্মরতিকে, এতখানি বিক্ষুব্ধ ও বেপরোয়া করে তুলেছে। এমনকি সুকুমারদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের ঝি-কে নিয়ে পালানোর কেচ্ছাপ্রসঙ্গে স্বামীর প্রতি মায়ার বিরক্তির আতিশয্যও আসলে বিপরীতার্থক শ্লেষ। এই কেচ্ছাসংক্রান্ত নিন্দামন্দ পরোক্ষে মায়ারই ভুবন-বিষয়ক প্রচ্ছন্ন পাপবোধকে খুঁচিয়ে তোলে। তাই যেন মরিয়া আত্মরক্ষার্থে মায়ার এতখানি উগ্রতা[৬]। ভুবনের প্রসঙ্গে, 'জং-ধরা' সব 'যন্ত্রপাতি', চেনার-অনুপযুক্ত ইলেকট্রিকের কলকব্জা ('দুটো গোল মতন কি যেন') ও 'ইলেকট্রিক স্টোভ' ('স্টোভ' গল্পটি স্মরণীয়) প্রভৃতির পাশাপাশি তার কোটরগত চোখ কিংবা কপালের 'মোটা শিরা' কিংবা 'কাঠের টুকরোর মতন' চোয়াল— সবকিছু মিলে তার যে দৈন্যদশাকে প্রকাশ করছে, তা আমাদের মতে কেবল আর্থসামাজিক দৈন্য নয়, তার শারীরিক যৌনক্ষমতার দৈন্যও আভাসিত। 'শূন্য অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি'ও অনুরূপ অর্থেই ভুবনের রূপক হয়ে উঠতে পারে। তা

দেখে মায়ার চোখ ছলছল করে ওঠা— তার সহানুভূতিজনিত বেদনার প্রকাশ নাও হতে পারে, বদলে তার হতাশাজনিত বেদনার প্রকাশ হিসেবেও তাৎপর্যপূর্ণ। এই হতাশা ও সতর্কতার টানাপোড়েন কিন্তু মায়ার মধ্যে নানাসময় নানাভাবে দেখা যায়। 'তাচ্ছিল্যের শীতলতা' দিয়ে 'চোখের আগুন' নিভিয়ে দেওয়া কিংবা 'বিদ্যুৎশিহরন' মেরুদাঁড়া থেকে মিলিয়ে গেলে 'কান্না' পাওয়া প্রভৃতি উল্লেখ্য। ভুবনকে যদি সে 'পুরুষ' হিসেবে না-ই দেখতে চাইবে, তাহলে চোখে আগুন আর মেরুদণ্ডে বিদ্যুৎশিহরন তার কোথা থেকে এল? ভুবনের চালার কোনার দিকে অব্যবহৃত উনুন ও ভাঙা বাঁশও একইরকম যৌন তাৎপর্য নিয়ে ধরা দেয়। সেই 'উনুন' সাজিয়ে 'আগুন' দেওয়ার প্রস্তুতিতে মায়ার 'গলার বুকের উদ্ধত পেশীর সুন্দর ভঙ্গি', আর তা দেখতে গিয়ে ভুবনের ফ্যাকাশে চোখে রঙ আনার চেষ্টা সেই রূপকধর্মিতাকে পরিপুষ্ট করে। তখন 'ঘাম মুছবার আছিলায়' আঁচল নামিয়ে কোলে জড়ো করার মধ্যে মায়ার দ্বান্দ্বিকতাই ব্যক্ত হয়; আর পুনরায় মুমূর্ষু মাদারগাছের উপমা টেনে আনায় সেই দ্বান্দ্বিকতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। কিংবা রান্নার জন্য সংগৃহীত 'জলপচা সাদাটে কটা পেটফোলা ট্যাংরা মাছ'ও তা-ই (লক্ষণীয় মাছ কুটতে গিয়ে ভুবনের 'দীর্ঘশ্বাস')। এমনকি মায়াও একবার ভুবনের চোখকে 'মরা মাছের মত চোখ' বলে মনে করেছে। আর সেই 'পচা মাছ' যে 'রসুন' ছাড়া ভালো লাগবে না— মায়ার এরূপ পরামর্শের ইঙ্গিত খুবই জোরালো ও তীব্র। এমনকি 'বঁটি' ('আপনার বুঝি বঁটি নেই?') আর কাটারিও। "বঁটি থাকলে সুবিধা হত। ছোট মাছ কাটারি দিয়ে কুটতে কষ্ট।" (১১৭) মায়ার এই মন্তব্যও যথেষ্ট রহস্যব্যঞ্জনাময়। এ-ছাড়া এও দেখা যায়, 'ক্ষুদে প্রজাপতিটা' একসময় 'বাড়াবাড়ি' আরম্ভ করলে মায়া তাকে 'খপ' করে ধরে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে দেয়, প্রজাপতিটা চুপচাপ ঘাসে শুয়ে থেকে তারপর উঠে পেয়ারা গাছের দিকে চলে গেলে, মায়া বলে, "মরেনি। আমি ভাবলাম হাতের চাপে চটকে শেষ হয়ে গেছে।" (১৮) এখানে মর্ষকাম নয়, বরং মায়ার ধর্ষকামই ব্যঞ্জিত হয় (অথবা ওই 'বাচ্চা' প্রজাপতিটি মায়ার মনের রোম্যান্টিক উদ্দীপনার নতুন উন্মেষেরও রূপক হয়ে থাকতে পারে, যে-উদ্দীপনাকে মায়া নস্যাৎ করতে চাইলেও পারে না)। পোকামাকড়ের দিকে

'স্থির সতর্ক দৃষ্টি' রেখে টিকটিকির বসে থাকা কিংবা শিকারসন্ধানী বাঘিনীর উপমায় সেই আগ্রাসী মনোভাবই ব্যক্ত হয়। কিংবা তার বেণীর সঙ্গে সাপের তুলনাও ত্রিভুজ রূপক (বেণী < সাপ > যৌনকামনা) হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। আত্মপ্রণয়িনী মায়া সবসময় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মধ্যে নিরন্তর নিজের অভিলাষিত যৌনতার রূপক খুঁজে বেরিয়েছে, ভুবন তাকে সেইসব রূপক আরও সৃজনশীল ও অভিনবরূপে জুগিয়ে গেছে (ডালিমচারা থেকে শুরু করে রাজহংসী অথবা চিতাবাঘিনী), আর এদিকে প্রণব[৭] কেবল একটি উপমা উপহার দিয়েই ক্ষান্ত (এমনকি সেটিকেও একসময় প্রতিস্থাপিত করে জায়গা করে নিয়েছে ভুবনের দেওয়া নতুন উপমা— করবী ফুলের তলার দিকটা)। আরেকটি রূপকও প্রণব অবশ্য আবিষ্কার করেছে, কিন্তু সে তার নিজের জন্য, দাম্পত্যের রূপক হিসেবে অন্ধকার রহস্যময় রক্তখেকো বেড়াল।

এ-ছাড়া 'নদী ও নারী' গল্পে 'দমকা' বাতাসের দ্বারা নৌকা দুলিয়ে দেওয়ার ও বাতি কাঁপিয়ে দেওয়ার মধ্যে (২৯) ঘটনার আকস্মিকতায় স্থিত মূল্যবোধ ও চেতনার শান্তি বিঘ্নিত হওয়াকে বোঝায়; কিংবা 'তারিণীর বাড়ি-বদল' গল্পে 'বাড়ি' কথাটিকে আশ্রয়ের দ্যোতক হিসেবে ধরলে, বিলম্বিত তাৎপর্যে, ইহলোক থেকে অন্য কোনো নক্ষত্রলোকে তারিণীর ঠাঁইবদল তথা মৃত্যুর দার্শনিক ব্যঞ্জনাই প্রকাশ পাচ্ছে; কিংবা 'জ্বালা' গল্পের শেষে নীরার মেয়ে পিন্টুরানি শানওয়ালার 'ধারালো বঁটির পেটে' আঙুল ঘষতে গিয়ে যখন 'রক্তারক্তি কাণ্ড' বাঁধিয়ে তোলে (২৫৫), তখন বঁটির ধার আসলে জীবনেরই বিপজ্জনক ধারালো সম্ভাব্যতা অথবা অনিরাপত্তার কথাই বলে, যে-নিরাপত্তাহীনতার স্বাদ ওই শানওয়ালা লোকটির থেকে অল্প খানিক ভাগ করে নেয় নীরার মেয়ে তথা উত্তরাধিকার।

৩.৩.২

উপরোক্ত আলোচনাটুকু মাথায় রেখে আমরা ইলিয়াসের গল্পগুলিকে (ও তার সঙ্গে উপন্যাস-দুটিকেও জুড়ে নেব, যেহেতু চিহ্নের যোগাযোগ রয়েছে) একটু দেখার চেষ্টা করব। ১৯৭৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর,* যে–বইটি বের হওয়ার কিছুকাল পর রাজশাহী থেকে 'সংবর্ত' পত্রিকায় হাসান আজিজুল হক 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ' নামে একটি সমালোচনা লেখেন, যেটি পরবর্তীকালে তাঁর *কথাসাহিত্যের কথকতা* (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮১) বইটির অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত প্রবন্ধে হাসান আজিজুল হক *অন্য ঘরে অন্য স্বর* বইটি সম্বন্ধে ও বইয়ের লেখক সম্বন্ধে প্রশংসা যেমন করেছেন, তেমনি বইটির গল্পগুলির বহুবিধ ভুলত্রুটির উল্লেখ করেছেন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। আর এইসমস্ত গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিন্দিত গল্পটি হল গ্রন্থের প্রথম গল্প 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। গল্পটি হাসান আজিজুল হকের কাছে এতখানিই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে যে তিনি গল্পটির গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তিকরণের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। গল্পটিকে তিনি আত্মজীবনীমূলক (এমনকি 'আত্মকরুণায় ভরপুর') লেখা হিসেবে দেখেছেন (হক: ১৯৮১: ৭৯-৮০)। গল্পটির কিছু কিছু স্থান, বস্তু বা অনুষঙ্গের সঙ্গে ইলিয়াসের জীবনের কিছু কিছু মিল পরিলক্ষিত হয়, একথা ঠিক। 'গোটিয়ার বিল'-এর উপমা, ডাকনাম 'রঞ্জু' (প্রকৃত নাম 'মঞ্জু') বা পিতা 'ইলিয়াস সাহেব' ও পিতার ছাত্র রাজনীতির প্রসঙ্গ এবং সময়াতিক্রমী একটি বর্ণনায় কৌশলে নিজের জন্মসালটির উল্লেখ ("এক হাজার নয়শো তেতাল্লিশ বছর আগে আমার স্কুলের বন্ধুরা এখানে ক্রিকেট খেলতো"— পৃ. ১৭) গল্পটির আত্মজীবনীমূলক হওয়ার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু গল্পটির চিহ্নায়কপ্রকরণ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখব যে ইলিয়াস এই গল্পে আত্মজীবনীমূলক পরিসরকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে গেছেন, গল্পটি ভাব-ব্যঞ্জনায় হয়ে উঠেছে ক্লাসিক, আবহমান।

গল্পের শুরু থেকেই আমরা রঞ্জুকে দেখি একটি ঘরের মধ্যে বন্দী, যে-ঘরের 'বিষাদবর্ণ দেওয়াল', দরজার বাইরে 'তালা' ও ভিতর থেকে 'ছিটকিনি'। এখানে 'তালা'

ও 'ছিটকিনি' যথাক্রমে বাইরের ও ভিতরের বন্দিত্বকে নির্দেশ করছে। অর্থাৎ, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্দিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বন্দিত্বের কাঠামো। রঞ্জুর ঘর এবং রঞ্জুদের বাড়ি আসলে একটি স্থবির ব্যবস্থার সূচক হিসাবে অবস্থান করছে। সামনে বই খোলা রেখে রঞ্জুর মনে হয় 'অক্ষর'গুলি উদাস রয়ে যাচ্ছে, 'যেন অনন্তকাল কুমারী থাকবার জন্য একজন রিক্ত রক্তাক্ত জন্মদান করলো এদের' (প্রচ্ছন্ন তুলনা রয়েছে অক্ষরগুলির সঙ্গে রঞ্জুর); সৃষ্টিহীন স্থবির একটা পরিবেশের ভিতর তন্নতন্ন করে সে নিজের জন্মের সার্থকতা খোঁজে, অস্তিত্বের তাৎপর্য সন্ধান করে। অথচ সময় যেন থমকে গেছে, জীবনের প্রবাহ যেন মন্থর হয়ে গেছে শৈবালজালে; 'চায়ের পেয়ালায় তিনটি ভাঙা পাতা' যেন 'ঘড়ির কাঁটা'র ভূমিকা পালন করছে। হাসান আজিজুল হক এই ধরনের 'কাব্যভাষা'র ব্যবহার সেইরূপ নিপুণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে মনে করেননি। অথচ দেখা যাচ্ছে, 'চায়ের পেয়ালা'র একটি ক্ষুদ্র ছবিই কী কৌশলে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা স্থিতাবস্থার ব্যঞ্জনা বহন করছে। এই স্থিতাবস্থাই গোটা গল্পটিতে নানা চিহ্নায়কের মাধ্যমে উপস্থাপিত। 'রঞ্জু' তার বিরোধীপক্ষ। স্থিতাবস্থার বিপরীতে আরও যে একটি বিশেষ প্রবণতা রয়েছে গল্পে, তা হল অন্বেষণ তথা অস্থিরতা। এই সংঘাতটিই গল্পের ভাবসত্য। এই সংঘাতের বাইরে গল্পটিতে আসলে কোনো ঘটনাও নেই, কোনো চরিত্রও নেই।

এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে, রঞ্জু খুব গুছিয়ে কথা বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না; তা স্পষ্টতই রঞ্জুর চরিত্রগত ধাঁচটিকে নির্দেশ করছে। গুছিয়ে কথা বলা ক্রিয়াটি স্থির পরিপাটি মধ্যবিত্ত-জীবনের প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক (কখনো আবার তা সাজানো-গোছানো উচ্চবিত্ত জীবন-সংস্কৃতিরও দ্যোতক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ)। 'উৎসব' গল্পে উচ্চবিত্ত জগতের নারী-পুরুষগণ (যেমন, পারভেজের বউ বা কাইয়ুব) কিংবা 'প্রতিশোধ' গল্পের আবুল হাশেম এই গুণে অভ্যস্ত। তারা সবাই বাহ্যিক জৌলুষপূর্ণ স্থবির সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি। কিন্তু রঞ্জুর দ্বারা এ কাজ কখনোই সম্ভব নয়। এসবের মধ্যে রঞ্জু 'ভারি বিব্রত', 'অনিচ্ছুক'। তাই 'ঠাণ্ডা মেজে, চেয়ারের গাঢ় খয়েরি পা ও টেবল ক্লথের লোটানো লতা' যা এক শীতল পারিপাট্যেরই ভাবকল্প ফুটিয়ে তোলে, তার মধ্যে রঞ্জু নিজেকে অনুভব করতে পারে না, 'অগোছালো' তাকিয়ে থাকে।

কোনো ছবিই এ-গল্পে বাড়তি নয়, তা গল্পের কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে 'গল্পন্যায়ে আবদ্ধ' বৈকি। হাসান আজিজুল হক গল্পে বর্ণিত ছবিগুলির মধ্যে নিহিত রূপকধর্মিতাকে হয়তো শনাক্ত করতে চাননি। কেবল ভাবগত সরলরৈখিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে গল্পটিকে উপেক্ষা করেছিলেন তিনি। তাই 'দেওয়ালে কোনোদিন-উড়বে-না তুলোর শাদা প্রজাপতি' ও 'লালচে' হয়ে-যাওয়া 'সবুজ সুতোর প্রেমিক ময়ূর দম্পতি'-কে রঞ্জু ও রঞ্জুর বাবা-মা হিসাবে আবিষ্কার করতে পারেননি। প্রতিটি শব্দই এখানে অব্যর্থ। একইসাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ছবি হল— "ইজিচেয়ারের বিস্তৃত হাতায় বেহায়া বার্ণার্ড শ'র ওপর আব্বার পুরু চশমা মশারিকে পানসে তাকাচ্ছে।" (১৫) এখানে 'ইজিচেয়ার', 'পুরু চশমা', 'মশারি' সব মিলে এক বিশেষ বক্তব্যকেই প্রকাশ করছে। এর মধ্যে চশমা ও মশারির সম্ভাব্য নিহিতার্থের সঙ্গে আমরা ইতোমধ্যেই পরিচিত। 'ইজিচেয়ারের বিস্তৃত হাতা' একটি নিশ্চিত নিরাপদ যাপনের কথা বলে। 'পুরু চশমা' একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমের জীবনদৃষ্টিকে চিহ্নিত করছে, যা ভেদ করে প্রকৃত জীবনের কাছে পৌঁছানো সহজসাধ্য নয়, কারণ সেই নির্দিষ্ট ফ্রেমের জীবনদৃষ্টি নিবদ্ধ আছে 'মশারি' তথা আবদ্ধ জীবনের দিকে। এই 'মশারি'ই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' থেকে শুরু করে 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', *চিলেকোঠার সেপাই* এবং *খোয়াবনামা* অবধি চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, নানা ব্যঞ্জনায়।

আরও যা-কিছু উপকরণ রয়েছে এই গল্পে, বস্তু বা অবস্তু, সমস্ত কিছুই একই চিহ্নায়ক-প্রকরণের অঙ্গ। 'নীল আলোর ফ্যাকাশে গন্ধ, বাইরের সোঁদা মাটির আভাস, আব্বার ছড়িয়ে যাওয়া সিগ্রেটের লুপ্ত ধোঁয়া, নিচে পুরোনো স্টেটসম্যান, ধুলোভরা স্লিপার, টেবলে শেপেনহাওয়ারের অনন্ত সৌরভ'-এর সঙ্গে মিশে 'আম্মার নীল জর্জেটের শাড়ির' একটা 'পুরনো পুরনো', 'ঘুম ঘুম', 'নিথর' গন্ধ— 'ন্যাপথলিন, বাক্সের চামড়া, বাতাস সব মিলিয়ে' ওই বানিয়ে-তোলা আবদ্ধ বিধুর জীবনকেই (বিশেষত 'ন্যাপথলিন, বাক্সের চামড়া, বাতাস') চিহ্নায়িত করছে। যার মধ্যে কোথাও অস্থিরতা বা অন্বেষণ নেই, এক অদ্ভুত নিশ্চিন্ততা আর ঘুম ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

তাই এসেছে নিশ্চিন্দিপুরের অনুষঙ্গ। তা কিন্তু কোনোভাবেই রঞ্জুর স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ করার জন্য নয়। লক্ষণীয়, নামটি কিন্তু এখানে 'নিশ্চিন্তপুর'। এবং তা গল্পের

সঙ্গে ভাবসূত্রে সংযুক্ত হয়েছে বিশেষ কয়েকটি চিহ্নের ব্যঞ্জনার মাধ্যমেই। 'দুর্গা সিঁদুরের কৌটো চুরি করে তাকের ওপর লুকিয়ে রেখেছিলো'— এখানে 'সিঁদুরের কৌটো' যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। 'সিঁদুর', যা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় (হিন্দুসমাজে) নারীর বন্দিত্বের অন্যতম প্রধান একটি সূচক, তার আধারটির প্রতি এই মোহ এক্ষেত্রে দুর্গার বন্দিত্বের প্রবণতাকেই নির্দেশ করে। এই প্রবণতার প্রতি রঞ্জুর তাই সমর্থন নেই। সে দুর্গাকেও গতিশীল মুক্ত জীবনের অঙ্গীভূত দেখতে চায়। সে যে তা সচেতনভাবে চায়, তা নয়, কিন্তু গহনভাবে কোথাও যেন রঞ্জুর ভিতরে এই বোধটুকু প্রতিফলিত হয়। *পথের পাঁচালী*-তে 'রেললাইন' কিন্তু কখনোই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকমাত্র নয়; বরং তা নিশ্চল সমাজব্যবস্থার বিপরীতে প্রগতিশীল একটি পদ্ধতির বা আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে গতিরই ধারক ও বাহক হিসাবে আসে। তাই রেললাইনের সঙ্গে দুর্গার কখনও সাক্ষাৎ ঘটে না (কেবল অপুর ঘটে)। কারণ দুর্গা ইন্দির-ঠাকরুনের উত্তরাধিকার, নিশ্চিন্দিপুরের 'সেকাল'-এর ধারাবাহিক প্রতিনিধি। কিন্তু রঞ্জু তাকে নিয়েই 'রেললাইন' দেখার জন্য 'ঝাঁ ঝাঁ' দুপুরকে অগ্রাহ্য করে দূরে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখে। এখানে রঞ্জুর মনস্তত্ত্ব নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে। 'নিশ্চিন্তপুর' হয়ে ওঠে একটা সময়ের, ব্যবস্থার চিহ্নায়ক।

এই গল্পে রঞ্জু আক্ষরিক অর্থে কোনো বিপ্লবের কথা বলে না। তবু গল্পটি কোনোভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষাদের নয়, বিচ্ছিন্নতার নয়; বিদ্রোহের গল্প। গল্পের শেষে রঞ্জুর মৃত্যু হয়, তবু তাকে পরাজিত ভাবতে পারি না কখনো, এক অগ্রপথিকের মতো মনে হয় তাকে। স্থির, পরিবর্তনহীন, স্থবির সমাজব্যবস্থার প্রতি কণায় কণায় উপদ্রবের মতো ছড়িয়ে রয়েছে তার যে অন্বেষণ, অস্থিরতা, তা-ই এক চূড়ান্ত সম্ভাবনার দিকে আমাদের নিয়ে যায়।

এই গল্পে তাই রঞ্জু নিছক কোনও চরিত্র নয়, উল্লেখযোগ্য একটি চিহ্ন হয়ে ওঠে। তাই যখন দেখি 'অঞ্জু' ও 'মঞ্জু' দুটো বিছানায় 'স্বপ্নময়, নরম অন্ধকারে' কেমন 'অনায়াস' ঘুমোচ্ছে, তখন শেলফে-আলমারিতে 'সারি সারি কফিনের মতো' শুয়ে থাকা বইগুলির সঙ্গে তারা এক হয়ে যায়। সেই মৃত নিষ্প্রাণ সমাজের বিপরীতে 'রঞ্জু' যেন মুক্তির চিরজাগ্রত এক অগ্রপথিক। সে 'অঞ্জু' ও 'মঞ্জু'র 'অপর' এক ভাষ্য। 'মিলির

হাতে স্টেনগান' (*দুধেভাতে উৎপাত*) গল্পে 'মিলি'ও তেমনি ঘুমন্ত 'লিলি'র বিপরীতে 'অপর' এক পন্থা হয়ে ওঠে।

পাশাপাশি আরও একটি জরুরি প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে চাই। তা হল: এই গল্পে রঞ্জুর বাবার ভূমিকা কী? রঞ্জুর এই অন্বেষণের সঙ্গে কি তার কোনো যোগ রয়েছে? প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষ কোনো যোগ? গল্প থেকে মনে হয় তরুণ বয়সে রঞ্জুর বাবাও ওইরূপ অন্বেষণের শরিক ছিলেন, কারণ বিরক্তির মধ্যে রঞ্জুর প্রতি একটা ছলকে ওঠা সহানুভূতিও মাঝে মাঝে দেখা যায়। বাবার তরুণ বয়সের দিনগুলিকে (যখন তিনি 'খালি মিটিং' করতেন) ছুঁয়ে দেখার সাধ হয় রঞ্জুর। অর্থাৎ, সেখানেই যেন রয়ে গেছে হারানো জিনিসটির খোঁজ। এখন সেই দিন নেই, বাবা হয়ে গেছেন 'সাধারণ ও সংসারী'। প্রসঙ্গত নির্মল হালদারের লেখা দুটি পঙক্তির কথা মনে পড়বে আমাদের: "বাবাকে মনে পড়লে জড়োসড়ো একটা লোক দেখি/ জড়োসড়ো জীবন আমাদের নয়"। (১৪) আসলে 'বাবা' এই ধারণাটিই একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। অবশ্যই তা প্রতিনিধিত্বমূলক (পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাপেক্ষে)। 'বাবা' প্রকৃতপক্ষে আমাদের অস্তিত্বের মূল চেতনার পূর্বসূরি পথ। তা আমাদের পূর্বতন প্রজন্মকে তথা উৎসকালকে নির্দেশ করে। আমরা সেই সময়খণ্ডের, সেই ইতিহাসের ধারাবাহিক উত্তরাধিকার। সেই ইতিহাসের সঙ্গে যথাযথ পরিচয় না ঘটলে আমাদের পড়তে হয় অস্তিত্ব-সংকটে। সেই যোগটা রঞ্জুর ক্ষেত্রে ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই তার অন্বেষণ হয়ে ওঠে এত কঠিন, এত বিমূর্ত। *খোঁয়ারি*-র 'পিতৃবিয়োগ' গল্পেও অনুরূপ এক 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' রয়েছে, সেখানেও পিতার যথার্থ পরিচয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ-হওয়া গল্পের নায়ককে নামতে হয় নিজের মতো অন্বেষণে। 'প্রতিশোধ' গল্পে দেখি, ওসমানের বাবা আব্দুল গণির ঘরের দরজায় পৌঁছলে পাওয়া যায় 'স্পিরিট, ডেটল, কমলালেবু, ওষুধপত্র ও রোগের মিলিত গন্ধ', তা কেবল আব্দুল গণির ঘরের রুগ্ন পরিবেশই নয়, বরং এক রুগ্ন পঙ্গু ইতিহাসের কথাই বলে যার উত্তরাধিকার বহন করে ওসমান। এমনকি আবুল হাশেমের সঙ্গে আপোষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ওসমানের বাবা 'ইজিচেয়ারে মাথা এলিয়ে ক্লান্ত সুখে' দরজার বাইরে উঠোনের রোদ দেখে। 'ইজিচেয়ার' যাকে নিশ্চিন্ততার নির্দেশক হিসাবে আগেই উল্লেখ করেছি, সেই ইজিচেয়ারে মাথা-এলিয়ে-থাকা পিতা স্পষ্টতই

আমাদের পূর্বতন ইতিহাসের (আমাদের উৎস-ইতিহাসের) আপসমূলক নিশ্চিন্ততার ইঙ্গিত আনে। সে-ইতিহাস স্বেচ্ছাশোষিতের (সাইনবোর্ডে মোরগের ছবি)। তা থেকে উত্তরণের অক্ষম প্রয়াস আছে ওসমানের মধ্যে, কিন্তু ডেকচির ঢাকনি বা চৌবাচ্চার ওপর টিনের ঢাকনি বড়ো অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় এই গল্পে। 'ফেরারী' গল্পেও হানিফের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে রুগ্ন ইতিহাসের অভিশাপ। শয্যাগত পিতার পারিপার্শ্বিক সামগ্রীর ডিটেলিং এখানেও হয়ে ওঠে পঙ্গু সময়ের চিহ্ন।

হাসান আজিজুল হক 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পটিকে বাতিলের পর্যায়ে ফেলেছিলেন, সুশান্ত মজুমদার বলেছিলেন— "১৯৬৪ সালের দিকে রচিত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে আজকের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অনুপস্থিত।" (২০০০ : ১১৫) কিন্তু গল্পটির চিহ্ন বিশ্লেষণ করে আমরা দেখলাম যে, বদ্ধ ইতিহাস থেকে মুক্তির নিরন্তর অন্বেষণই গল্পে আবহমান সংগ্রামের ইঙ্গিতবাহী। তাই গল্পটি গ্রহণযোগ্য তো বটেই, সেই সঙ্গে ইলিয়াসের সাহিত্যকীর্তির ও সাহিত্যভাবনার একটি শক্তিশালী ভূমিকা হিসাবেও গল্পটি অবশ্যপাঠ্য।

হাসান আজিজুল হক 'ফেরারী' গল্পের ছবিগুলিকেও 'উদ্দেশ্যহীন' তথা অপ্রয়োজনীয় বলে দাবি করেছেন। এই দাবি অনেকখানিই মানা চলে, তবে পুরোপুরি নয়। কারণ এসবের মধ্যে 'পরী দেখার বিভ্রম'-টিকে নিছক ছবি হিসাবে ব্যাখ্যা করে চলে না। বস্তুত গল্পটিতে এই একটিই মাত্র রূপকের ব্যবহার দেখি যা গল্পটির মূলসূত্রের সঙ্গে ভাবপরিণতিতে আবদ্ধ। জীনপরী-দেখার ঘটনাটি পুরাতন ঢাকা শহরের একটি লোকশ্রুতিকে হয়তো প্রকাশ করছে, কিন্তু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। ইব্রাহিমের জীনপরী দেখা তার স্বপ্নিল সম্মোহিত জীবনচেতনারই রূপক। কারণ 'ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে, আড্ডা দিয়ে ও বায়োস্কোপ দেখে' ইব্রাহিমের যে দিন কাটত তা গল্পেই উল্লিখিত। সুতরাং ইব্রাহিমের মধ্যে যে একপ্রকার স্বপ্নালু জীবনবিলাসিতা রয়েছে তা স্পষ্ট। তার বিপরীতে রয়েছে প্রতিরোধক হিসাবে ইব্রাহিমের গাড়ির 'ঘোড়াদুটো'। 'ঘোড়া' যে গতির তথা চলমান জীবনের চিহ্নায়ক, তা শিল্প সাহিত্যে নতুন কিছু নয়। এখানে দেখি, পরী দেখে ইব্রাহিম থামতে চাইলে ঘোড়াযুগল তাকে নিষেধ করে, থামতে অস্বীকার করে। মনে হতে পারে, মনুষ্যেতর প্রাণী হিসাবে ঘোড়া-দুটি হয়তো ইব্রাহিমের

অলৌকিক ক্ষতির একটা আভাস পেয়েছিল। এটি হয়তো লোকবিশ্বাসের একটি দিক, বাইরের মোড়ক মাত্র। কিন্তু ভিতরের তাৎপর্য এই যে, জীবনের চলমানতা যে-কোনো ধরনের ভাববিলাসী স্বপ্নাচ্ছন্নতাকে অস্বীকার করে (এই স্বপ্নাচ্ছন্নতা আর *খোয়াবনামা*-র 'খোয়াব'-এর মধ্যে কিন্তু প্রভেদ আছে)। আর জীবনের গতিকে অগ্রাহ্য করে মোহাবিষ্ট স্বপ্নাচ্ছন্নতার কাছে পরাভব বরণ করার অর্থ, বা পরিণতি, সময় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়খণ্ডের ভিতরে আটকে থেকে গুমরে গুমরে মরা, মৃতপ্রায় বাঁচা। এই বন্দীদশা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হতে দেখি। হানিফকেও তার ইতিহাসের, তার পূর্বপুরুষের বন্দিত্বকে অভিশাপকে বহন করতে হয় নিয়তিরূপে। একটি পরাবাস্তব দৃশ্যে 'শাহজাদী'-কে তুলে আনার মিথ্যা প্রচেষ্টায়, 'দোলাই খালের ঘোলা জলে' (কদর্য জীবনজটিলতার ভিতর, নির্গমনের পথবিহীন) 'হানিফ ও হানিফের সমবয়স্ক ইব্রাহিম দিনমান শুধু সাঁতার কাটে'। আবার দেখি হানিফের শরীরে 'বাঁশের মই' জুড়ে দিয়ে ইব্রাহিম তার মাথায় উঠে যাচ্ছে করোটিজুড়ে 'ইঁট' গাঁথার জন্য। এখানেই আবদ্ধ অভিশপ্ত ইতিহাস গ্রাস করতে চায় হানিফকে ও হানিফ তা ঝেড়ে ফেলতে চায়। তাই তাকেও বেরোতে হয় একপ্রকার 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-তেই।

'যোগাযোগ' গল্পটিকে 'নিটোল বাৎসল্যের গল্প' হিসাবে দেখেছেন কেউ কেউ (সাহা: ২০০৬: ১৫)। কিন্তু গল্পটির কিছু চিহ্নের নিরিখে ঠিক বিপরীত কিছু মনে হয়। গল্পটিতে রোকেয়ার মধ্যে বা রোকেয়ার মৃত মা অথবা সোলায়মান আলির মধ্যে ব্যাকুল তরতাজা বাৎসল্যের স্ফূরণ দেখতে পাই আমরা। এক প্রশান্ত গভীর বাৎসল্যের পরিমণ্ডল গল্পটির মধ্যে আয়োজন করেন লেখক। রোকেয়ার দুশ্চিন্তা ব্যকুলতা, তার মনস্তত্ত্বে রেললাইনের ধারে প্রতিটি টেলিগ্রাফের পোস্টে রোকেয়ার স্বামী হান্নানের শোক, বিলাপ অথবা কবর খোঁড়ার পরাবাস্তব দৃশ্য, সকালের 'শাদা ও নিরাভরণ রোদ', রোকেয়ার মৃত মায়ের স্বপ্নিল আবির্ভাব, সোলায়মান আলির রোকেয়াকে ভরসাপ্রদান—সবকিছু মিলে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে পাঠককে, এক প্রশান্ত আশ্রয়ের বোধ জাগিয়ে তোলে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এসবের নিচের তলে একটি শীতল চোরা বাস্তবতা রয়েছে। আমরা তিনটি বাৎসল্য-সম্পর্ক দেখি এই গল্পে: খোকন-রোকেয়ার সম্পর্ক, পাশাপাশি রেফারেন্স হিসাবে রোকেয়া-রোকেয়ার মা এবং রোকেয়া-সোলায়মান আলির

সম্পর্ক। এক স্বপ্নময়তার মধ্যে রোকেয়া একটি মেয়েকে দেখে তার কথায় মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলে, তারপর আর কাউকে দেখতে পায় না। "সামনে পুকুর, পুকুরের ওপারে মাঠ, মাঠভরা পাকা ধানে হলদে জ্যোৎস্না অলস গা এলিয়ে ঘুম ঘুম চোখে শূন্যতা দ্যাখে। ডানদিকে কালচে সবুজ গ্রাম, বাঁদিকে সুপারি বাগান। ওর মা তবে কোথায় গেল?" রোকেয়ার মা এভাবেই তার সরল স্নেহ ও সহানুভূতি নিয়েও হারিয়ে যায়, রোকেয়ার কষ্টকে ছুঁতে পারে না। যেমন পারে না সোলায়মান আলিও। ছেলেবেলায় 'ফুটন্ত পায়ার ঝোল থেকে গরম ধোঁয়া বেরিয়ে' রোকেয়ার কণ্ঠার হাড়ের নিচে অনেকটা জায়গা ঝলসে গেলে সোলায়মান আলির শত আদরে শত সান্ত্বনাতেও রোকেয়ার 'কান্না' থামে না, পরিণত বয়সেও সোলায়মান আলির সান্ত্বনায় রোকেয়ার দুশ্চিন্তা কমে না। সুতরাং পিতা-মাতা তাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভরসার হাত নিয়েও সন্তানের সব কষ্ট লাঘব করতে পারে না। খোকন-রোকেয়ার সম্পর্কও একই ভাবসূত্রে আবদ্ধ। এখানেও খোকনকে ঘিরে রুগ্ন দমবন্ধ-করা সময়বাস্তবতার ছবি ("রোগীদের নোংরা শরীরের গন্ধ, পায়ের ঘায়ে বাঁধা হলদেটে ব্যাণ্ডেজের গন্ধ, মেঝে থেকে উঠে আসছে একইসঙ্গে ফিনাইল ও মোমের ভ্যাপসা গন্ধ, নার্সের ধবধবে এ্যাপ্রন থেকে আসা রোদের টাটকা গন্ধ")। রোকেয়াকে এসব কিছুই ছুঁতে পারে না। সময়বাস্তবতাকে অতিক্রম করে খোকনের কাছে পৌঁছানো তাই রোকেয়ার আর হয়ে ওঠে না। খোকনের শরীরে ১০৪°জ্বর পুরু কম্বলের মতো বিরাজ করে, তা ভেদ করে রোকেয়ার আঙুল খোকনের কষ্টের কাছে পৌঁছতে পারে না। পুরু কম্বলের মতো '১০৪°জ্বর' এখানে মা ও সন্তানের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্নতার সূচক। এটি ছাড়া আরও একটি চিহ্নের নিপুণ প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই গল্পের শেষাংশে, যেটি গল্পের প্রধানতম ভাববিন্দু হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'বিছানা'র ওপর অসুস্থ খোকন, একটি 'টুল'-এর ওপর রোকেয়া, মাঝখানে 'সরু ঠাণ্ডা মেঝে'। 'বিছানা' এবং 'টুল' পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই আসন, যা খোকন ও রোকেয়ার দুই বিচ্ছিন্ন জগৎ, বিচ্ছিন্ন অবস্থানের দ্যোতক— আর উভয়ের মাঝখানে 'সরু ঠাণ্ডা মেঝে' সুনিশ্চিতভাবে সংকীর্ণ শীতল বিচ্ছিন্নতাকেই ব্যঞ্জিত করে। অথচ এই চিহ্নগুলি গল্পের স্বাভাবিক ঘটনা, ছবি ও বর্ণনার সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে আলাদা করে সেগুলির নিহিতার্থ শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে একথা উল্লেখ করতেই হয় যে খোকন চরিত্র হিসাবে ওসমান, হানিফ বা প্রদীপের থেকে আলাদা, খানিকটা রঞ্জু ('নিরুদ্দেশ যাত্রা')-র সমগোত্রীয়। আমরা দেখি, খোকনের 'চুল' বড়ো 'অগোছালো', কখনোই ঠিকমতো 'আঁচড়ানো যায় না'। 'প্রতিশোধ' গল্পে ওসমানকে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে দেখেছি আমরা, খোকন যে ওসমানের বিপরীত মেরুর চরিত্র তা এই একটি চিহ্নের প্রয়োগেই স্পষ্ট হয়। 'চুল আঁচড়ানো' যে আসলে একটি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসাকে বোঝায় (যা মনস্তাত্ত্বিকভাবে চরিত্রের আপসমূলক প্রবণতাকে নির্দেশ করে), তা আমরা আগেই বলেছি। একটি ব্যবস্থার স্থিত পরিপাটি ছকের মধ্যে অবস্থান করাই তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পেও রানা 'চিরুনি'-র খোঁজ করে, ধীরেসুস্থে 'চুল আঁচড়ায়'। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সমুদ্র' গল্পটিতেও নায়কের স্ত্রী ঘুম থেকে উঠেই সকলের আগে 'চিরুনি' ও 'চুলের কাঁটা'র খোঁজ করেছিল। পক্ষান্তরে, খোকনের চুল ঠিকমতো 'আঁচড়ানো যায় না', অর্থাৎ সে কখনোই নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ছকে খাপ খায় না; এছাড়া খোকন যে স্থির হয়ে ঘুমোতে পারে না, রাতভর 'চর্কির মতো' ঘোরে, তাও খোকন-চরিত্রের একই প্রবণতাকে ফুটিয়ে তোলে। আসলে খোকন, কখনোই ওসমান, হানিফ বা প্রদীপের মতো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্র হয়ে থাকে না। অস্থির সময়কে ধারণ করে থাকে সে, অথবা অস্থির সময়ের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। সে নিজেই হয়ে ওঠে সময়। তাই "তার একটানা চাপা গোঙানিতে মনে হয় ওর শরীরের ভেতরে দারুণ চাপা গলি, নোনাধরা উঁচুনিচু দেওয়াল, যন্ত্র বিগড়ে যাওয়া ট্রাক ও নরিন্দার নিয়মিত ট্র্যাফিক জ্যাম পার হতে হতে বেরিয়ে আসছে ঠেলাগাড়ি ভর্তি হাওয়ার চাপ"। তাই এই খোকনের কষ্টের কাছে পৌঁছাতে গেলে সময়বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। রোকেয়ার সঙ্গে খোকনের বিচ্ছিন্নতার মূল মোটিফটি এখানেই।

খোঁয়ারি গ্রন্থের নামগল্পটি মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূলত হিন্দু-মাইনরিটি সমস্যার ওপর নির্ভর করে রচিত। গল্পটিতে প্রধান যেটি চোখে পড়ে তা হল একটি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাড়ি। এমন একটি বাড়ি, মাধবীলতাশোভিত হয়ে গল্পে উপস্থিত থাকে কোন্ প্রয়োজনে? তা যে নিছক বাড়ি হিসাবে নয়, সেটি স্পষ্ট। অর্থাৎ

এই 'বাড়ি' নিশ্চিত কোনোকিছুর রূপকার্থসমেতই গল্পে গৃহীত হয়েছে, এ-প্রশ্নে সংশয়ের কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্ন এখানে যে, 'বাড়ি'টি কীসের দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত। পৃথ্বীশ সাহার মতটিকে গ্রহণ করে বলতে পারি, "নোনাধরা ভাঙাচোরা অমৃতলালদের বাড়িটা বিধ্বস্ত দেশ-এর প্রতীক।" (পূর্বোক্ত) তবে 'দেশ' অনেকখানি ব্যপ্ত ও বিমূর্ত বিষয়, তাই বাড়িটিকে 'দেশ'-এর চিহ্নায়ক হিসাবে ব্যাখ্যা করলে অনেক প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের জায়গা তৈরি হয়। তাই একটু নির্দিষ্টকরণের পথে হাঁটলে হয়তো আমরা যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হব। দেশ-চিহ্নিত নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডের স্থানিক বাস্তবতা কেবল নয়, তার সমাজবাস্তবতাও নয়, নির্দিষ্ট এক সময়কালীন ব্যবস্থার রূপ এখানে গুরুত্বপূর্ণ। বাড়িটির যে বর্ণনা এই গল্পে রয়েছে তার খুঁটিনাটি জায়গাগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখান থেকে উঠে আসছে অজস্র চিহ্নায়কের সমষ্টিগত বিন্যাস। বাড়িটিকে এককথায় ক্ষয়িষ্ণু ভগ্নদশার রূপক হিসাবে ধরে নেওয়ার পাশাপাশি তার মধ্যে উল্লিখিত খুঁটিনাটি চিহ্নায়কের সম্মিলিত তাৎপর্যের দিকে আলোকপাত করাও জরুরি।

বাড়িটায় ঢুকতেই যে-জিনিসটা প্রথম চোখে পড়ে তা হল 'গেটের ওপর মাধবীলতার ঝাড়', যা একটি বাহ্যিক আরোপিত শৌখিনতার মোড়ককে চিহ্নিত করে। কিন্তু তার মধ্যে চরে-বেড়ানো 'পোকামাকড়' এক তীব্র ক্ষয়িষ্ণুতার রূপক হয়ে বাহ্যিক শৌখিনতার ভেতর বাসা-বাঁধা ক্ষয় তথা অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করে। বাস্তব এতই ভয়াবহ যে ওইসকল পোকামাকড়ের চলাচলের ধ্বনি ছাড়া বাড়ির আর কোনো স্পন্দন নেই। এখানে 'মাধবীলতা' ও 'পোকামাকড়'-এর দ্বৈত পরস্পরবিরোধী সহাবস্থান যে একটি দ্বন্দ্বমূলক চিহ্নের বয়ান তৈরি করছে, সেইসাথে এই বাড়ির বর্ণনায় আরও যে অজস্র চিহ্নের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে তার অধিকাংশই, পার্সিয়ান ত্রিভুজে স্থাপন করে ('representamen' হিসাবে) 'দেশ'-এর সাপেক্ষে ('object') দেখলে একটি তাৎপর্য ('interpretation') বেরিয়ে আসে ঠিকই [দ্র. ছক ৩, প্রথম অধ্যায়] এবং গল্পের মূল ভাবনা থেকে তা হয়তো খুব একটা দূরবর্তীও নয়; তবু কিছু কিছু চিহ্নায়ক এই বয়ানের সঙ্গে অবিকৃতভাবে খাপ খায় না, দেখি। যেমন, বাড়ির 'থামগুলো', দোতলার 'রেলিঙঘেরা ছাদ' ও ছাদের একপাশে 'চিলেকোঠা'— এক অর্থবহ আধিপত্যমূলক পরিকাঠামোকে চিহ্নায়িত করে; এবং গল্পের মাইনর হিন্দু চরিত্র অমৃতলাল যে ওই

বাড়িটিতে যক্ষসদৃশ বসবাস করে, তার 'থামগুলো'-কে আদর করে জড়িয়ে ধরতে চায়, তা ওই বাড়িটিকে স্রেফ দেশের 'প্রতীক' হিসাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিবাদ তৈরি করে। যখন আরও বলা হয় যে, উক্ত 'থাম', 'রেলিঙঘেরা ছাদ' ও 'চিলেকোঠা' সমেত ওই বাড়িটি 'নড়বড় করতে করতে শ'খানেক বছর দিব্যি কাটিয়ে দিলো'; তখন আর সন্দেহ থাকে না যে, বাড়িটি শতাব্দীপ্রাচীন হিন্দু-আধিপত্যের ক্ষয়িষ্ণু দশাকে দ্যোতিত করছে। সেই আধিপত্য কিন্তু কখনোই 'দেশ'-এর সমার্থক নয়, বড়োজোর দেশের একটি বিশেষ সময়কালীন অবস্থা বলা চলে।

আজ তা রুদ্ধ। তার প্রকাশ্য প্রতিপত্তি আজ (কাহিনিকাল) আর নেই। "কাঠের সঙ্গে পেরেক মেরে বড়ো গেটটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে"। তবু সেই প্রতিপত্তির মায়া ও কাঠামোকে আগলে রাখতে অনিবার্য হয়েছে একটি 'ছোটো দরজা'। 'বড়ো গেট' থেকে 'ছোটো দরজা'য় অবনমন এক ধারাবাহিক পতনমুখীনতার সূচক। অবস্থার উন্নতির কোনো সম্ভাবনা আর নেই। এই বাড়িতে 'সিঁড়ি' (উন্নতির রূপক) যে-দুটি রয়েছে সেগুলি কোনও-না-কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত, বিপজ্জনক। একটি সিঁড়ির সংলগ্ন দেওয়ালে 'চিড়', অন্যটির দুদিকে 'দেওয়াল', ও সেখানে কোনো 'বাল্ব'-এর (আলোকিত জীবনের চিহ্নায়ক, পথপ্রদর্শক শক্তি) ব্যবস্থা করা নেই। ফলত, এককালীন বৈভবের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা কেবল তলানিসম্বল। কোথাও ঘরের দরজা ভেজানো, কপাট দুটো অন্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে তুলনীয়; কোথাও বারান্দায় 'বাল্ব' নেই; কোথাও পাকা জায়গার ফাটলে 'রক্তহীন ঘাসের কদমছাঁট চাপড়া'। যে ছোটো ছোটো ঘরগুলি একসময় রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত, সেগুলির প্রায় সবকটিরই আজ কোনো 'ছাদ' নেই, উপরন্তু সেগুলি অতিথিদের 'পেচ্ছাব' করার স্থানে পরিণত হয়েছে। যে-ঘরে দেবদেবীর ভোগ রান্না হত তা এখন 'পোড়া একটা ঘর'। যে-কুয়োর জলে দেবদেবীর ভোগ রান্না হত তার ওপর 'টিন' – টিনের ওপর বৃষ্টিপাত ঘটায় জাফরের 'প্রস্রাবের বেগবান ধারা'। 'প্রস্রাব' (বা 'পেচ্ছাব') এখানে তাচ্ছিল্য ও অপমানের জোরালো ভাষ্য তৈরি করে। আর 'দেবদেবীর ভোগ রান্না' অবশ্যই সংখ্যালঘু হিন্দুর সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নায়ক। কুয়োর টিনের ওপর জাফরের 'পেচ্ছাব', ক্ষয়প্রাপ্ত সংখ্যালঘু সংস্কৃতির ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উঠতি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দাপুটে অপমানকর

আগ্রাসনকেই ফুটিয়ে তুলছে। জাফর তা অজান্তেই করে, কারণ তা স্বাভাবিক রাজনৈতিক-সামাজিক প্রক্রিয়াতেই ঘটে। কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ নয়, সেইসাথে সংখ্যালঘু শ্রেণির প্রতিনিধি সমরজিতও থাকে ওই প্রক্রিয়ায় সামিল। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার এই-ই ছবি।

চরিত্রগুলির অবস্থান লক্ষ করলেই সেই ছবিটি আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অমৃতলালকে বাদ দিলে, ফারুক, জাফর, ইফতিখার, সমরজিৎ— এই চারটি চরিত্রের অবস্থানের তারতম্য লেখক খুবই নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকের জন্য নির্বাচিত আসনের বৈশিষ্ট্য তাদের পৃথকভাবে শনাক্ত করতে সাহায্য করে। ফারুক বসে 'ইজিচেয়ার'-এ, যা নিশ্চিন্ততার নির্দেশক আমরা জানি; সুতরাং ফারুকের সুস্থির প্রতিষ্ঠিত জীবন, তার রাজনৈতিক চেতনা ও মতাদর্শগত অবস্থানটি এখানে স্পষ্ট (লক্ষণীয় তার বসার ভঙ্গিটিও)। 'কাঠের চেয়ার'-এ জাফর, ফারুকের তুলনায় তার অবস্থান নিম্নস্তরীয়। 'খাটের একপ্রান্তে' ইফতিখার অবশ্যই দুর্বল কুণ্ঠিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এবং সবশেষে সমরজিতের জন্য নির্ধারিত চেয়ার 'দড়িতে ঝোলানো শার্টের ছায়ায় আধখানা ঢাকা'— যা স্পষ্ট নির্দেশ করে সমরজিতের আধখানা অস্তিত্ব অন্ধকারে ঢাকা, অনিশ্চিত। সে ঘরের কোণে রাখা 'পেতলের কলসি' (বংশগত পুরাতন প্রতিপত্তির নির্দেশক, যা বর্তমানে কোণঠাসা) থেকে 'প্লাস্টিকের নতুন জগে' (আধুনিকতম উত্তরাধিকার, যা তুলনামূলকভাবে ঢেরগুণ দুর্বল; সমরজিৎ স্বয়ং?) জল গড়িয়ে নেয়। কিন্তু কায়েমি স্বার্থের রাজনীতি ও বিনোদনমূলক সংস্কৃতির পরিসরে ('টেবিলে') তার জায়গা হয় না। কারণ সেই পরিসর জুড়ে নতুন রাজনীতির বিবিধ খোপ, নানান পাত্রপাত্রী ('বিভিন্ন আকৃতির গ্লাস')। তাই সমরজিতদের নেমে আসতে হয় ভূমিতলে, 'মেঝেতে'।

মদের সাথে চাট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একটা তারতম্য দেখা যায়। ইফতিখার 'জংধরা' (দুর্বল জরাগ্রস্ত) ছুরি দিয়ে 'পনিরের স্লাইস' করে। সমরজিতের হাতেও 'পনিরের স্লাইস'। 'প্রতিশোধ' গল্পে আমরা ওসমানকে দেখেছিলাম 'ছুরি' দিয়ে পাতলা করে 'পনির' কাটতে। পনিরের কোমল পেলবতা আসলে চরিত্রগুলির ওপরেই আরোপিত; ওসমান, ইফতিখার, সমরজিৎ নমনীয় প্রতিবাদহীন থেকে যায়, কঠিন

বাস্তবতার মধ্যে তারা অবগাহন করতে চায় না। জাফরের 'ডানহাত' (দক্ষিণপন্থা?) খুঁজতে থাকে 'চিনেবাদাম' (মুখরোচক সামগ্রী)। এতে তার ক্ষণিক চঞ্চল প্রতিক্রিয়াশীল স্বভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু ফারুকের সাধারণভাবে এসব কোনো-কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না (তার চরিত্রের কাঠিন্য, স্বনির্ভর ভঙ্গি প্রকাশ পায়)। পাশাপাশি আমরা দেখি যে, ইফতিখারের গলায় 'কফ' বা 'শুকনো কাশি' (রুদ্ধ আবেগ/অনুভূতি) জমে থাকে, তার নির্গমন কিছুতেই ঘটে না, চূড়ান্ত প্রকাশ তথা জ্বলে-ওঠা বা গর্জে-ওঠা ('ফাইনাল বমি') তার কিছুতেই হয়ে ওঠে না। আর সমরজিতের ওপর ছড়িয়ে থাকে ত্রিস্তর বাস্তবতার জাল। প্রথমে ঐতিহাসিক বদ্ধতা ('রেলিঙ'), তা অতিক্রম করলে এক আরোপিত কৃত্রিম শৌখিনতার মোড়ক ('টবে গোলাপ গাছ'— তুলনীয়: পুতুলনাচের ইতিকথা: শশীর উঠানের 'গোলাপচারা'-গুলি পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয় কুসুম), এবং তারও পরে থেকে যায় সমকালীন সমাজবাস্তবতার অসুস্থ নেশাগ্রস্ত ছবি ('রোগা গাঁজার চারা')। এসবগুলিকে অতিক্রম করার মতো চারিত্রিক বলিষ্ঠতাও তার নেই। তার জীবন কাটে 'খোঁয়ারি' (মদ্যপানের পরবর্তী ঝিম-ধরা অবসাদ)-এর মধ্যে। 'খোঁয়ারি' স্পষ্টতই একটি রূপক, এবং এই গল্পের প্রতিটি চরিত্রই আসলে এক-একধরনের খোঁয়ারির মধ্যে বন্দী। এমনকি যদি বলা যায় যে, গল্পের ওই বাড়িটিও আসলে খোঁয়ারির একটি জ্যামিতিক রূপ, তাহলেও হয়তো ততখানি ভুল বলা হয় না। তার পুরাতন প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের 'মোটা দেওয়াল' খুলতে থাকে 'চুনসুরকির খোলস', যেভাবে টিনচাপা কুয়োর ওপর থেকে 'পুরানা কাঠকুঠ, দরজা, ভাঙা কপাট, ভাঙা চেয়ার টেবিল' সরে গিয়ে 'টিনগুলি' বেরিয়ে পড়ে। সেই কঙ্কালকাঠামোকে যক্ষের মতো আগলে রাখে অমৃতলাল। আমরা তাকে একমনে 'তাস' বাটতে দেখি। 'তাস খেলা' বা 'তাস বাটা' ক্রিয়া মূলত ব্যক্তির নিজস্ব রাজনীতির চিহ্নায়ক। অমৃতলালের নিজস্ব রাজনীতি তাকে ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থার শেষ প্রহরী হিসাবে দাঁড় করায়। সমরজিৎ নিজের আচ্ছন্নতার আবরণ ('পাতলা মেঘ') ভেদ করে তাকে দেখে 'চাঁদের ভগ্নাংশ' খুঁজে বেড়াতে। কোনো সন্দেহ নেই যে, 'চাঁদ' এখানে মাইনর হিন্দুর হারানো প্রতিপত্তির রূপক। সেই হারানো প্রতিপত্তির জগতকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নেশাগ্রস্ত এক অরাজক সময়ের ক্ষয়ধর্মিতা ('নেশাগ্রস্ত পোকামাকড়')। তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ নেই সমরজিতের। 'ইজিচেয়ারে'

(নিশ্চিন্ততার নির্দেশক, যা ফারুককে শোভা দিলেও সমরজিতকে শোভা দেয় না কখনোই) ধপাস করে বসে পড়া ছাড়া তার কোনো সক্রিয়তা নেই। তৎকালীন বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল সমাজবাস্তবতার ভিতর নিষ্ক্রিয় প্রজন্মের প্রতিনিধি তাই সমরজিতকেই বলা চলে।

এরপর আমরা সরাসরি চলে যাব *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উপন্যাসটিতে। এটি ঊনসত্তরের গণজাগরণের উপর লেখা একটি উপন্যাস। কিন্তু ওই নির্দিষ্ট সময়কে ছাপিয়ে উপন্যাসটি ধারণ করে আছে বৃহত্তর সময়ের প্রতিচ্ছবি। কাহিনি বা চরিত্র এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়; হয়তো কাহিনির একটা আদল পাওয়া যেতে পারে বা কোনো কোনো চরিত্রকে মনে হতে পারে কেন্দ্রীয় চরিত্রের দাবীদার, কিন্তু সেসবকে ছাপিয়ে এই উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নিখুঁত রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব। লেখককে তাই গড়ে তুলতে হয়েছে চিহ্নের বয়ান; ফলত এখানে প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্রই আসলে গভীরতর ব্যঞ্জনার বাহক।

এই উপন্যাসে বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে রয়েছে একটি 'চিলেকোঠা', যার বাসিন্দা ওসমান নাম্নী এক চরিত্র। এই ওসমানের দেখা আমরা পেয়েছি ইতিপূর্বে 'প্রতিশোধ' গল্পটিতে। সেখানে আর যাবতীয় উদ্যোগের চেয়েও 'বাথরুম' সম্পূর্ণ করার জন্য আকুলতা ওসমানের মধ্যে বেশি। কারণ 'বাথরুম' তাকে দিতে পারে আত্মরতিমূলক আড়াল ও ঘেরাটোপ। এই 'বাথরুম'-ই *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে 'চিলেকোঠা'য় পরিণত হয়। 'চিলেকোঠা' স্পষ্টতই বিচ্ছিন্নতা, বানিয়ে-তোলা উচ্চতা (অহং) ও আত্মরতিমূলক (প্রসঙ্গ হস্তমৈথুন— "সিসিলিরূপসীর পুরুষ্টু ঊরুতে শীতল বৃষ্টিপাত ঘটছে। ঐটা সামনে রেখে কম্বলের নিচে নিজের ঊরুসন্ধি থেকে দিব্যি ঘন প্রস্রবন বইয়ে দেওয়া চলে") ঘেরাটোপের চিহ্নায়ক। চিলেকোঠার সঙ্গে আরও সংযুক্ত রয়েছে ছাদ, ছাদের 'চারদিকে রেলিঙ' ও বিশেষভাবে 'সামনের রেলিঙ' একটু 'উঁচু': তাও বিচ্ছিন্নতা ও বানিয়ে-তোলা উচ্চতাকে প্রকাশ করে। সেইসাথে গোটা 'বাড়ি'র পরিকাঠামোও অনুরূপ: বারান্দায় 'পেটসমান উঁচু লোহার রেলিঙ', ঘরের মূল 'দেওয়াল' খুব 'পুরু', 'থামগুলো মোটা', আর 'ঘরগুলো ছোটো' এবং 'হার্ডবোর্ড, কাঠের পার্টিশান ও বাঁশের বেড়া' দিয়ে ঘরের সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে। এইরকম একটি বাড়ির

চিলেকোঠার বাসিন্দা যে ওসমান, তার অবস্থান যে আবদ্ধ ও আত্মরতিমূলক হবে তা স্বাভাবিক। 'প্রতিশোধ' গল্পেও চরিত্রটি অনুরূপ। সেখানে আমরা দেখি উঠোনের পাশে ছলছল 'চৌবাচ্চার ওপর ঢেউ তোলা টিনের ঢাকনি'। চৌবাচ্চায় জল আসে ঠিক, ছলছল আওয়াজ হয়, কিন্তু টিনের ঢাকনিতে আচ্ছাদিত। এই আচ্ছাদিত 'চৌবাচ্চা' ওসমানের চরিত্রকেই চিহ্নায়িত করে। তার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে, ফুটন্ত আবেগ, তীব্র ক্ষোভ সবই রয়েছে; কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের ওপর একটা আচ্ছাদন তার অস্তিত্বকে দুর্বল করে তোলে। তার মধ্যে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার ('মেঘ ও চাঁদের') ও তার নিজের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে না। আবার পোলাওয়ের দোকানের 'ডেকচি'ও একই রকম 'ঢাকনি' সহযোগে ওসমানের চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে। সেই আবরণ হঠাৎ অনেকটা খুলে ফেললে 'গলগল করে ধোঁয়া' বেরিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু তা ঢাকনির অনিবার্যতাকে নাকচ করে না কখনোই। ওসমানও সেরকমই তার ফুটন্ত ক্রোধ ও প্রতিবাদী বাসনা নিয়েও পরিণতি অবধি পৌঁছাতে পারেনা শেষমেশ। তার পরাবাস্তব স্বপ্নও (যা সে 'প্রায়ই' দেখে) তদনুরূপ তাৎপর্য বহন করে। একটি দীর্ঘ উঁচু 'ক্রেন'-এর 'লোহার মই' বেয়ে উঠতে উঠতে তার ভয় হয় এবং চূড়া স্পর্শ করার কাছাকাছি এসেই পা হড়কে সে পড়তে থাকে 'মেঘনার পাতালমুখী কালো জল'-এর অভিমুখে। এই তার জীবনের সারমর্ম। তার সাঁতার-না-জানা জীবন তার এই স্বপ্নেরই বৃহত্তর চিহ্নায়িত রূপ। এমনকি মেঘনার জল অবধি পৌঁছানোর সাহসও নেই। তার আগেই তার স্বপ্ন ভেঙে যায়। ফলে এ-হেন ওসমানের 'স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের পরও অনেকক্ষণ ট্রেন চলে'। এই ছোট্ট মন্তব্যটির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে লেখকের সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষা। 'ট্রেন' আগেই বলেছি গতি তথা জীবনপ্রবাহের চিহ্নায়ক। *খোয়াবনামা*-তেও মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ভিতর দিয়ে 'ট্রেন' চলা এইরকমই শাশ্বত ও অনিবার্য। তবে সেখানে ট্রেনের চলা ও তমিজের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' (অর্থাৎ লড়াই) ওতপ্রোত। কিন্তু এখানে ওসমানের তুচ্ছ ভয়কাতর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ মানুষের সমূহ জীবনপ্রবাহে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি, পারে না। জীবনের সমূহ প্রবাহে ওসমানের মতো মধ্যবিত্তের দুর্বল স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান রয়ে যায় বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত। পরে এই ওসমানই তার 'টিনের ঢাকনি'সমেত আরও পূর্ণাঙ্গভাবে হাজির হয় *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে, এবং একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভিতর

দিয়ে শাপমুক্তিতে পৌঁছায়। সে নিঃসন্দেহে একজন টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত চরিত্র। চলন্ত ভ্যানে ওঠার দৃশ্যটি তার চারিত্রিক দ্বিধা ও দুর্বলতার চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলে। গাড়িতে ওঠার সে নানারকম ইতস্তত করে ও তার বৈপরীত্যে 'টাল সামলাতে সামলাতে' উঠে পড়ে খিজির। 'চলন্ত ভ্যান' এখানে হয়ে ওঠে জীবনের চলমানতার রূপক, এবং তাকে কেন্দ্র করে ভিন্নমুখী ক্রিয়া দুটি চরিত্রকে করে তুলছে পৃথক দুটি চরিত্র।

ওসমান-প্রসঙ্গে 'রঞ্জু' চরিত্রটি (এই রঞ্জু আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র রঞ্জু এক নয়) এই উপন্যাসে ভীষণ তাৎপর্যবাহী। সে এই উপন্যাসে ওসমানের নিচেরতলার ভাড়াটের পুত্র। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে এই 'রঞ্জু' নামটি ওসমানেরও ছেলেবেলার নাম। লেখকের কৃৎকৌশল এখানেই। এই একটি তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই রঞ্জু ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে; আর এই পুরো প্রক্রিয়াটিই একটু একটু করে ঘটতে থাকে ওসমানের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের পথ ধরে। রঞ্জু শুরু থেকেই একটা রহস্য, একটা আকর্ষণ ঘনিয়ে তোলে ওসমানের ভেতর। তার শুকনো বেগনি ঠোঁটের বিষাদ, তার মায়া ও সারল্য, ক্রমশই পুঞ্জীভূত হতে থাকে ওসমানকে ঘিরে। প্রথম প্রথম যা এক সমকামিতার ইঙ্গিত তৈরি করছিল, তা-ই ধীরে ধীরে ভিন্ন এক তাৎপর্য উন্মোচন করতে থাকে। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্র হয়েও সে হয়ে ওঠে ওসমান-চরিত্রেরই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। ওসমান একটি দৃশ্যে রানুকে ভেবে হস্তমৈথুন করার উদ্যোগ নিলে তার আচ্ছন্নতার মধ্যে রানুকে স্থানান্তরিত করে রঞ্জুর প্রবেশ ঘটলে ওসমান মরিয়া হয়ে রঞ্জুকে খুন করার চেষ্টা করে। কিন্তু 'আমার রঞ্জুরে মেরি ফেললে গো!' এই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ সে তার নিজস্ব মায়ের কণ্ঠে শোনে; এবং রঞ্জুর লাশ দেখতে দেখতে ওসমানের নিজের লাশে পরিণত হলে তার পরাবাস্তব চেতনায় সংঘটিত এই নিগূঢ় ঘটনাটিই মূলত রঞ্জুচরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা নির্মাণের সূচনা করে। রঞ্জু হয়ে ওঠে ওসমানের শৈশব তথা অতীত জীবনের চিহ্নায়ক। রঞ্জুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে সে আসলে নিজের অতীত জীবন ও পূর্বপরিচয় মুছে ফেলতে চায়, যাতে নতুন এক বীরত্বের সঙ্গে, প্রেমে ও প্রতিবাদে, নতুন করে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। অথবা রঞ্জুকেও সে সামিল করতে চায় তার অভিযানে, নিজের সমস্ত অতীত নিয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বিপ্লবের কর্মযজ্ঞে, তাই সে রঞ্জুকেও আহ্বান জানায় ছাদ থেকে

লাফিয়ে পড়ার জন্য। যা প্রথমে তার পরাবাস্তব বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয়, তাই তার 'মানসিক বিকৃতি'র ভেতর শারীরিক প্রচেষ্টার পথ গ্রহণ করে। তা স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব না হলে, ওসমান একসময় রঞ্জুকে ছাদের রেলিং ডিঙিয়ে ফেলে হত্যা করতে চায়; "আর তোমার রক্ষা নেই। খিজিরের কাছে আমি প্রমিজবাউণ্ড, আমি ওকে কথা দিয়েছি! আজ সব চুকিয়ে দেবো।"— ওসমানের এই সংলাপ, তার সব 'চুকিয়ে' দেওয়ার সংকল্প, চিহ্নটিকে আরও স্পষ্ট, দ্বিধাহীন করে তোলে। রঞ্জুর চরিত্রটির অনুরূপ ব্যাখ্যা পাই জহর সেন মজুমদারের লেখাতেও (২০০১ : ৩২১-২২)।

এ-হেন ওসমানের শাপমুক্তি ঘটে খিজিরের লৌকিক ও পারলৌকিক প্ররোচনায়। খিজির চরিত্রটি লক্ষণীয়। সে ছোটোবেলায় বিছানায় 'পেচ্ছাব' করত। 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পেও আমরা দেখব যে বুলেট একইরকমভাবে বিছানায় 'পেচ্ছাব' করে। ইতিপূর্বে 'উৎসব' গল্পে আমরা দেখেছি, 'মেয়েমানুষের' বারবার 'পেচ্ছাব পায়খানা করা, দলা দলা থুতু ফেলা' আনোয়ার আলির 'মনঃপূত' নয়। কেন? যদি পরিচ্ছন্নতার প্রশ্নই হয়, তবে তা শুধু 'মেয়েমানুষের' ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কেন? আসলে 'থুতু' বা 'পেচ্ছাব' ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ প্রত্যাখ্যানকেই বোঝায়, এই চিহ্নের ধারণাটি আমাদের যৌথ নির্জ্ঞানে একপ্রকার তৈরি হয়েই রয়েছে। তাই সালেহার পুনঃপুন এই ক্রিয়াকলাপে আনোয়ার আলির অস্বস্তি ঠেকে। কিন্তু কিসের প্রতি এই 'প্রত্যাখ্যান'? এই প্রত্যাখ্যানের ধর্মই বা কী? গল্পটিতে একজায়গায় দেখি, আনোয়ারের অঞ্চলের চালচুলোহীন কুকুরগুলো 'ল্যাম্পোস্ট দেখলেই ছিরছির পেচ্ছাব করে'। 'ল্যাম্পোস্ট' মূলত সম্ভ্রম, উচ্চতা ও আলোকপ্রাপ্তির রূপক; তাতে 'পেচ্ছাব' করার অর্থ, নিম্নবিত্ত সমাজ সেই উচ্চতার মায়া ও করুণাকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি হয়তো নেতিবাচক প্রবণতা বলেই মনে হবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই কৃত্রিম উচ্চতা ও আলোকপ্রাপ্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শ্রেণিবৈষম্যমূলক অহং, তাই তার প্রতিকল্পে যেন-বা নিম্নবিত্তেরও ওই ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ প্রত্যাখ্যান। গল্পের শেষাংশেও একটি 'ঢিল' তাক করা থাকে 'ল্যাম্পোস্টের বাল্বে'। সুতরাং 'বিছানা', যা আরামের তথা স্থিতিশীলতার নির্দেশক, তাতে 'পেচ্ছাব' করার অর্থ জীবনের আরামকে প্রত্যাখ্যান করা। উপন্যাসের শেষদিকে ওসমানও চিলেকোঠার আবদ্ধ পরিসরকে 'পেচ্ছাব' করে ভিজিয়ে দিয়ে (অর্থাৎ

প্রত্যাখ্যান করে) বাইরে বেরিয়ে আসে। পেচ্ছাপের তোড়ে ভিজে-যাওয়া টেবিলের বইপত্র, প্লেট, আলনার কাপড় ও ঘুমন্ত আনোয়ারের পাছা মধ্যবিত্ত জীবনের আরাম ও আবদ্ধতার প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নায়ক।

যা-হোক, বিছানায় পেচ্ছাপের স্বভাবের মধ্য দিয়ে জন্মকাল থেকেই খিজিরের একটা প্রতিবাদী অবস্থান চিহ্নিত হয়ে যায়। এরপর আমরা দেখি যে, ছেলেবেলায় খিজিরের কাজ ছিল 'রিকশা ঠেলে ঠেলে লোহার পুলে উঠিয়ে দেওয়া', এই কাজের মাধ্যমে আসলে সমাজকে ('রিকশা') তার উন্নতির দিকে ('লোহার পুল') এগিয়ে দেওয়ার কাজে সে ব্রতী হয়ে পড়ে বাল্যকাল থেকেই। পরবর্তীকালে সে রিকশার চালক হয়ে এই দায়িত্ব পালন করে চলে। 'ফোঁড়া' গল্পেও রূপকধর্মী 'ফোঁড়া'র পুঁজ বের করার কাজে ব্রতী এক রিকশাওয়ালাই। তবু এরা কেউই 'রিকশা'র 'মালিক' হয়ে উঠতে পারে না কখনোই (কেবল চালিকাশক্তি হয়েই থাকে)। এ-হেন খিজিরের 'স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ার' উপন্যাসের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়ানো থাকে। বস্তুত 'প্লায়ার' ও 'স্ক্রু-ড্রাইভার' খিজিরের মতো শ্রমজীবী শ্রেণির জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার। খিজির সেগুলিকে সংরক্ষিত রাখে রহমতউল্লার পরোক্ষ দান বা বিনিয়োগ ('স্নো-পাউডার-লিপস্টিক-নেলপালিশ-নারকেল তেল')-এর নীচে। পাহারায় থাকে 'সাইকেলের চেন'। মালিক-শ্রেণির করুণা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নীচে নিম্নবিত্ত শ্রেণি হয়তো এভাবেই সংরক্ষিত রাখে তার অস্তিত্ব ও প্রতিবাদের ভাষা; তা উপর থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি তার পাহারায় নিযুক্ত থাকে এক শৃঙ্খলিত ঐক্যচেতনা, সাইকেলের চেন? এছাড়া খিজিরের মৃত্যুদৃশ্যের শেষ অংশটিতে দেখা যায়:

> ভালো করে রোদ ওঠার আগেই মিলিটারির গাড়ি এসে দেখতে দেখতে সব লাশ তুলে নেয়। শেষ লাশটি ছিল খিজিরের। জুম্মন কি করবে? তার হাতের স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ার পড়ে গিয়েছিলো স্মৃতিস্তম্ভের সিঁড়ির নিচে। সেগুলো খুঁজে পেতে পেতে মিলিটারির লাশওয়ালা গাড়ি আজাদ সিনেমা পার হয়ে গেছে। (১৯৮৬ : ২৬১)

দমিত বিপ্লবের অন্তিম চিহ্ন এখানে খিজির ('শেষ লাশ')। তার নিজস্ব সন্তান এখনো জন্মায়নি, তাই সৎপুত্র জুম্মনই তার উত্তরাধিকার। কিন্তু জুম্মন তার পূর্বসূরির লাশ

নিয়ে মিলিটারির গাড়ি চোখের আড়াল হওয়া দেখে ('আজাদ সিনেমা' একটি স্থানসূচক টার্নিং পয়েন্ট, যা জুম্মনের নাগালের রেঞ্জটিকে বোঝায়), কিন্তু কোনো প্রতিরোধ তৈরি করতে পারে না, কারণ চূড়ান্ত মুহূর্তে সে 'প্লায়ার' ও 'স্ক্রু-ড্রাইভার' হারিয়ে ফেলে। জুম্মন এখানে হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নায়ক। উত্তরাধিকার সূত্রে বিপ্লবের হাতিয়ার তার কাছে থাকলেও সে ওই হাতিয়ারের যথাযথ ব্যবহার শিখে উঠতে পারেনি। আমরা দেখি যে, 'রেলিঙ' ও 'স্মৃতিস্তম্ভ'-এর মাঝে 'পাতাবাহারের ঝোপ'-এ সে লুকিয়ে ছিল। 'স্মৃতিস্তম্ভ' এক স্থবির স্মৃতিকাতরতার দ্যোতক, আর 'রেলিঙ' যথারীতি বদ্ধ অবস্থার। তার মাঝামাঝি 'পাতাবাহারের ঝোপ' এক আরোপিত শৌখিনতা, যার ভেতর আগামী প্রজন্ম নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। নিজস্ব ইতিহাস চোখের সামনে হারিয়ে যাচ্ছে দেখেও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধহীন ভাবী-প্রজন্ম এক অনড় স্মৃতিকাতরতায় বুঁদ হয়ে থাকে। 'প্লায়ার' ও 'স্ক্রু-ড্রাইভার'-কে কেন্দ্র করে উপমহাদেশের উত্তরাধিকার সমস্যাকে এভাবেই ঘনীভূত হয়ে উঠতে দেখি। পোয়াতির পেটের দিকে 'প্লায়ার ও স্ক্রু-ড্রাইভার'-এর অবস্থান সেই উত্তরাধিকার সন্ধানের ব্যাকুলতা ফুটিয়ে তোলে। জুম্মন সেগুলিকে সংরক্ষিত রাখে ওসমানের ঘরে, তক্তপোষের তলায়। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখি জুম্মন সেগুলো খুঁজে পায় না (যদিও তা ওসমানের চিন্তার জগতে, সম্ভাবনামূলক ঘটনায়)। যেমন একসময় জুম্মনকে খুঁজতে গিয়ে পায়ের নীচে নির্ভেজাল মাটি পায়নি খিজির ('কখনো রেলের কাঠের স্লিপার, কখনো পাথর'); পরিচ্ছন্ন আলো পায়নি (আকাশে 'চাঁদ' নেই, রেললাইনের ধারে 'ল্যাম্পপোস্ট' নেই), পেয়েছে আলোর তলানি কেবল। সেই খুঁজে-না-পাওয়াটি এক নির্মম ও অনিবার্য সত্য। পাশাপাশি, ইতিহাসের সঙ্গে একটা বিচ্ছেদ লক্ষ করা যায় ওসমান (উপন্যাসের শুরুতেই তার পিতৃবিয়োগের স্বপ্নদৃশ্য) ও খিজিরের (তার পিতৃপরিচয়হীনতা) ক্ষেত্রেও।

দুধেভাতে উৎপাত গল্পগ্রন্থের 'দখল' গল্পটিতেও বাংলাদেশের ইতিহাস উঠে আসে এইরূপ চিহ্নের বয়ানে। মোয়াজ্জেমের পুত্র মোবারক হোসেন মুক্তিযুদ্ধের শহিদ। তার পুত্র ইকবাল। তিনটি প্রজন্মের উপস্থিতি এখানে তিনটি সময়প্রবণতাকে চিহ্নিত করে, সব মিলে তা বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসের সূচক হয়ে ওঠে। প্রথম ইতিহাস সামন্ততান্ত্রিক শাসনের যা তার শক্তি হারিয়েও টিকে ছিল প্রায় সত্তর

দশকের দোরগোড়া অবধি বা তারও কিছু বেশি; তার পরের ইতিহাস সংগ্রামের, তেভাগা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের উজান বেয়ে তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে; এবং তার পরবর্তী ইতিহাস নিস্ক্রিয়তার, আপোষ তথা দুর্বলতার, যার প্রতিনিধি ইকবাল। সে তার পিতার কবরের সংলগ্ন খোপ দখল করে শুয়ে শুয়ে 'পা নাচায়'। প্রকৃতপক্ষে তা পূর্বতন ইতিহাসের গৌরবের ভিতর নিষ্ক্রিয় বুঁদ সত্তর-আশির দশকের বাংলাদেশের আত্মঘাতী নিশ্চিন্ততাকেই নির্দেশ করে। তারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ঘৃণা করে, নিজেদেরকে সংগ্রামের ইতিহাসের উত্তরাধিকার ভেবে গর্ববোধ করে, কিন্তু সেই ইতিহাসের তেজ ও দীপ্তিকে ছুঁতে পারে না কখনোই। এছাড়া 'কান্না' (*জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*) গল্পটিতে দেখি, একটি দৃশ্যে আগরবাতির ধোঁয়া ও গন্ধে ও আয়াত পাঠের সুরে কেমন কবরের ভিতরে-বাইরে ফারাক কমতে থাকে। আসলে ভূখণ্ডই এখানে কবরের রূপ নেয়, যা এক নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে প্রকাশ করে। মৃত সময়ের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত জাতির প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে আফাজ আলি, যে নিজের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দাফন করে।

যা-হোক, *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসটিতে 'গ্যারেজ' ও 'বটগাছ' যথাক্রমে নাগরিকজীবনে ও গ্রামজীবনে শোষকশ্রেণির আগ্রাসনের চিহ্ন বহন করে। রহমতউল্লার 'গ্যারেজ' ক্রমশ চারপাশে বিস্তৃত হতে থাকে, 'রাস্তা' ও 'ল্যাম্পোস্ট' অবধি অগ্রসর হয়। মহাজনের 'গ্যারেজ' এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে 'বটগাছ' উপস্থাপিত হয়েছে একইসাথে রূপক ও নির্দেশক হিসাবে। 'চারদিকে ছড়ানো শিকড়বাকড়ের মধ্যে তার বিস্তৃত ও বর্ধমান রূপ দেখে সবাই মোহিত ও ভীত হয়ে পড়ে। পুরো সাড়ে তিন বিঘা জমি গ্রাস করার পরও তার থামবার লক্ষণ নাই, সে কেবল বেড়েই চলেছে।' জমি গ্রাস করার মধ্য দিয়ে তা আসলে কৃষি তথা কৃষকজীবনকেই গ্রাস করতে চায়; 'বটগাছ'-টি এখানেই খয়বার গাজীদের শতাব্দীপ্রাচীন ক্ষমতার করাল ও ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে। 'বটপ্রাসাদ' হিসাবে তার বর্ণনা এবং আনোয়ারের পরাবাস্তব চেতনায় তার শেকড়ের সঙ্গে 'অজগর সাপ'-এর তুলনা চিহ্নটিকে আরও বিশদে ব্যাখ্যা করে। উক্ত বটপ্রাসাদের

বিস্তারকে যারা প্রতিহত করতে চেয়েছে তাদের পরিণতি মোটেই সুখকর হয়নি। নাদু পরামানিকের কথায় আমরা জানতে পারি, 'এই গাছোত যাঁই একোটা কোপ মারছে মুখোত তাঁই আর ভাতের একটা নলাও তুলবার পারে নাই গো! অক্তবমি করতে করতে সিটক্যা মরছে!' তার পরেও এই বটগাছের শেকড়ে তথা মূলে 'কোপ' মারে চেংটু, 'কালো ও ঢ্যাঙা ১টি তরুণ চাষী'। প্রতিটি মুহূর্তে তার (চেংটুর) আপসহীন মনোভাব প্রকাশিত হয়; সে কারও বশ মানে না, তার প্রতিটি সংলাপ তীব্র, শাণিত; তাতে ভয় বা জড়তার লেশমাত্র নেই। আনোয়ারদের বাড়ির বৈঠকখানার 'দালানের ভাঙা স্তূপ', যা কিনা ক্ষয়িত এক প্রাচীন প্রজন্মবাহিত ক্ষমতাতন্ত্রের চিহ্নায়করূপে অবস্থান করে (আমরা 'দখল' গল্পেও দেখি), চেংটু 'সেই স্তূপের উঁচু চূড়ায়' দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসে। ষাট-সত্তর দশকের গ্রামবাংলায় প্রাচীন ক্ষয়িত শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণির দৃপ্ত সাহসী প্রতিরোধের মূর্ত রূপ যেন এই চেংটু। তাই আমরা দেখি, 'সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তার মুখ অস্পষ্ট'। অর্থাৎ তার ব্যক্তিপরিচয় মুখ্য নয়, সে প্রতিনিধিত্ব করে একটি সমষ্টির। 'পায়ের নিচে জল' (*দুধেভাতে উৎপাত*) গল্পেও অনুরূপ 'বটগাছ', আর অনুরূপভাবে তার 'শেকড়ে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে অন্তত ১০ জন', যা যূথবদ্ধ মানুষের পাল্টা ক্ষমতা দখলের ইঙ্গিত।

অথচ আনোয়ার, যে-কিনা বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে গণআন্দোলনের, বা যথাযথভাবে বললে, বিপ্লবের নেতৃত্ব কামনা করে, সে কিন্তু কখনোই শেষমেশ শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াতে পারে না। আমরা দেখি, তার ঘরের 'টেবিল' (যাপিত জীবন) 'এলোমেলো' হলেও, তার 'বিছানা' কিন্তু 'পরিপাটি', যা তার আরামের (comfort) অভ্যাসকে সূচিত করে তার মতাদর্শগত অবস্থানকে প্রকাশ করে। তাই খয়বার গাজীর গণবিচারের সময় আনোয়ারকে 'ইজিচেয়ার'-এ বসে থাকতে দেখা যায়। 'ইজিচেয়ার'কে নিশ্চিন্ততা ও আপোষধর্মিতার চিহ্নায়ক হিসাবে ইলিয়াসের একাধিক গল্পে দেখা গেছে। এখানেও তা-ই। আনোয়ারের নিশ্চিন্ত মধ্যবিত্ত জীবন ('মাঝারি সাইজের ফর্সা তনুখানি') তাই 'ঘুম' তথা নিষ্ক্রিয়তার ভেতর ডুবে যায়, 'মশারি'-র আচ্ছাদনে। 'মশারি'-র উল্লেখও ইলিয়াসের লেখায় একাধিকবার এসেছে। এখানেও 'মশারি' আনোয়ারের ব্যক্তিগত জীবনপরিসরের আবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতার ('বাইরের

যাবতীয় শব্দ, গন্ধ ও রঙ' তাকে 'ছুঁতেও পারে না') দ্যোতক। আনোয়ার শেষমেশ অনিবার্যভাবেই 'চিলেকোঠা'-য় বন্দি হয়ে থাকে, ওসমানের বদলে। ফলত 'চেংটু'দের লড়াই তার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যেতে বাধ্য। তাই দেখি— "বাস চলতে থাকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে। কাঁচারাস্তায় স্পিড দেওয়া সম্ভব নয়। তবু দেখতে দেখতে নাদু পরামাণিক ও জালালউদ্দিন ও আফসার গাজী ও চন্দনদহ বাজার আড়ালে পড়ে যায়।" শহুরে মধ্যবিত্তের চোখ থেকে গ্রামজীবন, গ্রামজীবনের রাজনীতি ও আলিবক্স-চেংটুদের সংগ্রাম তথা বৈপ্লবিক প্রয়াসের জগৎ এভাবেই ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।

খয়বার গাজীর বাড়িতে ও বাড়ির চারপাশের সমাজ-বাস্তবতাই ঢাকা নগরেরও বাস্তবতা। খিজির একটি মেয়েকে অপহৃত হতে দেখে, যা পরে তার পরাবাস্তব চেতনায় নাকচকরণ প্রক্রিয়াতে ফুটে ওঠে খানিকটা এইভাবে: 'মস্ত বড়ো ঠাণ্ডা হাত' দিয়ে 'কে যেন' (~~রিভলভারধারীর ১টি ফর্সা হাত~~) খিজিরকে ঠেলে (~~লাল শাল জড়ানো মেয়েটির পিঠে আলতো চাপ দিয়ে~~) নিয়ে যাচ্ছে 'ঝাপসা ১টি মাঠের দিকে' (~~এগিয়ে দিচ্ছে সামনের দিকে~~)। 'মস্ত বড়ো ঠাণ্ডা হাত' এখানে হয়ে ওঠে শীতল ভয়াবহ সময়বাস্তবতার সূচক, যা মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ে যাচ্ছে এক অনিশ্চয়তার ('ঝাপসা ১টি মাঠ') দিকে। তার বিপরীতে ইলিয়াস মানুষকে শোনাতে চেয়েছেন 'বিপুল সংখ্যক ঘোড়ার ডাক', যা অনেক মানুষের সমবেত কথার ধ্বনি থেকে পরাবাস্তব চেতনায় জাত। যাকে বিপ্লবের অশ্বক্ষুরধ্বনি বলতে পারি আমরা।

ইলিয়াসের দ্বিতীয় তথা শেষ উপন্যাস *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) সম্পূর্ণ পৃথক ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ পৃথক চিহ্নায়কপ্রকরণ নিয়ে হাজির হয়। আশি-নব্বইয়ের দশকে লেখা হলেও বইটি ধারণ করে আছে দেশভাগ-মন্বন্তর-তেভাগা আন্দোলনকালীন প্রেক্ষাপট যার শেকড় প্রবিষ্ট দীর্ঘ লোকায়ত জীবন ও সমাজ-ইতিহাসের ভেতর। উপন্যাসটিতে রয়েছে কথকতার ভঙ্গি। তাই এখানে ব্যবহৃত অধিকাংশ চিহ্নায়কই সমাজেতিহাস ও লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসর থেকে উঠে আসা, ফলে সেগুলির মূল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গভীরে প্রোথিত। এই উপন্যাসের ভাবপরিমণ্ডলের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে মুনসি ও তার আবাসস্থল পাকুড়গাছ। মুনসি বরকতুল্লাহ শাহ ফকির-বিদ্রোহের একজন সেনাপতি যিনি ইংরেজ সেপাইদের হাতে নিহত হয়েছেন; কিন্তু নিহত হয়েও আগুনের জীব হয়ে

তিনি পাকুড়গাছ বসবাস করেন বলে কাৎলাহার বিলসংলগ্ন গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার মানুষদের, বিশেষত মাঝিপাড়ার লোকজনদের বিশ্বাস। তারা মুনসির শাসনাধীনেই বাস করে। কাৎলাহার বিল ও বিলসংলগ্ন এলাকা জুড়ে মুনসির 'জাল' এক অদৃশ্য সুরক্ষাকবচের কিংবা সাংস্কৃতিক ঐক্যচেতনার রূপক। যা আসলে মনস্তাত্ত্বিক শক্তি হিসাবে মাঝিদের যৌথ নির্জ্ঞান (collective unconsciousness) থেকে জাত। এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ত্রিভুজ রূপক (কুয়াশা < জাল > সাংস্কৃতিক ঐক্যচেতনা)। মুনসি তাদের চেতনায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসনের প্রতিরোধক এক শক্তির প্রতিনিধি। অথচ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিলের দখল মুনসির কাছ থেকে চলে যায় শরাফত মণ্ডলের হাতে। বিলের ওপর নির্ভরশীল নিম্নবিত্ত শ্রেণির সাংস্কৃতিক আশ্রয়ের চিহ্নটিকে গ্রাস করে শরাফত মণ্ডল। মাঝিপাড়ার মানুষ, তাদের প্রতিনিধিস্বরূপ তমিজের বাপ, মুনসিকেই বিলের শাসক বলে বিশ্বাস করে; তাই বাস্তবের শরাফত মণ্ডল ও তার খড়মের আঘাত, তমিজের বাপের পরাবাস্তব চেতনায় মুনসি ও মুনসির পাণ্টির আঘাত হিসাবে ধরা দেয়। এখানে ফুটে ওঠে তীব্র এক শ্রেণিগত অসহায়তার ছবি, উঠে আসে নিষ্ঠুর এক সমাজতাত্ত্বিক সত্য। বস্তুত 'পাকুড়গাছ', যা ছিল নিম্নবর্গীয় মানুষের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের চিহ্নায়ক, তাকে মুছে ফেলে শরাফত মণ্ডলের 'ইঁটভাটা' তথা পুঁজিবাদী আগ্রাসন। শরাফত মণ্ডলকে তাই অবধারিতভাবেই দেখা যায় 'উঁচু বারান্দায়' (উচ্চতা বজায় রেখে) শৌখিন 'ইজিচেয়ার'-এ বসে থাকতে (প্রসঙ্গত *দুধেভাতে উৎপাত* গ্রন্থের 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পের 'সাহেব'-এর কথা মনে পড়বে)। আর তমিজের বাপের মতো শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতিনিধিরা 'চোরাবালি'-তে (সময়-বাস্তবতার অদৃশ্য গ্রাস) তলিয়ে যায়। এছাড়া চেরাগ আলি ফকিরের 'খোয়াবনামা' বইটি, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের নানাস্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা শোষিত সাধারণ মানুষের আশ্রয় ও অবলম্বন, তাও শরাফত মণ্ডলের বড়ো ছেলে আব্দুল আজিজ হস্তগত করে নেয়। তমিজের বাপ যখন বৈকুণ্ঠকে বলে, এই বই হামরা রাখবার পারমু না রে বৈকুণ্ঠ!' তখন ইতিহাস চুঁইয়ে-পড়া এক অসহায়তার ধ্বনি মনকে ব্যথিত ভারাক্রান্ত করে তোলে।

পাশাপাশি আরও একটি জগৎ সম্পৃক্ত হয়ে আছে মুনসির জগতের সঙ্গে। ভবানী পাঠক ছিলেন সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের নেতা। সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা যৌথভাবে লড়াই করেছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। 'বাঙালী নদী', 'মানাসের দ' ভবানী পাঠকের সেই সংগ্রামের ইতিহাসের সাক্ষ্যচিহ্ন; তাকে গ্রাস করে 'যমুনা নদী', যা একসময় সরু খাল ছিল, মানুষের ভিটেমাটি খেয়ে গতরে বড়ো হয়েছে, সেই 'যমুনা' সামন্ত্রতান্ত্রিক আগ্রাসনের রূপকল্প হয়ে ওঠে এই উপন্যাসে ('পায়ের নিচে জল' গল্পে যমুনার তীব্র জলস্রোত আবার বিপুল জনজাগরণের রূপক হয়ে ওঠে)। নিম্নকোটির সাংস্কৃতিক জগতকে গ্রাস করে উচ্চকোটির সংস্কৃতি। ভবানী সন্ন্যাসীর দ' নায়েববাবুর ব্যাখ্যায় হয়ে যায় মা ভবানীর দ'। সন্ন্যাসীর থান, পোড়াদহ মেলা উঠে গিয়ে দুর্গাপূজা প্রচলনের পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। সেই সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের চিহ্নায়ক হিসাবে উপস্থিত থাকে *আনন্দমঠ* উপন্যাসটিও, যা এখানে এক বিকৃত ইতিহাসের প্রচারক।

বৈকুণ্ঠ বটগাছের মধ্যে সন্ন্যাসীর মূর্তি দেখে, সন্ন্যাসীর ত্রিশূলের প্রতিটি ফলায় দেখে মাছের নকশা; বটগাছ থেকে সন্ন্যাসীর গানের, প্রতিধ্বনি ফিরে আসে পাকুড়তলা থেকে— দুই ইতিহাস যৌথভাবে মিশে যায় পরস্পর। সমকালীন ধর্মীয় বিভেদ ও চক্রান্তের উল্টোপিঠে এই ছবি ইতিহাসের বিকল্প পাঠ তৈরি করে। মৃত্যুর রাতে দেখা স্বপ্নের ভিতর বৈকুণ্ঠ দেখে, তার 'মাথার ওপর সন্ন্যাসীর বটবৃক্ষ, তার সঙ্গে জড়ানো পাকুড়গাছ'। চিহ্নটি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'সন্ন্যাসীর মালিকানায় সাধারণ্যের ব্যবহারের নিমিত্ত' জমি 'দেখতে দেখতে ছোটো হয়ে আসে', তাকে গ্রাস করে 'যমুনার ঢেউ'। কিন্তু বৈকুণ্ঠকে ঘিরে থাকে 'মশারি', যা এখানে যৌথ অসহায়তার রূপক। যাকে ছিন্ন করতে গেলে দরকার মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। তা হয় না; 'যমুনা'র জল বৈকুণ্ঠের হাঁটু অবধি ডুবিয়ে দেয়।

তবু এই অসহায়তাই শেষ কথা নয়, পাকুড়গাছশূন্য পাকুড়তলা থাকে, মুনসির পাওনা শ্লোক নিখোঁজ চেরাগ আলি, মৃত কুলসুম ও তমিজের বাপের উত্তরাধিকার বেয়ে বিজবিজ করে ফুলজান-তমিজের মেয়ে সখিনার মাথায়। ভাতের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকে সে। শেষ দৃশ্যে একটি অসাধারণ চিত্রকল্পে গড়ে ওঠে প্রতিরোধের বয়ান। তমিজ, যে শ্রেণিসংগ্রামের হারানো ইতিহাসের প্রতিনিধি, 'জখম চাঁদ'-এর রূপকে লেখক তাকে

স্থাপন করে। এই 'জখম চাঁদ'-ই হয়ে ওঠে সেদ্ধ চালের আধার, জোনাকির হেঁশেলে দগ্ধ 'লালচে' রন্ধনপাত্র। হা-ভাতের চোখে তা নির্মাণ করে ভাতের স্বপ্ন। 'শিমুল গাছের বকের ঝাঁক' শরাফত মণ্ডলদের শোষণব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক, যা দেখে ফুলজান ভয় পায়, হুরমতুল্লার 'কাশিধসা' (দুর্বল, প্রতিরোধহীন) গলার শঙ্কিত ব্যাকুল ডাক আসে। কিন্তু সখিনাকে নড়ানো যায় না। 'মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে লম্বা তালগাছের নিচে পুরনো উইঢিবির' সামনে শক্ত খটখটে বিপজ্জনক ভূমিতে সে দাঁড়িয়ে থাকে দৃঢ় দৃপ্ত পা রেখে, ঘাড়ের রগ টানটান করে— ভাতের, হেঁশেলের স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে। কারণ তার মধ্যে তমিজের পাশাপাশি তমিজের বাপ, কুলসুম, চেরাগ আলি এমনকি মুনসিরও উত্তরাধিকার। 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পে রমিজও, চূড়ান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যেও, 'নুনমরিচলঙ্কাপেঁয়াজলেবুপাতা' দিয়ে চটকানো পান্তাভাত খাওয়ার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মনে পড়বে, 'দুধভাত উৎপাত' গল্পেও দুধভাতের স্বপ্ন অনুরূপ প্রতিরোধের চিহ্ন। অসহায় নিম্নজীবী শ্রেণির শেষ প্রতিরোধ হয়ে থাকে এভাবেই ক্ষুধা তথা হেঁশেল তথা ভাতের স্বপ্ন, যা এক নতুন সম্ভাবনার দিকে সদা-উন্মুখ, যা তৈরি করে ইতিহাসের 'অপর' এক ভাষ্য।

স্বপ্নের ভিতর দিয়ে বিকল্প এক প্রতিরোধের বয়ান তৈরি হয় *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* গ্রন্থের নামগল্পটিতেও। আমরা দেখি যে, লালমিয়ার স্বপ্নে নামাজ-পড়া মুসুল্লির দুই হাতের মধ্যে 'তামাম মসজিদ হান্দাইয়া পড়ছে' এবং আরও জায়গা অবশিষ্ট আছে যেখানে তাদের 'মহল্লা ভি ফিট কইরা দেওয়া যাইবো'। লালমিয়ার স্বপ্নদর্শন নিঃসন্দেহে নাজির আলির (সেই নজির আলি, যে মসজিদ দখল করেছে, মহল্লার ওপরেও অধিকার কায়েম করতে চায়, মিলিটারিদের সঙ্গেও যার যোগ আছে এবং ইমামুদ্দিনের মৃত্যুর পিছনেও রয়েছে যার পরোক্ষ ভূমিকা) আধিপত্যকে ইঙ্গিত করে। যে-আধিপত্য বুলেটের স্বপ্নে দীর্ঘ প্রবাহিত 'সাদা দাড়ি'র রূপকে উপস্থিত হয়। 'ঘিয়ে রঙের আলখাল্লা' সেই পবিত্রতা ও ভালমানুষির আচ্ছাদনকে সূচিত করে যা দিয়ে নাজির আলিরা তাদের কদর্য হিংস্র রূপ ঢেকে রাখে। তারা যে রাজনীতি করে তা ধর্মভিত্তিক শাসনপন্থী রাজনীতি। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাদের 'ওল্টানো পা' তাদের পশ্চাদ্‌মুখী রক্ষণশীল রাজনীতিরই রূপকল্প। বুলেটের কাছে তা 'ব্যারাম' (অসুস্থতা) বলেই মনে হয়।

বুলেট স্বপ্নে সেই ওল্টানো-পা-ওয়ালা মানুষের দিকে পেচ্ছাপের ধারা বইয়ে দেয়, যা তার ডানদিক ছিল। তাকে শুতে হয় তাই 'বাঁ-পাশ ফিরে'। তাতে স্পষ্টতই বুলেটের বামপন্থী প্রবণতা ও অভিমুখ প্রকাশ পায়। 'ফোঁড়া' গল্পেও 'রিকশাওয়ালা'-র 'বাঁ পাটাই বেশি তৎপর'। তাই বিষাক্ত 'ফোঁড়া' যা পচনশীল সমাজব্যবস্থার রূপক হয়ে দগদগ করে, তার 'পুঁজ' বের করার জন্য সেই 'রিকশাওয়ালা'-র তর সয় না; অথচ মামুন (যেমন আনোয়ার), যে মধ্যবিত্ত বাম-রাজনৈতিক কর্মী, সে কেবলই হিসাব করে পরিস্থিতির, 'লং জাম্প' দিয়ে 'কাদা' (বিপজ্জনক পরিস্থিতি) এড়িয়ে যেতে চায়, 'ফোঁড়া'-র বিষয়ে তার তেমন উদ্‌বেগ পরিলক্ষিত হয় না। 'অপঘাত' (*দোজখের ওম*) গল্পে বুলুর বাবার 'বাম পা'-ই আলপথ (জীবনের নিরাপদ সংকীর্ণ পথরেখা) থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপজ্জনক 'কাদা'-র মধ্যে পড়ে যায়। 'পায়ের নিচে জল' গল্পেও সাকিদারের বড়োছেলের বউএর 'ঘোমটা'খসা মুখ দেখে আতিকের মনে হয়, "ডান চোখটা তার কানা, সেই চোখের অব্যবহৃত আলো ও শক্তি কি তার বাঁ চোখে উপচে পড়ছে?" আসলে 'বাঁ চোখ'-এর আলো ও শক্তি তার বা তাদের জোরালো উজ্জ্বল বামপন্থী তথা প্রতিবাদী চেতনাকে চিহ্নায়িত করে। এভাবেই ইলিয়াস তাঁর রাজনৈতিক অভিপ্রায় ও মতাদর্শের কথা প্রকাশ করেন।

পরিসরের অভাবে আরও অনেক কিছুই বাদ রয়ে গেল যদিও, তবু যেটুকু দেখানো সম্ভব হল, তা থেকে এটুকু প্রতিভাত হয়, ইলিয়াসের গল্পে উপন্যাসে এইরূপ ছোটো ছোটো প্রচ্ছন্ন রূপক ও জটিল নির্দেশকের উপস্থিতিই এক বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্য নির্মাণ করে। ছোটোবড়ো নানা উপাদান, দৈনন্দিন অভ্যাস, সমস্ত কিছুই এক অখণ্ড ব্যঞ্জনার দিকে ধাবমান। আমরা দেখেছি, ইজিচেয়ার মশারি বালিশ বাথরুম চিলেকোঠা কিংবা কারও চুল আঁচড়ানো থেকে বিছানায় পেচ্ছাপ করা সব কিছুই সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা পালনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কেবল নিরাপদ উচ্চশ্রেণি ও আপসপ্রিয় মধ্যবিত্তদেরই দেখা যায় ইজিচেয়ারে বসে থাকতে, আবার তার বিপরীতে নিম্নজীবী শ্রেণির প্রতিবাদী চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় ছেলেবেলা থেকেই বিছানায় পেচ্ছাপ করার স্বভাব। সুতরাং বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে কার কী ভূমিকা বা কার কী অবস্থান হতে পারে তা ওইটুকুতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এই

বিষয়টিই ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাসে প্রায় এক তত্ত্বের আকার নিয়েছে। আসলে শুধু ইলিয়াস নয়, আধুনিক সাহিত্য খুঁড়লে দেখা যাবে সমগ্র সাহিত্যই আসলে এক চিহ্নায়কের বিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলেছে। ক্রমপরিবর্তমান সময়ের জটিল বহুমুখী বাস্তবতাকে ধারণ করতে গেলে দৈনন্দিন ছোটো ছোটো প্রতিটি সামগ্রীকে ব্যঞ্জনাগূঢ় নির্দেশক হিসাবে উপস্থাপন করা ছাড়া অথবা তাদের অন্তর্লীন রূপকধর্মিতাকে শনাক্ত করা ও বিনির্মাণ করা ছাড়া লেখকের আর কোনো পথ নেই।

উল্লেখপঞ্জি:

১. রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' গল্পেও বাবলা গাছের উল্লেখ একাধিকবার লক্ষ করা যায়। এই গল্পটিতে না-হয় বাবলা গাছের একরকম তাৎপর্য আমরা বুঝলাম, কিন্তু 'ঘাটের কথা'র প্রেম-রসায়নের প্রেক্ষাপটে বাবলা গাছের এই রুক্ষ রূঢ় কণ্টকতা কীসের অন্বয় বা অনন্বয়কে তুলে ধরছে?

২. আমাদের পূর্বালোচিত ব্যাখ্যাধর্মিতার এটি একটি অন্যতম দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। অর্থাৎ পাঠক কোনো বিশেষ রূপকের নিহিতার্থ অনুধাবন করতে পারবে কিনা, সেইসংক্রান্ত যে এক সংশয় আমরা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও শনাক্ত করেছিলাম, এখানেও সেইরূপ সংশয় লেখককে ('author') প্রভাবিত করেছে দেখতে পাই।

৩. দ্যোতিতকে ছেড়ে দ্যোতককে নিয়ে টানাটানি করার একপ্রকার প্রবণতা আমরা এমনকি আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনেও লক্ষ করি। আমাদের মতে সমাজের অধিকাংশ কলহ বিবাদ, সবকিছুই কোনো-না-কোনোভাবে চিহ্নায়কের ওপরেই নির্ভরশীল, খুব কম ক্ষেত্রেই তা আসলে চিহ্নায়িত অবধি পৌঁছাতে পারে। তবু চিহ্নায়ককে মাধ্যম করে এগিয়ে চলা ছাড়া আর তেমন উপায়ও নেই, চিহ্নায়িতের দিকে সেই যাত্রা আসলে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক যাত্রা।

৪. 'নক্র' কথাটির অর্থ কুমির। প্রসঙ্গত মনে পড়বে ডমরুধরের কাহিনির কুমিরের উপাখ্যান। কিংবা জগদীশ গুপ্তের 'দিবসের শেষে' গল্পে বালককে কুমিরে নেওয়ার

অনিবার্য নিয়তির কথা। কুমিরের এই তিনরকম প্রসঙ্গ ভিতরে-ভিতরে কোথাও যেন অন্বিত হয়ে রয়েছে।

৫. চুল আঁচড়ানো চিহ্নটি আসলে একটু বিমিশ্র গোছের। আখ্যানে কারো চুল আঁচড়ানোর সঙ্গে তার আপসকামিতার গভীর মনস্তাত্ত্বিক যে সংযোগ, চিহ্নের এই অংশটি প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক; আর চুল আঁচড়ানোর সঙ্গে আপসকামিতা যে-যুক্তিতে অন্বিত হচ্ছে, অর্থাৎ সম্মিলিত চুল যে যৌথ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সদৃশ, চিহ্নের সেই অংশটি রূপক। অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে চরিত্রের অন্বয়টুকু এখানে metonymy, আর ক্রিয়ার সঙ্গে ভাবের অন্বয়টুকু এখানে metaphor হিসেবে ধার্য।

৬. এই বিশেষ যুক্তিটির কারণে আমি কালনা কলেজের অধ্যাপিকা অনন্যা আচার্য মহাশয়ার কাছে ঋণগ্রস্ত।

৭. এ-ছাড়া চরিত্রদের নামের অর্থের নিরিখেও কেউ কেউ এই সম্পর্কের ত্রিভুজকে দেখতে চান। সেক্ষেত্রে ‘প্রণব’ অর্থাৎ উচ্চারিত ধ্বনি অর্থাৎ মানুষের মৌখিক বানিয়ে-তোলা ভাষা, মেকি আভিজাত্য নিয়ে মায়ার ওপর অধিকার কায়েম রাখতে চাইলেও মায়াকে প্রকৃতই বাঁধতে পারেনি, পক্ষান্তরে ভুবন অর্থাৎ পৃথিবী যেন নিজের দৈন্য ও দারিদ্র্য নিয়েও সেই মায়াকে অবলীলায় জয় করে নিয়েছে।

৩.৪ বয়ানের কুটিল বিক্ষোভ ও ব্যঞ্জনার ক্রূর বিমিশ্রতা: গল্পহীনের গল্পকুহক

বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় আমরা দেখেছি ষাট-সত্তরের দশক নাগাদ বা তারও আগে থেকে প্রচলিত বাচনভঙ্গির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে একপ্রকার বিদ্রোহের আভাস ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল, যা পরবর্তী দশকগুলিতে আরও পরিপক্কতা লাভ করেছে বলা যায়। এই ঘনায়মান অসন্তোষ ও রূপান্তরকামিতার প্রেক্ষাপটে লক্ষ করা যায়— কেউ নতুন রীতিতে গল্প লিখতে চেয়েছেন, কেউ 'অ্যান্টি'গল্পের অবতারণা করেছেন, কেউ গল্পসন্ধানীদের গুলি করে মারার কথা বলেছেন, কেউ চেয়েছেন 'ব্রয়লার' শিল্পসাহিত্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠতার সঙ্গে লিখে যেতে, কেউ-বা আখ্যানকাঠামোকে একটি 'প্রপঞ্চময়' হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন; সুতরাং এপার-বাংলার কথাসাহিত্য-চর্চার মধ্যে ওইসময় থেকে প্রায় অনেকেই সচেতনভাবে প্রথাবিরোধী বা প্রতিষ্ঠানবিমুখ কিছু-না-কিছু প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখছেন। এবং তা করতে গিয়ে শুধু যে Ideology বা ভাবাদর্শের দিক থেকে প্রচলিত সমাজচিন্তার প্রতিকূল কোনো পৃথক অবস্থান বজায় রাখতে হচ্ছে তা-ই নয়, ভাষা ও ভঙ্গিমার দিক থেকেও প্রতিস্পর্ধী কিছু-না-কিছু ভাবতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেই প্রকল্পনাকে সত্যি করতেই হয়তো, তাঁরা গল্পসুতোর বেড়াজাল ছিঁড়ে কিংবা কাহিনির মরীচিকায় মজে না গিয়ে, রূপকের ভাষাকে প্রায়শই বলিষ্ঠ হাতে ব্যবহার করেছেন, কিংবা ব্যঞ্জনার বিমূর্ত আদল ফুটিয়ে তুলেছেন। টেকনিক হিসেবে জাদুবাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা অনেক বেশি প্রাঞ্জল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে এবং যাচ্ছে। এছাড়াও আঙ্গিকগত অন্যান্য আরও বহুবিচিত্র ভাঙচুরের প্রবণতাও লক্ষ করা যাচ্ছে।

উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি বিমল করের 'ইঁদুর', 'সোপান', 'কাচঘর' প্রভৃতি গল্পের কথা বলতে পারি। এগুলিও মূলত প্রচ্ছন্ন রূপকের ঘরানাতেই পড়ে, তবে এখানে রীতির 'নতুনত্ব' বুঝি এই যে, এখানে একটিই প্রচ্ছন্ন রূপক একটিই কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বা theme আকারে অবস্থান করছে। 'ইঁদুর' গল্পটি শুরু হচ্ছে 'ইঁদুর-মারা কলে' যতীনের ডানহাতের আঙুল থেঁতলে যাওয়ার সম্ভাবনা দিয়ে। সেই ইঁদুরকল

সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে যখন বলা হচ্ছে, "কে জানত, ওরই তলায় ওত পেতে বসে আছে সর্বনেশে কলটা" (৯), কিংবা "তীক্ষ্ণদন্ত ইস্পাতের যন্ত্রটা হাঁ করে বসে রয়েছে; সদ্য-ধার-দেওয়া অর্ধচন্দ্রাকার দুটি করাতের ফলা শিকার ধরার সম্ভাবনায় তখনও অপেক্ষমান" (ঐ), তখন তার 'লোহার ধারালো দাঁত', যান্ত্রিক বিবর প্রভৃতি তাকে শিকারী প্রাণীতে আভাসিত করে। যেন বেড়ালেরই কোনো বিপজ্জনকতর যান্ত্রিক সংস্করণের কথাই বর্ণনা করছে যতীন। কিন্তু এই আশঙ্কামূলক দৃষ্টিকোণ তো ইঁদুরের হওয়া উচিত, যতীন এই দৃষ্টি কোথায় পেল? আসলে ইঁদুরকলের এই লক্ষ্যবদলের সম্ভাবনার সঙ্গেই জুড়ে রয়েছে যতীনেরও সত্তাবদলের সম্ভাবনা। 'ইঁদুরের উৎপাত' এই গল্পে যে এত গুরুতর সংকট হয়ে দেখা দেয়, গল্পের শুরুর দিকে তার তাৎপর্য যেন গল্পের শেষভাগে পৃথকভাবে পঠিত হওয়ার অপেক্ষায় বিলম্বিত বা স্থগিত হয়ে থাকে। তবু এই ইঁদুরকলের সমাসোক্তির মতোই অন্যান্য আনুষঙ্গিক চিত্রকল্পও যেন বাচার্থের অতিরিক্ত কোনো সম্ভাবনা পুঞ্জীভূত করে তোলে। ইঁদুর-ভীতির প্রতিক্রিয়ায় মলিনার ধাক্কা লেগে 'লণ্ঠন' ছিটকে 'মেঝেতে' পড়ার মধ্যে কোথাও যেন অধঃপতনের ইঙ্গিতই মেশানো আছে। লণ্ঠনের 'কাঁপা, অসম, এলানো শিষ' কাচের মধ্যে 'কিলবিল' করা ও ধোঁয়া জমে উঠে তারপর অন্ধকারের 'নিকষ' কালো রঙে সবকিছু ডুবে যাওয়ার দ্যোতনা যেন আরও নিবিড় হয়ে অনুভূতির অস্ফুট কুটিল বিমূর্ততা ও অন্ধতাকে ফুটিয়ে তোলে (স্মরণীয় 'পণরক্ষা' ও 'পোস্টমাস্টার' গল্পে গোয়ালঘরের ধোঁয়ার ব্যাখ্যা)। মলিনার নামসাযুজ্যে 'ময়লা' গাত্রবর্ণ-বিষয়ক জটিল মনস্তত্ত্ব ইঁদুরের অনুষঙ্গে ব্যাখ্যায়িত করার চেষ্টা গল্পেই যতীনের আবছা ফোকালাইজেশনে রয়েছে। যা-হোক, পর্যায়ক্রমে ইঁদুর-মারা কল, বেড়াল ও ইঁদুর-মারা বিষ ব্যবহার করে মলিনা 'ইঁদুরের উৎপাত' বন্ধ করে ছাড়ে। কিন্তু হঠাৎ ক'দিন থেকে আবার একটি ইঁদুর 'যেন' এসে পড়েছে, মলিনা তাকে দেখতে না পেলেও তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। অর্থাৎ 'ইঁদুর' আর কোনো বস্তুগত অস্তিত্বকে ধারণ করে থাকছে না। আর এখান থেকেই তা হয়ে উঠছে রূপকসম্ভব। নতুন তাৎপর্যের দিকে তার বিলম্বিত এগিয়ে যাওয়া। আরও লক্ষণীয়, নতুন ইঁদুরের এই রহস্যময় আবির্ভাবের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় যতীনের বন্ধু বাসুদেবেরও আবির্ভাব। এখান থেকেই যেন গল্পের অভ্যন্তরীণ সংকট দানা বাঁধতে শুরু করে। গল্পের

শেষপর্যায়ে বাসুদেবের ভরসায় মলিনাকে রেখে যতীন কলকাতায় গেলে রাত্রিযাপনের প্রেক্ষাপটে 'অষ্টাদশী' মলিনার নারীসুলভ অনিরাপত্তাবোধ আর ক্রমপুঞ্জীভূত সংশয় একটি পর্যায়ে অমানবিকতায় পর্যবসিত হয়। প্রবল বৃষ্টির রাতে বাসুদেবকে আশ্রয় দেওয়ার বদলে বন্ধ দরজার চৌকাঠের কাছে ইঁদুরকল রেখে সে যেন অপেক্ষা করে গোপনে ('আজও এল না তা হলে!'— মলিনার এই গহীন স্বরটুকু শ্লেষগর্ভ)। ভোরে তার অপরাধবোধ জাগে। গায়ের রঙের নিরিখে সে 'মলিনা' হলেও, মনের রঙের নিরিখে সে যে 'মলিনা' নয়— এই আত্মমর্যাদাবোধ সে নিজের কাছে নিজেই হারিয়ে ফেলে। ইঁদুরকল আবারও যে তার শিকারের লক্ষ্য বদলে ফেলল, এবারে তা কিন্তু মলিনার ইচ্ছের দ্বারা চালিত হয়েই। কিন্তু অপরাধবোধের মধ্য দিয়ে ইঁদুরের রূপকার্থ যেন আরও একটু প্রতিসরিত হয়। মলিনার কথাতেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়— 'নোংরা মন। ইঁদুর কি!' আর সর্বোপরি "ইঁদুর তো বাইরে নেই— ঘরেই রয়েছে" (২৮); এইভাবে ইঁদুর তার 'কুৎসিত' মলিন সন্দেহপ্রবণ স্বভাবেরই রূপক হয়ে ওঠে। বস্তুত, তথ্যের বিনাশ নেই, বাইরের ইঁদুর যখন অন্তর্হিত হল, তখন আসলে 'ইঁদুর' চিহ্নায়কটি তার চিহ্নায়িত বদলে নিয়ে নতুনভাবে বেঁচে ছিল মলিনার গহন চেতনায়।

তাঁর 'সোপান' গল্পে ওই মিনারের সিঁড়ি যেন জীবনেরই প্যাঁচানো প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় উন্নতির সিঁড়ি আকারে রূপকায়িত হয়, যার কুটিল অভিঘাত ক্রমশ মানুষকে এমনকি পরিবারের সদস্যদেরও পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। উন্নতির স্বার্থপর বাসনা তাদের ক্রমশই যেন রহস্যময় মৃত্যুর দিকে ডেকে নিতে থাকে। এইসূত্রে গল্পটি রূপকগল্পও (allegory) হতে পারত, বিশেষ করে প্রাচীন মিনারে ওঠার এই মূল অংশটুকুকে তো 'রূপকের বাস্তবতা' বলাই যায়, কিন্তু নানারকম বস্তুগত কাহিনিসূত্রও একসাথে ঠোঙায় মুড়ে যেভাবে পেশ করা হয়েছে, তাতে পূর্বকথিত বস্তু ও ব্যঞ্জনার সহাবস্থানই পরিলক্ষিত হয়।

'কাচঘর' গল্পে কাচঘরটিও ক্রমশ প্রেমেরই ভঙ্গুর অলীক অথচ সম্মোহনযুক্ত স্বপ্নময়তার রূপক হয়ে উঠতে শুরু করে। 'ধবধবে জ্যোৎস্নায়' তার 'কুহকের রাজ্য' হয়ে-ওঠার ('দুধ-আলোর দেশ') মধ্যে সেই রূপকত্ব যেন সংহত নিবিড় হয়ে ধরা থাকে। শোভনার শারীরিক একটি 'খামতি' বা 'খুঁত'— হিরণ ও তার প্রেমের যাবতীয়

স্বপ্নিল আকর্ষণ ও বিশ্বাসের ভাবালুতাকে ছত্রখান করে দেয়; খোলা দরজা দিয়ে রূপকধর্মী 'ঝড়' ঢুকে 'বিছানা, টেবল, বই' সব যেন 'তোলপাড়' করে দেয়। আর টেবিলল্যাম্পের নির্বাপণ নিয়ে আলাদা করে কিছু বলাই বাহুল্য। বন্ধ কাচঘরের ঝড়ের হাওয়া ঢুকে পড়া ও কাচ ভেঙে পড়া প্রভৃতি যেন প্রেম ও বিশ্বাসের সেই ভঙ্গুর অলীকত্বকেই নির্মমভাবে ব্যঞ্জিত করে। 'কুহক আচ্ছন্ন রহস্যময়' সেই কাচঘরের সম্মোহন হিরণের চোখে শেষমেশ হয়ে ওঠে 'তীব্র ভৌতিক আকর্ষণ' (৮৭)। যা হোক, হিরণ তো 'এগিয়ে চলল', কিন্তু শোভনা? আমরা দেখি, স্কাইলাইটের 'ঝুলন্ত দড়িগুলো' সাপের ফণার সমতুল হয়ে উঠেছিল। 'ঝুলন্ত দড়ি' কি কারো উদ্‌বন্ধনের প্ররোচনা? তাই কি শোভনা ঘরে-মাঠে-বারান্দায় কোথাও রইল না?

এদিকে হাংরি গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক বাসুদেব দাশগুপ্তের 'দূরবীন' গল্পে দূরবীনের মধ্যে সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির দ্যোতনা ও কথকের জ্বলন্ত রাক্ষস হয়ে-ওঠার মধ্য দিয়ে তার প্রতিবাদী সত্তার তীব্রতার রূপকল্প প্রকাশিত হয়, 'বমনরহস্য' গল্পে নারীমাংসের পসার বা পাত্রপাত্রীর উল্টো হয়ে নগ্ন ছাল-ছাড়ানো অবস্থায় ঝুলে বিবমিষাউদ্রেককারী ছবিটি বর্তমান সমাজে মানুষের দুর্দশাকেই চিহ্নিত করে। 'এইখানে হৈমন্তীর মাংস পাওয়া যায়', 'এইখানে চম্পার মাংস পাওয়া যায়' প্রভৃতি লেখা সাইনবোর্ডগুলি, আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিজ্ঞাপন হয়ে নারীর প্রকৃত অবস্থাকেই চিনিয়ে দেয়। এছাড়া বিয়েবাড়িতে বরযাত্রীর আগমনকে যুদ্ধ ও যৌনলুণ্ঠনের সদৃশতায় বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানটিরও চুনসুরকি খসে পড়তে থাকে। আবার তাঁর সুপরিচিত 'রন্ধনশালা' গল্পে স্বপ্নবাস্তবতার সুচারু প্রয়োগ (প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' অথবা মার্কেজের 'বিশাল ডানাওয়ালা থুথুরে বুড়োর গল্প'টিতেও যেমন) আমাদের ভাবনাকে আরও গহন পরিসরে নিয়ে যায়। জাদুবাস্তব আসলে যেমন রূপকের বাস্তবতা; আমাদের মতে পরাবাস্তব বা স্বপ্নবাস্তবও আসলে গভীর প্রকৃষ্ট গোছের এক প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব তথা হেতুবাচক নির্দেশকের উদাহরণ, যার ব্যাখ্যা লুকিয়ে পাঠকৃতির ভেতরে এবং বাইরে। এইসময় খাদ্য-আন্দোলন দেখা গেছিল ১৯৬৬ সালে, নিশ্চিতভাবে তার প্রভাবগুলি আরও কয়েকবছর আগে থেকেই তীব্র হয়ে উঠছিল, সেই পটভূমিকাতেই আসলে 'রন্ধনশালা' প্রকাশিত হয়

১৯৬৩ সালে। সমাজে সেই অনাহারের অভিঘাতই যেন কথকের দুঃস্বপ্নে এইভাবে এসে ছায়া ফেলে।

'শাস্ত্রবিরোধী' গল্পকার সুব্রত সেনগুপ্তের 'জামা' গল্পে দেখা যায় নায়কের বাহ্যপরিচিতির দ্যোতক হিসেবে একটি সুন্দর জামা কীভাবে ঘুমের পরিবেশে তার শরীর ও চেতনাকে বেষ্টন করে ক্রমশ গ্রাস করে নিতে থাকে।

নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখা 'ভাসান' গল্পটি শুরু হচ্ছে *Alice in Wonderland*-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, যাতে বলা হয়েছে 'talk of many things', অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকারূপে, বহুত্ব বা বহুস্বর বা বয়ানের বহুমাত্রিকতার ইঙ্গিতই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ক্ষমতাকেন্দ্রিকতার বিপ্রতীপে থাকাই বুঝি-বা লেখকের গূঢ় অভিপ্রায়। কথকস্বর: যে কিনা 'লোকচক্ষুর অন্তরালে' মরেছে (অর্থাৎ প্রান্তিকায়িতের স্বর)। গল্প ফুটে উঠছে মৃত ব্যক্তির বয়ানে, সময়ের বাস্তবচিত্র উঠে আসছে 'অভাবনীয়' একটি দৃষ্টিকোণ থেকে। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা দেখছি ট্রাক ও রাত্রির মিলিত সাদৃশ্যে 'মায়ের ভাসান' ও দুর্নীতি (নীতির ভাসান) কীভাবে এক হয়ে যাচ্ছে— গভীর রাতে গুদাম থেকে গুদাম চালাচালি হচ্ছে চালের বস্তা। অতএব মা দুর্গা যেন ন্যায়-নীতি-সততার মূর্তি হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, বিসর্জিত হচ্ছে। 'পাগল' মানুষটির মৃত্যু: প্রান্তিকায়িতের প্রাণত্যাগ। কিন্তু 'প্রাণ' ত্যাগ করলেও সে নিজের 'স্বর' ত্যাগ করেনি। সমান্তরাল বাস্তবতায় তার সহজ স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত স্বরটুকু রয়ে যাচ্ছে। এ-ছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল— 'ডেঁও পিপড়া'; যারা 'মনুষ্যচক্ষু' খেতে ভালোবাসে (২১)। এখানে 'ডেঁও পিপড়া'র মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক রাজনীতির সূক্ষ্মতর আগ্রাসনের কথাই বলা হচ্ছে, যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রাস করে, আমাদের ওপর দার্শনিক দখল কায়েম করে। এই সাদৃশ্যগুণে ডেঁয়ো পিঁপড়ে আসলে রূপক (রবীন্দ্রনাথের *ব্যঙ্গকৌতুক* বইয়েও ডেঁয়ো পিঁপড়ে যেমন সমাজের আধিপত্যবাদী শ্রেণির রূপক)। আবার আরেক দিক দিয়ে তা হেতুবাচক নির্দেশক (পিঁপড়েরা 'দীর্ঘদিন মনুষ্যচক্ষু খায় নাই' কেন? কারণ সেই কাজটি পুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক রাজনীতিই যেন করে চলেছে, পিঁপড়েরা তাই যেন জ্যান্ত মানুষের চোখ না পেয়ে মৃতের চোখের ওপর ভরসা করে আছে)।

'স্টিমরোলার' গল্পে স্টিমরোলার 'কালো একটা বেঢপ জন্তুর মতো' (২৫) দেখা দেয়। তার চিমনির ধোঁয়া যেন এক আগ্রাসী ক্ষতিকারক বীভৎসতাকে ব্যঞ্জিত করে। আর সেইসূত্রে দেখা যায় 'বাড়িগুলোর জানলা সুন্দর কাচ দিয়ে ঢাকা' (২৬), এইসব সুন্দর কাচের আচ্ছাদন আসলে উচ্চবিত্ত/মধ্যবিত্ত জীবনের আপাত এক স্বচ্ছ শৌখিন স্বনির্মিত নিরাপত্তার মোড়ক, ঘাতক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কুপ্রভাবকে যা দিয়ে তারা আড়াল করে রাখতে চায় নিজেদের দৃষ্টিপথ থেকে। এই স্টিমরোলার আসলে এক পেষণযন্ত্র (যেমন 'কর্তার ভূত' গল্পের ঘানি), সবকিছুকে পিষে সমান করে দিতেই তা অভ্যস্ত। এই সাদৃশ্যগুণে স্টিমরোলারটি রাষ্ট্রক্ষমতার রূপক হয়ে ওঠে, যা নিরন্তর যাবতীয় বৈচিত্র্য ও বহুস্বরের বর্ণালীকে একই চিন্তাকাঠামোর ভেতর পিষে পুরোপুরি সমতল করে তুলতে চায়। এটি আবার রাষ্ট্রক্ষমতার নির্দেশকও বটে, যেহেতু তা রাষ্ট্রের ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য হাতিয়ার— "ওই জরদগব বিশাল বিকট যন্ত্রটাকে লেলিয়ে দেবার উপযোগী বুনো হিংস্র জন্তু বলে মনে হয়" (২৭)। এখানে একটি বিশেষ চিহ্নের মোচড় রয়েছে, তা হল, রাষ্ট্রের ব্যবহৃত হাতিয়ার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, বিদ্রোহী চালকের হাত ধরে।

এ-ছাড়া 'মাথা নেই তো হয়েছে কি' গল্পে মাথাহীন বেশ্যা তার 'ক্যাসেট ক্যাসেট হাসি'র যান্ত্রিকতা ও আকর্ষণীয় শরীরের সম্মোহন নিয়ে ক্রমশ পুঁজিবাদী সমাজের মেধা-মননবর্জিত ক্ষতিকারক সংস্কৃতির রূপক হয়ে দেখা দেয়। কিংবা '৪+১' গল্পটিতে নামপরিচয়হীন একটি শবদেহ যেন-বা মৃত মূল্যবোধ বা স্বপ্ন-আশা প্রভৃতির রূপক হিসেবে উপস্থাপিত হয় (প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসে নায়কের কাঁধে বাঁকাবুড়ির শবও কিছুটা অনুরূপ তাৎপর্যবাহী)। কিংবা 'কাকতাড়ুয়া' গল্পে কাকতাড়ুয়াটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একজন অসহায় প্রতিবাদহীন নীরব দর্শকের রূপক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে গুলি লেগে তার বাম চোখ ফুটো হয়ে যাবার পর। ইলিয়াসের গল্পে আমরা বাম অঙ্গের এইরূপ ব্যঞ্জনা বহুবার পেয়েছি, এখানে বাম চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ বামপন্থী প্রতিবাদী জীবনদৃষ্টি মুছে যাওয়া। এছাড়া তাঁর ফ্যাতাড়ু চরিত্রের ওড়ার ক্ষমতাও দ্বিবিধ অর্থে ব্যঞ্জনার ভাষ্য জ্বালিয়ে রাখে। অথবা তাঁর *কাঙাল মালসাট* উপন্যাসে চোক্তার-চরিত্র ভদি যখন গোপন ও বিকল্প টেলিফোন-যোগাযোগ স্থাপন করে, তখন

সেই টেলিফোনে তার গলার স্বরের অনুনাসিকতা প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব অনুযায়ী ভূতুড়ে ধ্বনির বিভ্রম জাগায়, যা তার উপেক্ষিত জীবন ও সমান্তরাল বেঁচে-থাকার বেদনাকে সূচিত করে; আর *লুব্ধক* উপন্যাসের পিঁজরাপোল ও কুকুরের রূপকভাষ্য তো আমাদের জানাই আছে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পেও বর্ণনাতিরিক্ত ভাষার শক্তি সুষমামণ্ডিত হয়ে রয়েছে। তাঁর 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পের সেই কিম্ভূত কাক কিংবা 'মাংসখেকো ঘোড়া' গল্পে বিজ্ঞাপনের ফ্রেম থেকে লাফিয়ে নেমে এসে একজন ঘুমন্ত শ্রমিকের ডানহাত চিবিয়ে-খাওয়া অলৌকিক লাল ঘোড়াটি যেভাবে অতিপুঁজিবাদী পণ্যসংস্কৃতির সম্মোহক আগ্রাসী চরিত্রের রূপক হয়ে ওঠে, বা 'একটি ইস্পাত-পাখি' গল্পে নানারকম লোহা একছাঁচে গলিয়ে পিণ্ড বানিয়ে ফেলার প্রযুক্তি ও সেই ইস্পাতের বানানো বৈচিত্র্যহীন পাখিগুলির ওড়ার অক্ষমতা যেভাবে পণ্যায়িত সমাজ-সভ্যতায় মানুষের দুরবস্থাকেই দ্যোতিত করে, অথবা 'শহরে বৃষ্টি হয়' গল্পে নিয়ন আলোর রঙে 'মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে' উল্টে মেঘ হয়ে ঝুলে-থাকা শহর এবং জলের বদলে ভোগ্যপণ্যের যান্ত্রিক বৃষ্টি যেভাবে শহরটির ইতিহাসবিচ্ছিন্ন ভোগবাদের ব্যঞ্জনা বহন করে, কিংবা 'কান্নাদানশিবির' গল্পে শোষিত মানুষদের কান্নাদানের গভীর সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য পাঠকহৃদয়কে ব্যথিত করে তোলে— তাতে আখ্যানের নিহিত বেদনা আরও নিবিড় হয়ে ধরা দেয়।

সুবিমল মিশ্রের গল্পে আমরা দেখি হারাণ মাঝির বিধবা বউয়ের মড়া সর্বত্র দৃশ্যমান হয়ে যেভাবে সোনার গান্ধীমূর্তির নাগাল পাওয়াকে ব্যাহত করে, তাতে শোষিত শ্রমজীবী মানুষদের গলিত দুর্গন্ধময় জীবনের অভিশাপ কীভাবে বুর্জোয়া মূর্তিপূজার সংস্কৃতিকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করে তোলে, তা-ই প্রকাশ পায়। এছাড়া ময়দানে টাকার গাছ কিংবা টাকা ডবল করার ম্যাজিক যেভাবে প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্বের মাধ্যমে গভীর সামাজিক দুর্নীতির ইশারাকেই ফুটিয়ে তোলে, কোথাও কথকের বিলি-করা চকোলেট যেভাবে অহিংসার বাণীর ব্যঙ্গাত্মক রূপক হয়ে ওঠে, কোথাও আবার কথকের হৃৎপিণ্ড খুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে যেভাবে সমাজে হৃদয়হীনতার চর্চাই অনিবার্য হয়ে ওঠে, তাতে সুবিমল মিশ্রের বয়ানেও সেই প্রতিস্পর্ধী গভীরতা অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। এই গভীরতার পাঠ নানাভাবে আখ্যানের ভাঁজে ভাঁজে সজীব হয়ে থাকে,

সমাজের উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, পাঠককে নতুনতর ভাবনায় প্ররোচিত করতে থাকে নিরন্তর।

উপসংহার

সুতরাং শেষাবধি আমরা দেখলাম যে, চিহ্নের অমিয় সম্ভাবনা আমাদের দৈনন্দিন যাপন ও যোগাযোগের ভিতরেই প্রতিনিয়ত জন্মাচ্ছে আবার প্রতিনিয়ত মৃত্যুমুখে পতিতও হচ্ছে। বস্তুত চিহ্নের ধর্মই এই, কিন্তু এই নিরন্তর সৃষ্টি ও ভাঙনের মধ্য দিয়েই ভাষা বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে সাহিত্যও। একই চাঁদ কখনো প্রেমিকের চোখে হয়ে উঠছে প্রিয়ামুখ, কখনো ক্ষুধিতের চোখে হয়ে উঠছে 'ঝলসানো রুটি'; কিন্তু চাঁদ শুধু চাঁদ হয়েই থাকলে সে মরে যেত। সেই কোন্ প্রাচীনকালে মানুষ প্রতীক ভেঙে রূপকের জন্ম দিয়েছে, পশুকথা ভেঙে নীতিকথা, আবার কখনো মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই রূপকের বিমূর্ততা মুছে ফেলে নিটোল ভাবমূর্তি গড়ে নিতে চেয়েছে, রূপকের বদলে এসেছে বিশেষ প্রতিনিধির দল, রূপকথাকে ক্রমশ কোণঠাসা করে রাজত্ব শুরু করেছে রোমান্স, আবার তাকেও দেখতে দেখতে সরে যেতে হয়েছে, জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে আধুনিক উপন্যাসের জন্য, এইভাবে নীতিকথার ঘাঁটিও দখল করে নিয়ে আধুনিক ছোটোগল্প। আবার প্রতিনিধিবর্গকেও পড়তে হল দ্বান্দ্বিকতায়, রূপকের হারানো জমি কিন্তু-কিন্তু করে কিছু অন্তত ছাড়তেই হল। এদিকে রূপকচিহ্নেরাও এখানে-সেখানে ঘাড় গুঁজে উদ্‌বাস্তুর মতো টিকে গেল প্রচ্ছন্ন চেহারায়। ধীরে ধীরে আখ্যানের আঙিনায় হৃত সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য আজও তারা মুখিয়ে রয়েছে প্রত্যাশায়, প্রলোভনে। কার্যত, জীবন যত বেশি বৈচিত্র্যের দিকে ঝুঁকতে থাকবে, দ্বিবাচনিক সম্পর্কগুলি হতে থাকবে ক্রমশ জটিল, ততই প্রাত্যহিক বয়ানে নিবিড় ব্যঞ্জনাময়তার প্রয়োজন হবে; নিছক একমাত্রিক ঘটনাবৃত্তান্তে আর মনন তৃপ্ত হবে না, বস্তুত কোনোদিনই হয়নি, জীবনের ভাষা রূপকধর্মিতাকে অবলম্বন করে চিরকালই বেঁচে আছে। আর তার সাথে রয়েছে জটিল অন্তঃসলিলা নির্দেশকের নিবিড়তম চলাফেরাও। সেই প্রাচীন কথাসাহিত্যের ঐতিহ্য একটু একটু করে বিস্মৃত হয়ে এই যে তথাকথিত আধুনিকের আঙিনায় আছড়ে পড়েছিল মাছ, একমাত্রিকতার শোষণ জলকে বেঁধে এনেছিল চৌবাচ্চার কোলে, সেই কেন্দ্রীভূত ভাষাকে বারবার

আঘাত করতে চেয়েও কেউ কেউ বুঝি হতাশ হয়ে ফিরে গেছে অরণ্যে। ত্রৈলোক্যনাথের লড়াই রবীন্দ্রনাথ সেভাবে বুঝলেন না, তবু কিছু-না-কিছু সংক্রমণ দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও। কবিসুলভ ঝোঁক নিয়ে ছোটোগল্প লিখতে বসে তা-ই যেন বারবার অতৃপ্ত অনুতপ্ত হয়েছেন তিনি। রূপকধর্মিতা ও ব্যাখ্যাধর্মিতার মাঝখানের জমিতে পায়চারি করেছেন অশান্ত হৃদয়ে, টালমাটাল চরণ যেন অস্থিরসংকল্প, চারপাশের গাছ নদী জ্যোৎস্না ও জোনাকি তাঁকে ঘিরে বুনে তুলেছে ক্রমশই মায়াবীর জাল। 'গল্পগুচ্ছ' পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি-বা তিনিও ছিলেন চন্দ্রাহত প্রেমিক, একাধিক গল্পে একাধিকবার এতরকমভাবে জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ ঘুরে-ফিরে এসেছে, যেন মনে হয় ভাষার বস্তুগত যুক্তিযাতনা পিচ্ছিল কোনো পথপরিক্রমার জন্য অপেক্ষমান। সেই একইরকম দ্বিধা অন্তরে পুষেও রূপকের প্রচ্ছন্নতার দ্বারা প্রায় একইরকমভাবে তাড়িত হয়েছিলেন পরবর্তী যুগের আরেক গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও। সেইসাথে প্রচলিত কার্যকারণতত্ত্বকে নানারকমভাবে দুমরে মুচড়ে দিয়েও বহুবিধ বক্রতাপূর্ণ উদ্‌বেগের উদ্‌যাপন করেছিলেন তিনি। আরও পরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখের লেখায় সেই বক্রোক্তির স্বাদ যেন এল আরও একটু তিতোমিঠে হয়ে। তবু মাঝেমধ্যে জিজ্ঞাসা জাগে: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'গিরিগিটি'র মতো, বা নিদেনপক্ষে 'সমুদ্র'-এর মতো গল্প আর সেভাবে লিখলেন না কেন? মায়ার সেই বিষাদকুটিল ঘূর্ণাবর্ত কেন ক্রমশ সহজ শান্ত হতে হতে 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা'র সাদামাটা দুঃখে পর্যবসিত হল?

এইখানে একটু টোকা দিয়ে থামিয়ে কেউ যদি বলেন, "তাতেই-বা দোষটা কোথায়?"— জবাব দেওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। বয়ানের তাৎপর্য একমাত্রিক হলে, আর ভাষা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হলে, তা যে ক্ষমতার নির্দিষ্টকরণের প্রবণতাকেই পরিতৃপ্তি জোগাবে, তার ফলে... ইত্যাদি ইত্যাদি... কিন্তু বাস্তবিকই প্রশ্নটিকে ফেলে দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে', 'মণিহারা', 'মহামায়া', 'ঘাটের কথা', 'পণরক্ষা' প্রভৃতি গল্পের যে কাব্যিক বয়ান ও নিহিত রূপকধর্মিতা, তার বাইরে থেকেও 'শাস্তি', 'দেনাপাওনা', 'স্ত্রীর পত্র', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পের কি আবেদন হারিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে কি প্রতিবাদ আজ অবধি সংরক্ষিত নেই। কিংবা জগদীশ গুপ্তের গল্পে ভাষার যে তীক্ষ্ম ধার, যেমন ধরা যাক 'পয়োমুখম্' গল্পের শেষে পিতার প্রতি পুত্রের যে মোক্ষম

জবাব, সেখানেও কি প্রতিবাদী ভাষ্য সংরক্ষিত থাকেনি? "কিংবা মানিক আর বিভূতিভূষণ— দুই বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কাকে তোমার বেশি প্রতিবাদী মনে হয়?" সেক্ষেত্রে বলতে হয়, ভাষার ব্যঞ্জনার মাত্রা আর বয়ানের প্রতিবাদের মাত্রা, এই দুটির সম্পর্কও আসলে ততখানি একমাত্রিক নয়; সরাসরি সমানুপাতিক বা ব্যস্তানুপাতিক— কোনোটিই তাকে বলা যাবে না। প্রতিবাদের প্রকৃত মাত্রা আসলে বিষয়, ভাব ও ভঙ্গি— এই তিনটি এককের জটিল বিন্যাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। গল্পের বিষয়বস্তু, লেখকের ভাবাদর্শ ও লেখার ভঙ্গি তথা শৈলী— এই তিনের সমন্বয়ে প্রতিবাদ আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে বলে আমাদের মত। এ-ছাড়া এও বলার যে, প্রতিবাদ কোনো সংরক্ষণযোগ্য বস্তু নয়, প্রতিবাদ সংরক্ষিত হয়ে থাকলে তার মধ্যে গভীর সংকট লুকিয়ে থাকে। তাই প্রতিবাদকে হতে হয় প্রবহমান, তার জন্য ভাষার তাৎপর্য ও চিহ্নের চেনাজানাগুলিকে ভেঙেচুরে এগোতে থাকা জরুরি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার হলে বলব, দুয়ের এক সুষ্ঠু সম্মিলনে যে-লেখককে পাওয়া সম্ভব, সেই লেখকই আমার বেশিমাত্রায় পছন্দ। জগদীশ গুপ্তের গল্পের ভাষায় রবীন্দ্রগল্পের রূপকধর্মিতা বেশি করে প্রযুক্ত হলে, যা হতে পারত, হয়তো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' প্রভৃতি গল্পই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিংবা মানিকের লেখা বিভূতিভূষণের শৈলী মিশে গেলে হয়তো একজন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্ম নিতে পারতেন। তাই বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শকে বাদ দিয়ে শুধু ভঙ্গিই যে প্রতিবাদের সূচক হয়ে উঠতে পারে, আসলে তেমন দাবি আমাদের নয়। বিমল করের 'ইঁদুর' গল্পে রূপকের ব্যঞ্জনা নিপুণ হাতে প্রযুক্ত, কিন্তু তাতে কী-বা এল-গেল! পক্ষান্তরে বিমল করেরই 'কাচঘর' গল্পটি শৈলীর সাথে সাথে দর্শনের দিক দিয়ে প্রতিস্পর্ধী হয়ে-ওঠায়, তার গুরুত্ব অন্তত 'ইঁদুর' গল্পটির চেয়ে অনেকখানিই বেশি বলে আমাদের অভিমত। সুতরাং একইসাথে আমরা কেবল বিষয়বস্তুতে নয়, ভাবাদর্শেও নয়, ভাষাগুণেও প্রতিবাদী হয়ে ওঠার পক্ষপাতী। কারণ ভাষাই ভাবাদর্শের হাতিয়ার, আর বিষয়বস্তু তার যুদ্ধক্ষেত্র। শৈলেশ্বর ঘোষ এই ভাষা 'বিমোচন'-এর মধ্য দিয়ে কবির প্রকৃত সাধনার মর্মার্থ সূচিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। তাই 'বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থান'-কে তিনি যে ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছিলেন, সেই ষড়যন্ত্রময় অবস্থান আসলে

ভাষাচিহ্নেরও। একদিকে শব্দের সুনির্দিষ্ট সুপ্রচলিত অর্থকে ভাঙা যেমন জরুরি (আর সেই কাজটি অনন্যসাধারণভাবে করতে পারে রূপক তথা metaphor), আবার বাক্যতত্ত্বের দিক দিয়েও ভাষার প্রচলিত যুক্তিকাঠামোকে বিপর্যস্ত করাও প্রয়োজন (সেই কাজটি করতে পারে প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব, এক বিশেষ ধরনের metonymy)। তাই বিক্ষুব্ধ গল্পকারেরা প্লটকে ভাঙতে চেয়েছেন বারবার, ঘোষিতভাবে সুবিমল মিশ্র লিখেছেন 'অ্যান্টিগল্প', 'অ্যান্টি-উপন্যাস' ইত্যাদি। তবু ব্যবহৃত ব্যঞ্জনার চিহ্নতাত্ত্বিক কাঠামোর নিরিখে কোথাও যেন এক ভিতর-সংযোগ রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে 'সুবিমলমিশ্র' অবধি, প্রচ্ছন্ন রূপক ও প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্বের ব্যঞ্জনায়, ভাষার গহনে একপ্রকার চোরা প্রতিবাদ যেন দীর্ঘদিন ধরে অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলেছে বলেই আমাদের মনে হয়।

পরিশিষ্ট

ছবি ১

ছবি ২

ছবি ৩

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ:

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান: *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬), কলকাতা: প্রতিভাস, ১৯৯৩

_____: *রচনাসমগ্র ১*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯

কর, বিমল: *বাছাই গল্প*, কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৮৭ ব.

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ: *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (একাদশ খণ্ড), (সম্পা.) আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৪ ব.

_____: *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৩৬১ ব.

গুপ্ত, জগদীশ: *জগদীশ গুপ্তের গল্প*, (সম্পা.) সুবীর রায়চৌধুরী, কলকাতা: দে'জ, ১৯৯৬

চট্টোপাধ্যায়, সাধন: *গল্প ৫০*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০০৯

দাশগুপ্ত, বাসুদেব: *রচনাসমগ্র ১*, (সম্পা.) অপূর্ব সাহা, কলকাতা: গাঙচিল, ২০২৩

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০৫

_____: *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (ত্রয়োদশ খণ্ড), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৬ ব.

_____: *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২১ ব.

বসু, নিতাই(সম্পা.): *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, কলকাতা: দে'জ, ২০১১

বসু, শেখর (সম্পা.): *শাস্ত্রবিরোধী গল্প*, কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১০

ভট্টাচার্য, নবারুণ: *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: দে'জ, ২০০৬

মিশ্র, সুবিমল: *বইসংগ্রহ ১*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১২

মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ: *কঙ্কাবতী* (১৮৯২), কলকাতা: সুজন, ২০০৯

_____: *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী* (অখণ্ড সংস্করণ), (সম্পা.) প্রফুল্ল কুমার পাত্র, কলকাতা: পাত্র'জ পাবলিকেশন, ১৯৯৫

সেন, সব্যসাচী (সম্পা.): *হাংরি জেনারেশন রচনা সংগ্রহ*, কলকাতা: দে'জ, ২০১৫

সহায়ক গ্রন্থ:

বিদেশি:

Barthes, Roland. *Sade/Fourier/Loyola* (1971). Richard Miller (trans.). London: Cape, 1977

_____: *S/Z* (1970), Richard Miller, Blackwell, Oxford, 1990

Baudrillard, Jean. *The Mirror of Production* (1973). St. Louis: Telos, 1975

Bullock, Alan & Stephen Trombley (ed.). *The New Fontana Dictionary of Modern Thought* (3rd ed.). London: HarperCollins, 1999

Chandler, Daniel. *Semiotics: The basic*. London: Routledge, 2002

Ivor A. Richards. *The Meaning of Meaning*. Kegan paul (ed.). London: Routledge, 1923

Leach, Mac Edward. *Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend*. Newyork: Funk & Wagnalls Co., 1949

Noth, Winfried. *Handbook of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press, 1990

Ogden, Charles K (1930). *Basic English* (9th edn.). London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. London: Routledge, 1944

Peirce, Charles Sanders. *Collected Writings* (8 vols) (ed. Charles Hartshorne, Paul Weiss and Arther W. Burks). Cambridge: Harvard University Press, 1931/58

Saussure, de Ferdinand (1916). *Course in General Linguistics* (Trans. Roy Harris). London: Duckworth, 1983

Thompson, Stith. *Motif-Index fo Folk-Literature*. Bloomington: Indiana, 1955-58

বাংলা:

কোসাম্বি, দামোদর ধর্মানন্দ: *ভারত-ইতিহাস চর্চার ভূমিকা,* (অনুবাদ: গৌতম মিত্র), কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০২

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ: *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (নবম খণ্ড), কলকাতা: ১৩৯২ ব.

_____: *সাহিত্যে ছোটগল্প,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৫ ব.

গুপ্ত, ক্ষেত্র: *রবীন্দ্রনাথ: ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩

গোস্বামী, রূপ: *উজ্জ্বলনীলমণি,* (সম্পা.) হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা: ভারতী, ১৩৭২ ব.

ঘোষ, তপোব্রত: *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, কলকাতা: দে'জ, ২০১৮

চক্রবর্তী, শ্যামাপদ: *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*, কলকাতা: কৃতাঞ্জলি (প্রযত্নে: প্রজ্ঞাবিকাশ), ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ)

চৌধুরী, সুজিৎ: *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০১৬

দাশগুপ্ত, সুধীর কুমার: *কাব্যালোক*, কলকাতা: দে'জ, ১৯৯৮

দাশ, জীবনানন্দ: *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা: নাভানা, ১৯৫৪

দাশ, রণজিৎ: *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা: দে'জ, ২০০২

বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাণ: *মাংসাশী মেধার ট্রাপিজ*, কলকাতা: ছোঁয়া, ২০১৩

বিশ্বাস, অচিন্ত্য: *কঙ্কাবতী: বাস্তব ও স্বপ্নের নকশিকাঁথা*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২

ভট্টাচার্য, তপোধীর: *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব* (১৯৯৭), কলকাতা: দে'জ, ২০১৬

_____: *বাখতিন*, কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০০৯

_____: *বাখতিন: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬

_____: *রোলাঁ বার্ত, তাঁর পাঠকৃতি* (১৯৯৭), কলকাতা: দে'জ, ২০১৩

ভট্টাচার্য, দেবীপদ: *উপন্যাসের কথা*, কলকাতা: দে'জ, ২০০৩

মজুমদার, জহর সেন: *উপন্যাসের ঘরবাড়ি*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০১

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি: *বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১২

_____: *লোককথার লিখিত ঐতিহ্য*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৯

মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র: *চিহ্নতত্ত্ব বা সেমিয়োলজি: সস্যুর থেকে দেরিদা*, কলকাতা: তবুও প্রয়াস, ২০২১

সাহা, পৃথ্বীশ: *পাঠে-পুনর্পাঠে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, কলকাতা: এখন মুক্তাক্ষর, ২০০৬

হক, হাসান আজিজুল: *কথাসাহিত্যের কথকতা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮১

হালদার, নির্মল: *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা: দে'জ, ২০০০

হোসেন, পারভেজ ও ফয়েজ আলম (সম্পা.): *জ্যাক দেরিদা: পাঠ ও বিবেচনা*, ঢাকা: সংবেদ, ২০০৬

বৈদ্যুতিন তথ্য:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carnival on 26.08.2017 at 3:56 P.M